শুকসারী-কথা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রীতিভাজনেষু

শুকসারী-কথা

পূর্বকথা

কোপাই নদীর হাঁসুলীবাঁকের নসুবালাকে এ অঞ্চলে সবাই চেনে। বেটাছেলে হয়ে জন্মে চিরটাকাল সেই ছেলে-বয়েস থেকে এই পঁয়ষট্টি সত্তর বছর বয়েস পর্যন্ত মেয়েছেলে সেজে জীবনটা শেষ করতে চলেছে। ছেলে-বয়েসে মা তাকে মেয়ে সাজিয়েছিল, নাক ফুঁড়ে নোলক—কান ফুঁড়ে মাকড়ী—হাতে কাচের চুড়ি পরিয়েছিল —চুল না কেটে লম্বা চুলে বেড়া-বিনুনী বেঁধে দিত, পরিয়ে দিত একখানা গামছার মত খাটো তাঁতে বোনা 'ফেরানী' বা ফিরানী, অর্থাৎ যাতে নাকি কেবল কোমরে জড়িয়ে একটা ফেরতা দেওয়া যায়। সেই থেকেই তার মেয়েলিপনা এবং মেয়ে-জীবন আরম্ভ। লোকে ভেবেছিল বয়েস হলেই যথা নিয়মে ছেলেটা ছেলেই হবে,বিয়ে করবে, সংসার হবে এবং তখন এই ছেলেবেলার মেয়েলিপনার জন্যে সে লজ্জা পাবে। কিন্তু তা হয় নি। ছেলে তার মেয়ে সেজেই থেকে গেল। ছেলেবেলা মেয়ে সাজাবার আরেকটা কারণ ছিল—ওদের মনসার ভাসানের দলে ও সাজতো বেহুলা, ছিপ্‌ছিপে দীঘল চেহারার কালো ছেলেটিকে মানাত বড় ভাল, আর গানের গলা ছিল চমৎকার, সরু মেয়েলি! 'ভাঁজো পরবে' মেয়ে সাজিয়ে ওকে সকলে নাচাত, এবং চৈত্রমাসে 'ঘেঁটু পরবেও' সে মেয়ে সেজে নাচত। কোথা থেকে পাড়ার মাতব্বরেরা সলমা চুম্‌কি দেওয়া একটা ঘাগরা এবং ঢিলে একটা বডিস্ পরিয়ে হাতে রুমাল দিয়ে নামিয়ে দিত। মাথার লম্বা চুলে বেণী তৈরী করে ঝুলিয়ে দিত, ঠোঁটে রঙ মাখত এবং গানের সঙ্গে ও নাচত গাইত—

তাই ঘুনাঘুন বাজে লো নাগরী—
চরণে নূপুর হায় থামিতে যে চায় না।
তাই ঘুনাঘুন তাই ঘুনাঘুন।

এসব গান ওদের বেঁধে দিত মুকুন্দ ময়রা। বছর বছর এক এক রকম। যে বছরে যা বিশেষ কিছু ঘটত তাই নিয়ে গান। প্রথমবার নস্থবালা যেবার নাচে—তার আগের বার উঠেছিল ধূমকেতু, এবং সেবার মড়ক হয়েছিল। মুকুন্দ গান বেঁধে দিয়েছিল—

ছেলেপিলে এবার উঠে ধূমতারা—
বুড়োধাড়া সব গেল মারা
এবার উঠে— ।

ধূয়ো সেই এক।—তাই ঘুনাঘুন—তাই ঘুনাঘুন। নস্থবালাই ওটা গাইত এবং পায়ে তার নূপুর থাকত—সেটা বাজত—ঘুন—ঘুন—ঘুনাঘুন—ঘুনঘুনাঘুন।

বেউলার ভাসানে—লখিন্দর সাজতো করালী। বাপমরা ছেলে, মা তাকে ছেলেবেলায় ফেলে পালিয়েছিল—পাড়ার পাঁচজনের বাড়ী কুড়িয়ে খেয়ে মানুষ—তবে একটু-আধটু স্নেহ পেত নস্থর মায়ের কাছে -সে নস্থকে বলত নস্থদিদি। ওই করালীই বেউলোর দলে সাজত লখিন্দর। খেলাঘরে নস্থ সাজত মা—করালী ছেলে, কোন-দিন বা নস্থ বউ—করালী বর। এইভাবে বড় হল। করালী হল ডাকাবুকো। নস্থ করালীর নস্থদিদিই থেকে গেল—মেয়েদের সঙ্গেই ওঠাবসা—কথাবার্তা, হাসিখুশি, মনের কথা আর তার সঙ্গে তাকে পেয়ে বসল নাচ আর গান। ভাদ্র মাসের এবং চৈত্র মাসের মুখ চেয়ে বসে থাকত, কবে আসবে। বেউলো আর ভাঁজো আর ঘেঁটু। পাড়ায় গাওয়াই রেওয়াজ ছিল, নস্থবালা মূলগায়েন আর নাচকরুনী হয়ে গাঁ-গাঁওলায় দল নিয়ে বেরুতে স্থরু করল—গোটা মাস। সঙ্গে থাকত করালী আর জন চারেক। গাঁ-গাঁওলায়—মণ্ডলদের বাড়ী মিত্তিরদের বাড়ী ঘোষদের বাড়ী- ঠাকুরদের বাড়ী গিয়ে দাঁড়াত। জয় হোক গো মা ঠাকরুণ, ভাঁজো এয়েছেন। তারপর গান। মেয়েরা নস্থর গান আর নাচ দেখে মুখটিপে হাসত। বলত, মরণ!

নসুর মনে আছে চন্দনপুরে বাবুদের বাড়ী নতুন কলকাতার বউ তার বড় জায়ের মুখে ওই 'মরণ' কথাটা শুনে ফিস্‌ফিস্ করে জিজ্ঞাসা করেছিল—মরণ বলছিলে কেন দিদি ?

—মরণ নয় ? বেটাছেলের মেয়ে সেজে নাচের ঢঙ দেখ দেখি।

বউটির বিস্ময়ের আর সীমা ছিল না—সে জিজ্ঞাসা করেছিল—কে বেটাছেলে ? যে নাচছে ? তুমি ঠাট্টা করছ দিদি ?

বড় জা বলেছিল—ঠাট্টা ? যা না ওর গালে হাত বুলিয়ে দেখ না। হাত ছড়ে যাবে দাড়ির খোঁচায় !

নসুর রাগ হয়েছিল—সে সামলাতে পারে নি, বলেছিল—কি যে বলেন বউদিদি ! ডারী !—ডারী না বেরুক—মেয়েদের মোচ বেরোয় না ? হ্যাঁ। মরণ আমার ডারীর ! বলে গান ধরেছিল; তাদের ভাঁজোর গান—

কেষ্টো বেড়ায় পাতায় পাতায় ডালে না দেয় পা—
ও রাধে লো, পাতার ডগায়
ফুল হবি তুই যা ! (ও মন রসনা আমার)

এর পর ঢোল বেজেছিল জলদে—তাং তাং তাং তাং বোলে—আর নসু নেচেছিল ঝম্‌ঝম্—ঝম্‌ঝম্—করে নূপুর বাজিয়ে। ভাঁজো থেকে সে এনেছিল ভাদু। তার কারণ ভাঁজোতে পাড়ার হৈ হুল্লোড়—মদের নেশা তার ভাল লাগে নি।

বর্ধমান গিয়ে সে ভাঁজো এনেছিল। বলে—বর্ধমানের মহারাণীর কাছে সে প্রথম গিয়েছিল—তার ভাদু নিয়ে। মহারাণী তাকে না কি ডেকেছিলেন—ভাদুর মা বলে। সেই 'ভাদুর মা' নামটিই তার সব থেকে প্রিয় নাম। এবং সে সেই ভাদুর মা হয়েই থেকে গেছে মেয়ে সেজে।

এখন বাস তার চন্দনপুরে। হাঁসুলীবাঁকের বাঁশবাঁদি গাঁ—যুদ্ধের সময় শেষ হয়েছে মড়কে-দুর্ভিক্ষে—তারপর এসেছিল সর্বনেশে ঝড়, নসু ত বলে 'চাইকোলোন'। 'চাইকোলোনে'র পর কোপাইয়ে ক্ষ্যাপা

বান। যুদ্ধের কি কাজে বাঁশ লাগে—সে জানেন ভগবান আর জানে যুদ্ধ যারা করতে এসেছিল—সেই তারা—সেই রাঙাওলমুখোরা; সেই ডাকাবুকো করালীর 'ম্যানেরা'। বাঁশবাঁদির সেই পাঁচীরের মত বাঁশের ঘের কেটে ফাঁক করে দিলে; কোপাইয়ের ক্ষ্যাপা বান—কলকলিয়ে খলখলিয়ে এবার ঢুকল সন্ধ্যের মুখে; দোর খোলা ঘরে হেরে-রে-রে করে ডাকাতের মত। সব লুটে-পুটে, ভেঙে-চুরে, প্রাণে মেরে দিয়ে চলে গেল। আর চেপে গেল বালি।

বাঁশবাঁদির কাহাররা হল হা-ঘ'রে। দিগদিগন্তরে এ গাঁয়ে ও গাঁয়ে চলে গেল। সে, পাগল আর সুচাঁদ এসেছিল চন্দনপুর। সুচাঁদ চন্দনপুরের ইস্টিশানের ধারে বটতলাতে বসে বলত—হাঁসুলীবাঁকের উপকথা। এ শুনত ও শুনত—মুচকে মুচকে হাসত। চলে যেত। শুনত শুধু ঠায় বসে চন্দনপুরের শিবদাদাবাবু। খাতাতে নিকে নিত। নসু আর পাগল দুজনে গাঁয়ে-গাঁয়ে গান করে বেড়াত।

> হাঁসুলীবাঁকের কথা বলব কারে হায়
> চন্নপুরের টেরীকাটা বাবুরা মুখ বেঁকায়।
> জল ফেলিতে নাই চোখে জল ফেলিতে নাই
> বিধেতা বুড়োর খেলা দেখে যারে ভাই।

তারপরে সুচাঁদ পিসী ম'ল—পাগল সাঙাত ম'ল—থেকে গেল নসুবালা—ভাদুর মা। এই চন্দনপুরেই থেকে গেল। লোকের তখন দুঃখের শেষ নাই সীমা নাই—শুধু বাঁশবাঁদি নয়, সব গাঁয়েরই তখন বাঁশবাঁদির দশা। ভাঙা আর ভগ্ন; মাটির ঢিবি—নয় পড়-পড় দেওয়াল—নড়বড়ে চাল। পেটে ভাত নাই, পরনে কাপড় নাই, হালের বলদ গরু নাই, পুকুরে জল নাই, মজে গেছে, সে জল-টুকু আছে তা কাদার গোলানি। দু-চার জনা বেনে-বাস্তি—যারা দোকানদানী করে—তাদেরই বাড়বাড়ন্ত। জমিদারেরা ঘায়েল, মহাজনেরা দেউলে, চাষীরা মরমর। গরীবগুলোর কথাই নাই। চন্দনপুরে জমিদারদের পাকাবাড়ী ছিল অনেকগুলি—তার ওপরে

ধুলো লেগে এমন দশা হয়েছে যে মনে হয় গায়ে মাথায় ধুলো মেখে কোন বড়লোকের কন্থে কি বউ ক্ষেপে গিয়ে হাতে লাউয়ের খোলা নিয়ে পথের ধারে বসে আছে; সাড়া নাই—নড়া নাই, মরা কি জ্যান্ত ধরতে সময় লাগে। তবু সে সময়ে লোকের কি হৈ-হৈ আর রৈ-রৈ। ধ্বজা আর পতাকা—আর মিটিং আর মিটিং। আর চীৎকার! চীৎকার বলে চীৎকার! সে আবার একটা চোঙার ভেতর দিয়ে গগনফাটা চীৎকার। কি ব্যাপার? বুঝতে পারত না নসু। জিজ্ঞাসা করত—বলি হ্যাঁ গো—এ সব কি হচ্ছে মশায়বা? এ সব চেঁচামেচি হৈ চৈ—অঃ হ—কানের পর্দা ফেটে গেল! যেন গ্যাশ জুড়ে নোকের বেটার বিয়ে নেগেছে!

এখন নসুর কথাবার্তায় বাঁশবাঁদির সেই কাহারদের কথা এবং সুরের সঙ্গে চন্দনপুরে শহর থেকে আমদানী করা কথা ও সুর মিশেছে। কেউ কেউ ঠাট্টা করলে বলে—এখন শহরের মানুষ হনু যে! সে বেশ সুর করে। কখনও কখনও ভাঁজোর পুরনো গান গেয়ে নেচেও দেয়।

কালো-জলে, কটা-জলে, মিশেও মেশে না—
কালো কানাই—পায়ে ধরে—ও মন রসনা আমার—
রাধা হাসে না।

ঢোলের অভাবে মুখেই ঢোলের বোল আউড়ে শুধু পায়েই নেচে একপাক দিয়ে দেয়। তাং-তাং তাং-তাং-তাং—ঝুমু ঝুমু ঝুমু ঝুমু—! তারপর বেশ নারীসুলভ ভঙ্গিতে হাত দুলিয়ে অঙ্গ দুলিয়ে চলে যায়।

যাই হোক—এই নতুন এক তাজ্জব দেখে সে প্রশ্ন করে—এ-সব কি? এই চেঁচামেচি—হৈ চৈ! যেন গ্যাশ জুড়ে নোকেদের বেটার বিয়ে নেগেছে! কি বেপার?

—ব্যাপার যে ভয়ঙ্কর—চরম, নসু।

—সে কি রকম?

—দেশ স্বাধীন হল।

—স্বাধীন হল ?

—হ্যাঁ।

—তাতে কি হল ? কি রকমে হল ?

—সায়েবরা রাজা ছিল—তারা তল্পীতল্পা গুটিয়ে দেশে চলে গেল।

—বাবাঃ। সেই রাঙাগুলমুখোরা ? করালী ডাকাবুকোর ম্যানেরা! হেই বাবা!

—হেই বাবাই বটে নস্থু—হেই বাবাই বটে!

—তা পরেতে ?

—কি তা পরেতে ?

—এইবার কি হবে ?

—কি হবে ? দেখবি কত কি হবে। খাবার কষ্ট থাকবে না, পরবার কষ্ট থাকবে না, দেশে মুখ্যু কেউ থাকবে না।

—ওরে বাবা রে! আমি কোথাকে যাব রে!

উত্তরদাতা হাসতে থাকে। নস্থু হঠাৎ বলে—তা হলে বল—মরি।

—কেন, মরবি কেন ?

—মরে আবার মায়ের কোলে ছোট হয়ে ফিরে আসি। তবে তো ইস্কুল যাব। লতুন জামা কাপড় পরব!

উত্তরদাতা এবার চুপ করে যায়। কি বলবে এতে ?

বিচিত্র নস্থুবালা বলে—তা হ্যাঁ গা—এ সব হল ক্যানে ? পরক্ষণেই সংশোধন করে বলে—কেন ? বুয়েচ! মুখ ফস্‌কে ক্যানে বেরিয়ে যায়। চামড়ার মুখ তো! তা হল কেন বল দিকি ?

—কেন ? তার উত্তর আমি জানি না।

—হুঁ। কি করে জানবে ? বটে। তা যাই আমি শুধিয়ে আসি গা।

—কাকে ?

—আদারবুড়ীকে। ফুল্লরাকে। খেলোয়াড়ী লইলে তো খেল্ হয় না! গঙ্গারামকে মনে আছে ? ফাং গঙ্গারাম! ময়রার বেটা

মা কামিখ্যের থানে গিয়ে খেল্ শিখে এয়েছিল। সেই একটা হুঁকো বসিয়ে দিত অনেক দূরে—তা পরেতে বলতো—ফেলা বেটা জল ফেলা। আর নলচের মুখ থেকে গাড়ুর নলের মত জল পড়তে লাগত। বলত আউর জোরে—আরও জোরে জল পড়ত। আবার বলত—থাম যা। থেমে যেত। আবার বলত—ফিন পড়—আউর থোড়া—আবার পড়ত। মনে আছে। খেলোয়াড়ীর খেল্। তা সব খেলার মূল খেলোয়াড়ী তো আদারবুড়ী, তাকে শুধিয়ে আসি—বলি গা—আদারবুড়ী এ খেলের মানে কি মা?

আদারবুড়ী ফুল্লরা দেবী এখানকার শ্রেষ্ঠ দেবস্থান। এখানকার লোকে বলে একান্ন মহাপীঠের এক মহাপীঠ। এখানে দেবীর অধরোষ্ঠ পড়েছিল— স্থানের আসল নাম অট্টহাস; তারপর নাম হয়েছিল শ্যামলাবাদ,শ্যামলাবাদ ধ্বংস হলে নাম হয়েছিল চন্দনপুর, কারণ তখন অট্টহাসে দেবীর অস্তিত্ব কেউ জানত না। গভীর জঙ্গলে ঢাকা ছিল। শুধু গন্ধ উঠত চন্দনের। তাই নাম হয়েছিল চন্দনপুর। তারপর এখানে কোপাই নদীর ঘাটে একটা উঁচু ঢিপিতে নৌকো লাগত বর্ষায়—আশপাশ থেকে আসত গন্ধবণিকেরা, বেচা-কেনা চলত, চাল ধান গুড় কলাই লঙ্কা কুমড়ো। তাই ঢিপিটার নাম হয়েছিল বন্দর ঢিপি। পরে কাশী থেকে স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে এক সন্ন্যাসী এসে ওই জঙ্গলের মধ্যে তপস্যা করে দেবীর দর্শন পান। তিনিই মা ফুল্লরাকে প্রকাশ করেন। এই মা ফুল্লরাই নসুবালার আদারবুড়ী—অর্থাৎ আদাড় বা জঙ্গলে থাকেন যে বুড়ী তিনিই আদারবুড়ী। বুড়ী বই কি। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মা; কত তার বয়েস—সে বুড়ী বই কি। আদ্যিকালের বদ্যি বুড়ো যে—তারও মা—বুড়ী বুড়ী মহাবুড়ী।

চন্দনপুরে এসে সুচাঁদ ও পাগলের মৃত্যুর পর এই মায়ের স্থানের কাছাকাছি ঘর তুলেছে একখানি। ছোট্ট ঘর, এক টুকরো দাওয়া, তার কোণে একফালি উঠোন, তার সামনে একটি বুনো ফুল গাছের তলায় একটি বাঁধানো বেদী। আর একটি জবা, একটি অপরাজিতার

গাছ। জবাগাছের ফুল—অপরাজিতার ফুল গ্রামের প্রৌঢ়ারা ফুল্লরা দেবীর স্থানে যাবার সময় তুলে নিয়ে যায়। নসু বলে—একটি ছুটি রেখে লিয়েন মা। ফুলের গাছ ফুল বিইয়েছে—ওর তো ছেলে—সব লিলে পরাণে লাগবে। আর শোভা? মা শোভা হারাবে। তা আমার লেগে মাকে বলেন। বলেন—নসুকে ভাত্বর মাকে পার করো।

ওই বুনো ফুলের নাম কেউ জানে না। থোকা থোকা নীলাভ সাদা যুঁই ফুলের মত—গন্ধ তার খুব। নসু তার নাম দিয়েছে 'দিলপিয়ারা'! হাস্নুহানা নামটি থেকে এই নামটি তার মনে এসেছে। রোজ সকালে উঠে নসু ওই আদারবুড়ীর দরবারে যায়—প্রণাম করে এবং হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চলে আসে। বোবার কথা কালার কাছে। কথাটা বলে একজন পাণ্ডা। অর্থাৎ নসু বোবা—ফুল্লরা কালা। মধ্যে মধ্যে রহস্য করে প্রশ্ন করে নসুকে—নসুবালার কি খবর?

নসু মাথায় ঘোমটা টেনে নতজানু হয়ে প্রণাম করে বলে—এই মাকে বলছিলাম।

—কি বলছিলে?

—বলছিলাম?—একটু চুপ করে থেকে বলে—সে শুনে কি করবেন?

—কি করব? আমি মাকে বলব তোমার হয়ে। মনে পড়িয়ে দেব।

—দেবেন? বলবেন? সত্যি বলছেন?

—নিশ্চয়, সত্যি বলছি। মায়ের সামনে মিথ্যে বলতে আছে?

—আমাদের নাই— আপনাদের আছে। আপনারা যি বলেন।

—আমরা মিথ্যে বলি?

—সেই দিন যি বললেন—আমার ছামুতে।

—কাকে?

—সেই যি—আমি পেনাম করছিলাম। একজনা এসে ঠং করে

রুপোর টাকা একটা আর একখানা লোট দিলে, আপনি কুড়িয়ে লিলেন; আপনকার শরীক এসে শুধালে, কি দিলে—আপুনি রুপোর টাকা দিয়ে বললেন—এই। লোটটা দিলেন না। মিছে বলা হল না?

চটে যাবার কথা, চটে যান পাণ্ডাঠাকুর। কিন্তু কি বলবেন ভেবে পান না।

নস্থবালা বলে—তা আপুনি তো সত্যি বললেই পারতেন—মায়ের হুকুমেউ টাকাটো নিয়েছেন আপুনি।

অবাক হল পাণ্ডাঠাকুর—নস্থ বলেই যায়;—আপুনি মাকে জানেন, মা আপনকাকে জানেন! সেবা পুজো তো সবই আপুনি করেন। ওরা তো করে না। শুধু ভাত পাঁঠা খায়, মদ খায়—হ্যারে-রে করে। আমি দেখি, আদারবুড়ীকে শুধিয়েও দেখিছি। সি দিনে যখন টাকাটি ট্যাঁকে গুঁজলেন তখন আমি হেই মা করে বাঁচি না। বাবা রে, আপনকার মতন নোক চুরি করলে! তখন মাকে বললাম—মা বেপারটি কি বল! মা বললে—উদিকে লুকিয়েছে, কিন্তক আমি—আমি তো ড্যাবডেবে চোখ মেলে চেয়ে সব দেখেছি। আমাকে লুকিয়ে তো চুরি করে নাই। তা হলে না হয় চোর হত! মনে হল 'তা বটে।' মাকে তো লুকোয় নাই! বুয়েচেন বাবা, তবু সন্দেহ যায় না গো। তখন বললাম—আমার মনে মনে বললে হবে না। তোমাকে বলতে হবে মা! হ্যাঁ। তা কি করে বলবে? কথা কয়ে বললে অপর নোকে শুনবে। তা—। এই দেখেন এই খিলেনের মাথার ওপর থেকে থপাস করে পড়ল—এই বড় টিকটিকি। পড়ে আমার মুখের পানে—বাবা—সে কি ড্যাবড্যাবানি চাউনি গো! এই কালো মটরের মত দুটো চোখ। একদিষ্টে চেয়ে রয়েছে আমার পানে। আমি আর ডরে বাঁচি না। বলি, এমন করে চোখ দিয়ে গিলে খাস না মা। তখন বলে কি—ঠিক-ঠিক-ঠিক। হাত জোড় করে বললাম —কি ঠিক মা? পাণ্ডাঠাকুর পাপ করেছে? তা আর রা কাড়ে না।

চুপচাপ। তখন বললাম—তবে কি বলছিস—চোর লয় ?—তু ওকে দিয়েছিস! অমনি বলে—ঠিক-ঠিক-ঠিক। বাস্, বলেই দে ছুট।

পাণ্ডাঠাকুর এবার হেসে বলেন—তোকে ফাঁকি দেবার জো নাই! তোর ভক্তি আছে—চোখ আছে।

—থাকবে না ? চিরকাল তো ওই করেই এলাম গো। ঘর নয়, সংসার নয়, শুধু আমার ভাতুমণি, আর আমার মা ওই আদারবুড়ী। এই দেখেন—ভাতুমণি তো আমার মাটির—তা আমি মুখের পানে চেয়ে থাকি—ঠিক বুঝতে পারি খিদে লেগেছে কি না, ঘুম পেয়েছে কি না। মধ্যে মাঝে বকি—তা মুখটি শুকিয়ে যায়। আমি দেখতে পাই। ওই থেকেই আদারবুড়ীর ইশেরাও বুঝি খানিক আদেক। কিন্তু আপনি। ওরে বাবা! মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ কাম কাজ আপনার। আপনার মিছেতেও পাপ নাই, সত্যিতেও পুণ্যি নাই। তাই তো বলছি বাবা, আমার কথা শুনে আমার মন রেখে বললেন—হ্যাঁ ভাতুর মা, মাকে বলব তোর কথা। তা পরেতে ঘরে গিয়ে হাসবেন। বলবেন—মরণ দেখ দিকি—ছোটনোক ভাতুর মায়ের কথা দেখ দিকি। ওর কথা নাকি মাকে বলা যায় ?

—না—না। তিন সত্যি করছি মায়ের কাছে—বলব—বলব—বলব।

—বেশ, তবে শোনেন।

'শোনেন' বলেও কিন্তু থেমে যায় নসু। একটু থেমে বলে—যেন হাসবেন না।

—না—না, হাসব কেন ?

হাত জোড় করে মাকে বলি—মা আদারবুড়ী বল মা, আমার যাবার সময় হল কি না?

—হুঁ। তা কি বললে মা ?

—রা কাড়ছে না গো। এই দেখেন কতক্ষণ 'ডাঁড়িয়ে' আছি। তা আমার ঠেকন তো ওই টিকটিকিটা, তা একবারও টক্‌টকালো

না। বললাম—হইছে মা সময়? টক্‌টকিয়ে বল! তা চুপচাপ! তা বাদে বললাম—তা হলে বল হয় নাই? তাও চুপচাপ। রাও নাই সাও নাই!

—সে জেনে আর কি করবি? যেতে তো হবেই। আজ আর কাল!

—এই কথা বাবা, আজ আর কাল, কিন্তু আজ যেতে হলে উয্যুগ চাই। কাল হলে কাল। সেইটি জানতে চাইছি। তা হলে উয্যুগ করে বসে থাকি। মায়ের নাম করি—মা-মা-মা-মা-মা—। তা না হলে হঠাৎ সেই যমদূত—। বাবা গো!

বলে শিউরে ওঠে নস্থ। তারপর বলে—মশায়, আচমকা মাথার চুল খামচে ধরে টেনে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে নিয়ে যাবে। মা-বাক্যি মুখে বেরুবে না—বেরুবে—না-না-না-না। মা-মা আগে থেকে বলতে লাগলে বেটা যমদূত এসে পিছু হটবে; হাত বাড়িয়ে—হাতে খিল ধরবে। তখন শিবদূত আসবে। এসে হাত ধরে বলবে—চল্ গো ভাতুর মা—মা তোকে নিতে পাঠিয়েছে। কোথা যাবি বল? কৈলেসে না বৈকুণ্ঠে না ইন্দরাজার স্বগ্‌গে। যমদূত পালাবে।

হাসেন পাণ্ডা। বলেন—তা কোথা যাবি তুই?

—আমি বাবা স্বগ্‌গের চন্নপুরে যাব।

স্বর্গের নতুন ঠিকানা শুনে অবাক হতে হয় পাণ্ডাঠাকুর। প্রশ্ন করেন, স্বগ্‌গে চন্নপুর আছে নাকি?

—নাই? নিশ্চয় আছে। তা লইলে এ গাঁয়ের বাবুরা সেই সব এই—এই বাবুরা—সব সাধকরা—সব নোকজনেরা গেল কোথা? আমার মা, সুচাঁদ পিসী, পাগল স্যাঙাত, পাখিমণি, বসনদিদি, বেনোয়ারী সব গেল কোথা? কোথা কাজকাম করে খায়?

পাণ্ডাঠাকুর হাসলেন নস্থর এই অদ্ভুত পরিকল্পনা শুনে। হেসে নিয়ে বলেন—তা আমি বলব। মাকে জিজ্ঞেস করব। যদি বলে—দেরী আছে—তা হলে কি বলব? বলব দেরী কর না মা—বড় কষ্ট দুঃখ—

—হেই মাগো। বাধা দিয়ে নস্থ বলে—তা আবার কখন বললাম! আমার কষ্ট দুঃখ—বলেছি আমি?

—বলিস নাই, কিন্তু দুঃখ কষ্ট তো বটে নস্থ।

—বটে বটে। দুঃখও বটে কষ্টও বটে। দেখ, চালে কাঁকর, চাল মেলে না, কাপড় নাই, তেনা পরে দিন কাটছে। আজ এ মরছে —কাল সে মরছে। দুঃখও বটে, কষ্টও বটে। কিন্তু সুখ নাই? অনেক সুখ। কত দেখলাম বাবা—তা বল! 'যা দেখি নাই বাবার কালে—তাই দেখালে ছেলের পালে।' বাবা—মানুষে কি চেঁচানি চেঁচাচ্ছে বল দেখি নি। সাহেবরা—সেই ওলমুখোরা পালাল বাবা! এই দাঙ্গা হল বাবা! এ সব? এ কি কম ভাগ্যি—কম সুখ গো!

—তা হলে বলব, এখন কিছু দিন বাঁচিয়ে রাখ?

—তা—। তা—বলবে? তাই বলো। হ্যাঁ—এ সব দেখে শুনে তাক লেগেছে বাবা। আকাশে জাহাজ উড়ছে। দুমাদুম বোমা ফেলছে। মানুষ মারছে। রাঙামুখো সাহেবরা পালাচ্ছে। লদী বন্ধন হচ্ছে। বাবা, এ সব দেখে তাক লেগেছে। তা বলো— আর দু দিন দেখতে দাও ভাদুর মাকে। তা পরেতে ও-পারে চন্নন-পুরে গিয়ে গান বাঁধব, নেচে নেচে গেয়ে গেয়ে বেড়াব সবাইকার দুয়োরে দুয়োরে। বুয়েচেন বাবা—ধূয়োটা বেঁধে রেখেছি।—

বলেই আর অনুমতির অপেক্ষা করে না—ধরে দেয় ধূয়ো— —কোমরে হাত দিয়ে হাত ঘুরিয়ে নেচে নেচেই গায়।

—স্বগ্‌গপুরের বাসী শোন মত্তপুরের কথা—
মধুর চেয়ে মিষ্টি সে যে নিমের চেয়ে তিতা—
ও সে মত্তপুরের কথা।

তার পরই থেমে যায়। আর নাই। বলে—বটে কি না—বল বাবা। —বল। অঃ। যত তেতো, তত মেঠো। না পারে কেউ উগলে দিতে, না পারে কেউ গিলে ফেলতে। আঃ। তা লইলে মরতে বসে লোকে বলে—বাঁচাও গো বাঁচাও! 'মর' বললে সবাই

ক্যানে বলে—গাল দিলি আমাকে! হায় রে—হায় রে! হায় রে!

বলতে বলতেই নসুবালা চলে আসে। বেলা অনেক হয়েছে। মাঙনে বের হতে হবে।

চলে আসতে আসতে থমকে দাঁড়ায় নসু। দেখ, পোড়া মনের করণখানা দেখ! বলা হয় নাই। সব কথা তো বলা হয় নাই বাবাঠাকুরকে! ফিরল সে।

—বাবা গো! ঠাকুর মশাই!

—কি? ফিরলি যে!

—ফেরলাম বাবা। সব কথা তো বলা হয় নাই।

—আবার কি?

—অভয় ঠাকুর যে বলছে—সব ঝুটা—সব ঝুটা—সব ঝুটা। এ্যাই মুঠো বেঁধে তুই আকাশ বাগে ঘুষি মেরে বলছে—সব ঝুটো। আর কি বলছে—ইনাপ কিলাপ—জিনদা-বাদা। সায়েবরা গেল তো কি হল? ও লোক দেখানো যাওয়া। আসলে বাবুভাইদিগে গমস্তা রেখে আমাদের বাবুদের কোলকাতা যাওয়ার মত। বেলাতে গিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে মুনাফা মারছে। তা আমি বললাম, তা মারবে না? এত বড় রাজ্যি-পাট—লাভ না নিয়ে ছেড়ে দেবে? ও বাবা! অমুনি বলে, চোপরাও; সব ঝুট, এঁটো এঁটো এঁটো! ইয়ের কি মানে বলো।

বাবাঠাকুর বললেন—উ সব আমিও জানি না ভাতুর মা। আমাকে আর জ্বালাস না। বাড়ী যা। আবার কাল শুনব।

—কাল শুনবে?

—হ্যাঁ—কাল।

—আজ রাতে যদি মরে যাই!

—তা যাবি। আর তাই যদি যাস, তবে এর জবাব শুনে কি হবে?

—তা 'মন রসনা বলে'—মন্দ বল নাই। যদি যাইই তবে শুনেই বা কি হবে! কিন্তুক—

—আবার কি ?

—সি দেশ কেমন বটে ?

—কোন্ দেশ ?

—যেথাকে যাব।

—আমি জানি না। এবার তিক্ত হয়ে—রূঢ়ভাবে জবাব দেন পাণ্ডাঠাকুর। ওদিকে কোথা থেকে যাত্রী এসেছে। ওই উত্তর দিকের শিবমন্দিরের ওপাশে জুতো খুলছে। এখুনি এসে দাঁড়াবে। নিশ্চয় প্রণামী পড়বে। তিনি হন হন করে এগিয়ে গেলেন।

নস্থ ফিরল। এবার সত্যি সত্যিই ফিরল।

জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পায়ে চলা পথ—এসে পড়েছে মাঠের ওপর। জঙ্গলের ভিতর অন্ধকার। আলো ছায়ার খেলা। আগের কালে সে কি ঘন জঙ্গলই না ছিল। থমথম করত অন্ধকার। চলতে চলতে একজনে আর একজনের সঙ্গে ঠোকাঠুকি হতে হতে—দাঁড়িয়ে বলত—কে ?

অন্যজনও বলত—কে ?

লোক চেনা দায় হত !

ও পারেও নাকি তাই। অন্ধকার পাগল সেঙাত গাইত—সে গান সেঙাতের সঙ্গে সেও গেয়েছে—

ওরে আমার ভাইরে ?
ও তোর—আলোর তরে ভাবনা কেনে হায়রে ?
অন্ধকারেই পরাণ পাখি সেই দ্যাশেতে যায়রে !
লম্ফ পিদীম চন্দ সূয্যি তাইরে নাইরে নাইরে।

তাই বটে। তাইরে নাইরে নাইরে ! তা হোক।—

না থাক, আছে একজনা ভাই
এগিয়ে এসে হাতটি বাড়ায়—
দুই চোখ তার দুইটি পিদীম—সে কি সে রোশনাইরে।
সেই জনা মোর মনের মানুষ এইখানে খোঁজ পাইরে !

—তা—আরও কিছুদিন বাদে, মা আদারবুড়ী, আরও কিছুদিন বাদে। নয়ন ভরে দেখতে দে মা। দেখতে দে! আঃ—যত তেতো তত মেঠো—এ উগলে কি ফেলা যায়? গিলতে না পারি গলায় নিয়ে—গরুর মতন জাবর কাটছি। তাই আর কিছুদিন কাটি।

। ১ ।

—ব্যাই হে ব্যাই! ও ব্যাই! অর্থাৎ—বেয়াই হে—বেয়াই! ও বেয়াই!

ঘর থেকে 'মাঙনে' বের হবার পথে নিত্য নস্থবালা বড় রাস্তার ধারে একখানা নিতান্ত ছোট, প্রায় তাসের ঘরের মত একখানা ঘরের সামনে ওই বেয়াই বলে ডাক দিয়ে উঠোনে দাঁড়ায়। ঘরখানা ছোট, উঠোনটা ছোট কিন্তু নিকানো তক্‌তকে, ঝক্‌ঝকে, পাশে পাশে ক'টি ফুলের গাছ। সবই বেল ফুলের গাছ—দাওয়ার সিঁড়ির ত্ন-পাশে ত্নটি করবীর ঝাড় আর বাড়ীর পিছনে একটি মধুমালতীর লতা—সেটি উঠেছে বাড়ীর পিছনদিকে একটি আউচ গাছকে জড়িয়ে। আউচের সব ফুলগুলি সাদা। শুধু মধুমালতী ফুল সকালে সাদা হয়ে ফুটে—বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লালচে হতে সুরু করে সন্ধ্যেবেলা টক্‌টকে রাঙা হয়।

ঘরখানি ফটিক বৈরেগীর বাড়ী। নস্থবালার মতই বিশ্বসংসারে ছন্নছাড়া গোত্রছাড়া গোষ্ঠীছাড়া যা বলা যায় তাই। বৈষ্ণবী নেই। ছেলেবেলা বার ত্নই বিয়ে বা মালাচন্দন করেছিল—কিন্তু তারা ফটিকের ঘর করে নি। নিজেরাই পালিয়েছে। বলে গেছে—মুখে ঝাঁটা! অর্থাৎ—ফটিকের। ত্নই বৈষ্ণবীই বলে গেছে। এর পর আর সে বৈষ্ণবী আনে নি।

বৈরাগীর ছেলে তিলক কাটে না; ফোঁটা কাটে না, গান গায় না, ভিক্ষে করে না; পুতুল গড়ে। আগে ত্ন-চারখানা প্রতিমা গড়ত এখন তাও গড়ে না—গড়ে শুধু পুতুল—তাই বিক্রী করে দিন চালায়। ঘাড়নাড়া—তামাক খাওয়া বুড়ো, দাঁত ফোঁকলা বুড়ী, টিক্‌টিকি, ব্যাঙ—এই তার পুতুল।

বৈষ্ণবত্বের মধ্যে বাড়ীতে তার নিজের হাতে গড়া একটি রাখাল বালক কৃষ্ণমূর্তি আছে, তার পূজো মন্ত্রতন্ত্র দিয়ে করে না, তবে ফুল

দিয়ে সাজায়, নিজে যা খায় সে তাকে ভোগ দিয়ে নিয়ে খায়, চা, ভাত সবই আগে তার সামনে নামিয়ে দেয়। শুধু রাখালবেশী কৃষ্ণ। রাধা বা গোপিনী এ সব নেই।

নস্থুর সঙ্গে এই কৃষ্ণটিকে নিয়েই তার বেয়াই বেয়ান সম্পর্ক।

নস্থু হল ভাদুর মা। নস্থুর ঘরে আছে মাটির গড়া ভাদুরাণী। যারা ভাদু পূজো করে—তারা পূজোর শেষে ভাদু ভাসায়। নস্থু ভাসায় না।

ভাদুর গল্পটা বাংলাদেশে মানভূম থেকে এ অঞ্চলে অনেকে জানে কিন্তু কলকাতা এ অঞ্চলের কোন শহর নয়, এ অঞ্চলের কাছাকাছি হলেও—এ দেশে হলেও, কলকাতার আসল ফটক হল জাহাজঘাটায়, এখন হয়েছে দমদমে, হাওড়া স্টেশনে যে ফটকটা ওটা হল খিড়কী—নাচ দরজা। স্থতরাং কলকাতার লোকে অনেকে জানে না হয় তো।

প্রবাদ আছে—বাংলাদেশের বন অঞ্চলে এক রাজা ছিলেন। ভাদু তাঁরই কন্যা—ভাদ্রমাসে জন্ম বলে ভাদু, সে মেয়ে ছিল অপ্সরীর মত রূপসী। রাজার বাড়ীতে ছিল যুগল বিগ্রহ। মেয়ের ছেলেবেলা থেকে এই ঠাকুরে অনুরাগ। ক্রমে সে বড় হল, যুবতী হল। বিয়ের সম্বন্ধ আসতে লাগল, কিন্তু কোন সম্বন্ধই মেয়ের পছন্দ হল না, কোন না কোন ছুতো করে খুঁত ধরে ফিরিয়ে দিল। জোর করলে কাঁদতে লাগল—আহার নিদ্রা বন্ধ করলে। ক্রমে লোকে কানাকানি স্থরু করলে যে, তা হলে মেয়ে কাউকে ভালবাসে। যার কথা বলতে পারছে না বাপ-মাকে। বাপ-মায়েরও সন্দেহ হল। এর পর তীক্ষ্ণ নজর রাখতে গিয়ে দেখা গেল, রাজকন্যা ভাদু—গভীর রাত্রে ঘরে থাকে না। দাসীরা সভয়ে রাজাকে জানালে কথাটা। রাজা সেদিন প্রায় গোপনে পুলিসের মত নজর রাখলেন। ঠিক ছু'পহর হল, ঘড়িতে ছু' পহর বাজাল প্রহরীরা, মাঠে ডাকল শেয়ালেরা, গাছে ডাকলে পেঁচারা; রাজা দেখলেন, মেয়ে বেরিয়ে এল রাজবাড়ীর খিড়কী দিয়ে। চলল সে ঠাকুরবাড়ীর দিকে। রাজা আশ্চর্য হলেন

৯৭৭৯

—তখনও মন্দিরদরজা খোলা, ঘরে প্রদীপ জ্বলছে। কন্যা ঘরে ঢুকল, দরজা বন্ধ হল; রাজা এসে সতর্ক পদক্ষেপে—দরজায় কান পেতে দাঁড়ালেন। ঘরে—খিল-খিল হাসিতে ভেঙে পড়ছে মেয়ে। তার সঙ্গে পুরুষের কণ্ঠের হাসি। তারপর সুরু হল নাচ গান, মেয়ে গাইছে, নাচছে।

রাজা দরজায় ঘা দিলেন। সব স্তব্ধ হল।

রাগে রাজার দিগ্বিদিক জ্ঞান ছিল না, তিনি ভেবেছিলেন—পাপিষ্ঠ পুরোহিত আগে থেকে ঘরে লুকিয়ে আছে। প্রেমালাপ চলছে তার সঙ্গে। রাজা ক্রোধে অস্থির হয়ে—ছুতোর ডেকে দরজা ভাঙালেন। দেখলেন, ঘরে আছে বিগ্রহ—আর তার সামনে বিগতপ্রাণা কন্যার দেহ।

রাজবাড়ীতে যুগল বিগ্রহের পাশে ভাদুরাণীর মূর্তি গড়ে স্থাপন করেছিলেন ভাদুর রাজা বাপ, সে আজও আছে। সেই সঙ্গে ভাদুর পূজোরও প্রচলন হয়ে গেল সারা দেশে। ভাদু ভালবাসতেন নাচ গান। ওই নাচগানেই নাকি ঠাকুর ভুলেছিলেন।

নসু ভাদুর মা। তার ভাদুরাণী আছে। কিন্তু তার তো প্রেমাস্পদ ঠাকুর চাই। দেশে বামুন কায়স্থ সদ্‌গোপ মশায়দের ঠাকুর আছে। কিন্তু তারা সদ্‌জাতের বাড়ীর কৃষ্ণ। তার ভাদু—তার কন্যে—সে তো নীচকুলের ঘরের ভাদু কন্যে—তার সঙ্গে সদ্‌জাতের বাড়ীর কৃষ্ণঠাকুরেরা প্রেম করবে কেন? করতে পারে অবিশ্যি—যেমন বাবুদের বা বামুন কায়েতের ছোকরারা দু-চারজনে—তাদের ঘরের কন্যেদের সঙ্গে গোপনে রাত্রিকালে দেখাশুনো করে। তাতে নীচকুলের মেয়েদেরই সর্বনাশ হয়—বাবুদের ছোকরারা হাত পা ধুয়ে বাড়ী ঢোকে। দিনে চিনতে পারে না, বাড়ীর দোরে গিয়ে দাঁড়ালে—লোক দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। ছোটতে বড়তে, রাজাতে প্রজাতে, ধনীতে ভিখীরিণীতে প্রেম হয় না; করতে নেই। তাই সে-দিকে সে তার ভাদুকে নিয়ে যায় নি। চন্দনপুরে এসে—আলাপ হল

ফটিক দাসের সঙ্গে। সংসারে একা মানুষ। ভালমানুষ। কারুর ভালোয় নেই, মন্দতে নেই; পুতুল বেচে খায়। বাড়ীতে বিড়ি টানে —পুতুল গড়ে। ও-ই ওর বাড়ীতে এসেছিল ভাদু নিয়ে গান গাইতে।

ফটিক বলেছিল—তোমার ভাদুমণি আছে—আমার যাদুমণি আছে। দেখবে?

বলে সে বের করে এনেছিল মাটির রাখালকৃষ্ণ, এক হাতে পাঁচনি —অন্য হাতে বাঁশী!

নসুবালা বলেছিল—হায় হায় হায়—আমার ভাদুমণির কি কপাল গো, আজ কার মুখ দেখে উঠেছিল। আঃ ছুঁড়ির যৈবন বয়ে যাচ্ছিল—কালাচাঁদ আসে নাই। মা গো তাই কি জানি যে এই বাড়ীর দোরে দাসের ঘরে বাসা বেঁধে লুকিয়ে বসে আছে? লে— পেনাম কর। ভাদু - পেনাম কর। শোনা নাচ গান।

সেদিন নাচগান সেরে যখন বাড়ী ফিরেছিল—তখন তাদের বেয়াই বেয়ান পাতানো হয়ে গেছে; তার ভাদুরাণী সেদিন ফটিকদাসের বাড়ীতে যাদুমণির কাছে থেকে গিয়েছিল। রেখে এসেছিল নসুবালা।

এই বেশ হয়েছে। মেয়ের মা হিসেবে যা চেয়েছে - তাই পেয়েছে। "গরীবের মেয়ে ছোটজাতের মেয়ে,"—সে তার ভাদু পুতুলের মুখের কাছে হাত নেড়ে ঘাড় নেড়ে বলেছিল—মা,—বামুন কায়েত সদ্‌গোপ—এদের ঘরের ছেলেপুলের দিকে তাকাস না মা। তাকাতে নেই। ওরা সব টিয়েপাখি। সবুজ রং লাল ঠোঁট বাহার অনেক—কিন্তুক মা—ওরা আসে ধানের সময়, ধান খায়—তার পরেতে ধান ফুরুলে ফুরুৎ ধা। তার চেয়ে আমাদের শরক শালিক ভাল। আমি যা বাছলাম—এ শরক শালিকের চেয়েও ভাল— কালো কোকিল। হুঁ। মন পাতিয়ে থেকো। ল্যাই (ঝগড়া) করো না। নাচ গান শুনিয়ো। হোক।

পুতুলটিকে এই কথাগুলি বলে, এসেছিল নিজের বাড়ী এবং পরের দিন সকাল হতে-না-হতে গিয়ে ডেকে তুলেছিল ফটিক দাসকে।

—বেয়াই হে—ওঠ—ওঠ! শুনছ, ওঠ!

বিরক্ত হয়েছিল ফটিক।—কি? অঃ এখনও কাক কোকিল বাসা ছাড়ে নাই—। কি ব্যাপার? ভাদুকে রেখে ঘুম হয় নাই বুঝি?

—তুমি বেরসিক। আমি জানতাম তুমি রসিকজনা!

—ক্যানে? বেরসিক তুমি! ভাদুর যাদুর ভোরের ঘুম ভাঙাতে এসেছ!

—এসেছি সাধে! কোকিলে কি বলছে শোন!

—কি বলছে?

—'কত নিদ্রে যাবে ভাদু কালো মানিকেরই কো-লে!' ওহে লোকজন উঠলে তাদের ছামনে ভাদু আমার তোমার যাদুমণির ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে কি করে, কোন্ মুখে। বলে—"পিরীতি করিবি—গোপনে রাখিবি—তবে তো থাকিবি সুখে।" ওর সব রস সব সুখ—ওই তো ওইখানে! লাও—লাও। কুঞ্জভঙ্গ কর। আমি চাদর ঢাকা দিয়ে ভাদুকে নিয়ে পালাই! তুমি দেখ যাদুমণির গালে—কি কপালে কি বুকে সিঁদুরের দাগটাগ লেগেছে কিনা। লেগে থাকলে মুছে দাও, নয়তো নীল রঙে তুলি দিয়ে ঢেকে দাও।

দুটি সৃষ্টিছাড়া মানুষের এই সৃষ্টিছাড়া খেলা। পাগলই হোক আর বর্বর হোক আর কুসংস্কারাচ্ছন্নই হোক—মরণ যতদিন না হয়—ততদিন ওরা থাকবে এবং ততদিন ওরই মধ্যেই ওদের পরম আনন্দ। পুতুল নিয়ে খেলে দিন কেটে যায়। হয়তো বিধাতার সৃষ্টির অপব্যয়, হয়তো পৃথিবীর—দেশের—এই অঞ্চলের জমাখরচের হিসেব-নিকেশের খাতায়—ওরা অমার্জনীয় বাজে খরচ।

ওদিকে কাল চলেছে—দ্রুততম গতিতে। মোটরের চাকায় রেলগাড়ীর চাকায় ঘণ্টায় অন্ততপক্ষে তিরিশ মাইল বেগে। এরা

পুরনো কালের পুরনো ক্ষয়ে-যাওয়া বাঁশের লাঠি ধরে কোনরকমে পায়ে হেঁটে ঘণ্টায় দু মাইল গতিতে চলেছে। সব থেকে আশ্চর্য লাগে নস্যুর—পাশের গাঁয়ের চক্রবর্তী বাড়ীর গেছো মেয়েটা বাইসিকিল চড়ে ইস্কুল আসে। এ গাঁয়ে নিত্য দত্তের আইবুড়ো ধিঙ্গি দস্যি মেয়েটা বাইসিকিল চড়ে বাজার যায়। এই মেয়ে ছুটো পাশ কাটিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে চলে যায়। যাবার সময় আচমকা ঘণ্টা বাজিয়ে দেয়—ঠিনি-নি-নি। চমকে উঠে নস্যু হাত দুই সরে গিয়ে বলে—হেই মা গো! মেয়ের এত বাড়! তারপর খুব হাসতে আরম্ভ করে—বাবারে বাবা—এতও দেখালে হরি।

বেয়াই ফটিক দাস বলে—হয়েছে কি বেয়ান এখন; এই তো কলির সন্ধ্যেবেলা।

নস্যু বলে—না ভাই, সকাল বেলা বল। রাত দোপরে বুড়ো বয়েসে দেখবার তরে জেগে বসে থাকতে পারব না। আর রাত্রি বেলার খেল্ তো চিরকালের খেল্ হে! যা ঘটবার দিনের বেলায় ঘটুক, দেখে শ্যাষ করে সন্ঝে বেলা ঘর যাব।

—তা তাই বলছি। সকাল বেলাই হল। দিনের বেলাতেই সব ঘটবে। ঘটছে। দেখতে তো পাচ্ছ গো।

—'তা দেখছি। কিন্তু বেলা বেড়ে যেছে—' বলেই নস্যু বলে—এই দেখ জিভখানার কাণ্ড দেখ দিকিনি। ফস্কে বলে ফেলিয়েছে—'যেছে'; যাচ্ছে—যাচ্ছে। কেমন কিনা, "চন্ননপুর ছিল বাঁশের বন—পাতা পড়লে কুলো হত, ডাল পড়লে ঢেঁকি হত, ছিল শেয়াল সাপের বিচরণ। কে জানে কি হল—মন আমার হরি বলো—সেই চন্ননপুর হয়ে গেল সিংহাসন।" দুখের মধ্যে রাজা নাই; রাণীমা নাই; গিন্নীমা নাই—আছে শুধু ফতোবাবু—আর বিবির দল। এখানে হচ্ছে-খাচ্ছে-যাচ্ছে-গেচ্ছে বলতে হবে!

মুহূর্তের নিশ্বাস নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে হেসে মুখের দিকে তাকিয়ে বলে—এখন চল। বেলা হয়ে "যা-চ্ছে"—বেরিয়ে পড়। তুমি লাও

পুতুলের ডালা—আমার ঝুলি কাঁধে। চল পালা সেরে আসি আর নতুন কালের খেলা দেখে আসি নয়ন ভরে।

সপ্তাহে দুদিন হাট—সোমবার আর শুক্রবার; এ দুদিন হাটেই কাটে একটা বেলা। ফটিকদাস চ্যাটাই বিছিয়ে পুতুল সাজিয়ে বসে। নম্রবালা হাতে ঘুঙুর বেঁধে ডুবকী বাজিয়ে গান গায়। বাকী পাঁচ দিনের একদিন গাঁয়ে, বাকী চার দিন চারপাশের গ্রামগুলিতে পালা করে চলে যায় তারা। কোন কোন দিন এতে ছেদ পড়ে যায়। হঠাৎ চোখে পড়ে চারপাশের গাঁয়ের লোক এসে ভিড় করেছে—বি.ডি.ও. আপিসের ধারেকাছে। উত্তর দিকে বাজারের প্রধান রাস্তা, চওড়া রাস্তা—এখন আবার পিচ পড়েছে; দুপাশে দোকান পশার; মিষ্টির দোকান, কাপড় মণিহারির দোকান, দর্জির দোকান, সিমেণ্ট লোহা-লটকোনের দোকান তো অনেক। দত্ত মশায়দের ধানচালের গদী, মণ্ডলদের গদী, দাসদের গদী—একটু ভিতরে সাহা মশায়ের ধানচাল লটকোনের কারবার, বড় সাহার গাঁজা মদ আপিংয়ের সঙ্গে কাপড়ের দোকান; এরই ভিতরে মধ্যে মধ্যে চায়ের দোকান—চেয়ার টেবিল সমেত; তার মধ্যে গোটা দুয়েক চুলকাটা সেলুনও হয়েছে; দস্তুর মত ঘাড়ে পাউডার মাখিয়ে ক্লিপ দিয়ে চুল ছাঁটাই হয়। স্টেশনের ধারে গোটা চারেক কয়লার ডিপো। পূর্বে পশ্চিমে-দক্ষিণে ত্রিভুজের মত আকার দিয়ে তিনটে রাইস মিল, একেবারে পশ্চিমে, পশ্চিম কোণের রাইস মিলটা ছাড়িয়ে ছেলেদের স্কুল-বোর্ডিং, তারও ওদিকে—আগে ছিল চ্যারিটেবল ডিসপেনসারী, এখন হয়েছে হেল্‌থ সেণ্টার, পঁচিশটে বেড আছে—দরকার হলে বাড়িয়ে তিরিশটাও করা হয়। তারও পশ্চিমে গ্রামটা আরও খানিকটা বেড়ে গিয়েছে সড়কের পাশে পাশে। সড়কটা গিয়ে মিশেছে একটা বটগাছতলায় আর একটা আরও বড় সড়কের সঙ্গে—যেটা গ্রামের দক্ষিণ দিক বেড়ে বাইরে বাইরে মাঠের বুক চিরে চলে গেছে

নদী পার হয়ে—এ জেলা থেকে বর্ধমান জেলার প্রান্তভাগ দিয়ে অজয় ও গঙ্গার সঙ্গমঘাট পর্যন্ত। আবার গঙ্গার ওপারে অগ্রদ্বীপ থেকে—চলে গেছে—মুর্শিদাবাদ। নতুন এই বসতি শুরু করেছিল সাঁওতালরা, দুমকা জেলার জুতাসেলাই যারা করে—সেই সব আধা হিন্দুস্থানী মুচিরা—তারপর তাদের বসতি কিনে বসেছে ব্যবসায়ীরা। এরা বড় ব্যবসায়ী নয়, ছোট। খুচরো ধানচাল কেনে। খান দুই চায়ের দোকান—একটা মিষ্টির দোকান আছে। কয়েকখান লটকোনের দোকান। একজন কামার এসে কামার-শাল খুলেছে। জন দুয়েক দুমকার কাঠমিস্ত্রী কাঠের কারবার করেছে। গাড়ীর চাকা, ঘরের দরজা জানালা তৈরী করছে দুমকার ডাঁসা শাল থেকে। এর মধ্যে আবার আটঘড়া গাঁয়ের সেখেদের ছেলে—হাফিজ সেখ করেছে চেয়ার টেবিল তক্তাপোশের কারখানা। আবার রকমারি যত ফ্যাসানের 'বেরাকেট' তৈরী করছে জামাকাপড় ঝুলিয়ে রাখবার জন্যে; দেওয়াল-আলনা, তাও তৈরী করে। কেনে প্রায় সবাই। সবাই অর্থে নসুদের পাড়ার মানুষেরা—ফটিকদাসের মত মানুষেরা বাদে সকলে, গরীব গেরস্ত যারা—যাদের কাপড়জামা ময়লা এবং ছেঁড়া সেলাই করা তারাও কিনেছে।

আরও যে কত কারখানা হবে—সে নসু ফটিক জানে না। তবে গুজব তাদের কান এড়ায় না। শুনছে নাকি কলেজ হবে, আর গেরামের দক্ষিণে যে বড় সড়ক চলে গিয়েছে গঙ্গার কূল—তার দক্ষিণে হবে সারি-সারি সরকারী আপিস।

যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল নসুবালা।—ও বেয়াই।

ফটিকদাসও দাঁড়িয়েছিল—সে বললে—তাই তো হে! এত ভিড়?

দূরে ভিড় জমেছে।—কি বেপার?

বি. ডি. ও. আপিস থেকে ওদিকে ইস্কুল, সাবরেজেস্ট্রী আপিস হাসপাতাল পর্যন্ত ভিড় থাকেই। এখান থেকে ওখানে রাস্তাটা মাপে বড় জোর সিকি মাইলের কিছু বেশী, এই সিকি মাইলে দেড়শো

ছুশো লোক ছড়িয়ে থাকে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত। দশটায় ভিড়টা বাড়ে। আবার চারটে থেকে কমতে সুরু করে। আজকের ভিড়টা বি. ডি. ও. আপিস পার হয়ে একটু আগে আশু সিংয়ের ডাক্তারখানা হতে ওদিকে থানা পর্যন্ত জমে রয়েছে।

ফটিকদাসের অনুমানের পরিধি নসু থেকে বেশী। সে বললে—খুনখারাপী বটে!

—খুনখারাপী? হেই মা গো!

—হুঁ।

—কি করে বুঝলে?

— ইদিকে আশু ডাক্তারের ডাক্তারখানা—উদিকে থানা। ডাক্তার বেঁধেছেঁদে দিচ্ছে—আর উদিকে থানাতে নালিশ হচ্ছে। বুঝেছ?

—পালিয়ে এস। উ মুখে যেয়ো না। চল বাঁয়ে ফিরি। ইস্টিশানের দিকে যাই। এস!

—চল কেনে, দেখে আসি!

—না। কাজ নাই।

শান্ত কণ্ঠে মৃদুস্বরে কথা বলে ফটিক—কোন খোঁচাতেই—কোন বাতাসেই তার জীবন এতটুকু বেশী উত্তপ্ত হয় না, সে তেমনিভাবেই বললে—তুমি যাও। আমি তো আপিসের ছাম্‌নে বসব—তাই বসি গে, রথ দেখা কলাবেচা ছুইই হবে।

নসুর থানাকে যত ভয়—রক্তারক্তিকে তত ভয়। সে সত্যিই মোড় ফিরল। —হরিবোল—হরিবোল, ভাদুর মা—তোর দেখে কাজ নাই; চল ভিন্ দিকে চল।

আপন মনেই বলতে বলতে চলে—মা মনসা বেনে বেটাকে বলেছেন– সব দিক চেয়ে দেখো মা—দখিনদিক পানে নয়ন ফিরিয়ো না। যেদিকে খুনখারাপী রক্তারক্তি লালপাগড়ী—সেই দিকই দখিন দিক। পালা ভাদুর মা—পালা।

॥ ২ ॥

ব্যাপার বা ঘটনা একটি নয়, দুটি।

আশু সিংহীর ডাক্তারখানায় চন্দনপুরের উত্তরপাড়ার বড়বাড়ীর বড় তরফের গোপাল চৌধুরীকে নিয়ে এসেছে। চৌধুরীর মাথা ফেটেছে। কপালের ঠিক উপরেই প্রায় দেড় ইঞ্চি লম্বা ক্ষত। মুখ থেকে বুক পর্যন্ত রক্তে ভেসে গেছে। সঙ্গে তার ছেলে শুভেন্দু। ম্লান মুখে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে আছে, ডাক্তারখানার দরজার বাজুতে ঠেস দিয়ে। ভিতরে আশু সিংহী গোপালবাবুর মাথাটা ড্রেস করছে।

সামনে রাস্তায় লোক জমে আছে। টুকরো টুকরো কথা এখান ওখান থেকে উঠে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

—নিজেই।

—নিজেই ?

—হ্যাঁ, একখানা কাঠ নিজেই মাথায় মেরেছে।

—কি ব্যাপার ?

ভিতর থেকে চৌধুরীর আর্ত চীৎকার ভেসে এল—না—না··· এমন করে মরার উপর খাঁড়ার ঘা মেরো না! জ্বলে যাচ্ছে। ছেড়ে দাও।

বাইরে লোকজনের মধ্যে থেকে কেউ বলে উঠল—আরও জ্বলবে। এখন হয়েছে কি ?

—কে—রে ? প্রশ্ন করলে এদিক থেকে অন্য কেউ। সঙ্গে সঙ্গে অনেক লোকই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে—নীরবে প্রশ্নটির পুনরুক্তি করলে। শুধু শুভেন্দু ফিরেও তাকালে না। এ প্রশ্নের জবাব কেউ দিলে না। কিন্তু কয়েকজনই মাটির দিকে চেয়ে রইল। হয়তো বা,—তারা মুখ তুললে তাদের মুখে চাপাহাসির একটি সূক্ষ্ম রেখা দেখা যেত।

—এই এই সর তো হে। পথ দাও তো!

কণ্ঠস্বর শুনে পিছনে তাকিয়ে তাকে পথ ছেড়ে দিল। ওপাশ থেকে কথা উৎক্ষিপ্ত হল—এই, এলেন।

—হুঁ। চাঁই।

—উঁহু—কংগ্রেসী মোড়ল।

—দূর—রায়বাহাদুর। কংগ্রেসী রায়বাহাদুর।

চন্দনপুরের ভবানী মুখুজ্জে—অনেককালের কংগ্রেসী। জেলখাটা লোক। স্বাধীনতার পর থেকে অবশ্যই মাতব্বর লোক। ভবানীবাবু একবার সেদিকে ফিরে তাকালে—কিন্তু বললে না কিছু। উঠে গেল ডাক্তারখানার বারান্দায়।

শুভেন্দু এতক্ষণে নড়ল—সে হাত বাড়িয়ে ওপাশের বাজুখানা ধরে বললে—যাবেন না আপনি।

ভবানীবাবুর কপালে কুঞ্চন রেখা ফুটে উঠল—বিস্মিত হলেন-প্রশ্ন করলেন—যাব না?

—হ্যাঁ। উনি খুব উত্তেজিত হয়ে আছেন। আপনাকে দেখলে হয়তো বিশ্রী কাণ্ড করবেন।

—মানে? আমার দোষটা কোথায়?

—ঘটনার পর উনি চেঁচাচ্ছিলেন—এর চেয়ে যে ইংরেজ ভাল ছিল।

থমকে গেল ভবানীবাবু। কয়েক মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ বোধ করি কথা খুঁজে পেলে, বললে—থানায় ডায়রী করেছ?

—না।

—করবে না?

—না।

—হুঁ। তা হলে কি করবে?

হেসে শুভেন্দু বললে—বাবা বলছিলেন—ডায়রী ভগবানের কাছে লেখা হয়ে গেছে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভবানীবাবু নেমে চলে গেল।

ঘটনাটা বিস্ময়করও বটে। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বলতে হয়—বিস্ময়েরই বা কি আছে এতে!

চৌধুরীবাড়ী এখানকার দ্বিতীয় সম্পদশালী বাড়ী ছিল। গোপাল চৌধুরীর বয়স এখন বাহান্ন চুয়ান্ন, তাঁর বাপের আমলে ওঁদের প্রতাপে বাঘে বলদে একঘাটে জল না-খাক—চোর এবং গৃহস্থ শান্তিতে পাশাপাশি বাস করত। চোরকে খেতে দিতেন—গৃহস্থকে চুরি হলে থানায় ডায়রী করতে দিতেন না, এবং মাল তিনি ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করতেন চোরকে। জরিমানা নিজে আদায় করতেন। তাঁর আমল বলতে পঞ্চাশ বছর আগেকার আমল—উনিশ শো সাত আট সাল; সে আমলে কেউ তাঁর বা গ্রামের সম্মানিত বাবুদের সামনে দিয়ে যাবার সময়—কম হেঁট হয়ে প্রণাম করে গেলে—ধরে এনে মাথাটা মাটিতে ছুঁইয়ে প্রণাম শিখিয়ে দিতেন। বছরে দুটি পার্বণে গ্রামের ব্রাত্যসমাজ থেকে সপ্তগ্রামী ব্রাহ্মণ-সমাজকে নিমন্ত্রণ করে—পরম সমাদরে খাওয়াতেন—হাত জোড় করে জিজ্ঞাসা করতেন পেট ভরেছে কিনা। আবার বেগারও নিতেন। ব্রাত্য সমাজের বধূ কন্যাদের নিয়ে উচ্চ সম্প্রদায়ের যুবকেরা সে-কালে ব্যভিচার করত —এটাকে তিনি দূষ্য মনে করতেন না। সে ক্ষেত্রে ব্রাত্যেরা ক্ষোভ প্রকাশ করলে—তিনি ডেকে তাদের ধমকে দিতেন—না, এসব নিয়ে গোলমাল কর না। নিয়ে গিয়ে টাকা যদি না দিয়ে থাকে তো বল। না-দিয়ে থাকলে টাকাটা দিয়ে দিতেন।

তিনি মারা গেলে তাঁর ছোটভাই পেয়েছিলেন অধিকার। সে অধিকারকে তিনি তাঁর কালের উপযোগী করে সংশোধন করে নিয়েছিলেন। তাতে বাঁকা তলোয়ারের চেহারা পাল্টে সোজা তলোয়ারে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু তলোয়ারের স্বভাব পাল্টায় নি। তিনি এই অধিকারের উপর একটা সরকারী অধিকার পেয়েছিলেন —প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েৎগিরির অধিকার।

তাঁর মৃত্যুর পর—সেটাও এখন থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে—বাইশ তেইশ সালে—অধিকার এসেছিল এই গোপাল চৌধুরীর হাতে। গোপাল চৌধুরী লেখাপড়া শেখেন নি—সেই হেতু কুনো লোক; তবুও প্রথম প্রথম আধুনিক হবার চেষ্টা করেছিলেন, ইউনিয়ন বোর্ডে—গ্রামের পাঁচটা কমিটিতে সভ্য ছিলেন, থিয়েটারও করতেন, সভা হলে যেতেন, কিন্তু কোনটাতেই সফল হন নি, নিজের পায়ের ছাপ ফেলতে পারেন নি। অধিকার আপনি গেল, তিনি ঘরে ঢুকলেন, কেবল ঘর থেকে যতটুকু হাত যায় তাঁর সম্পত্তির অধিকারের বলে—ততটুকুই আঁকড়ে রইলেন প্রাণপণে। ঘর থেকে কাছারী, কাছারী থেকে গোয়ালবাড়ী, মাঠে যেখানে তাঁর জমি আছে সেখান পর্যন্ত এবং বছরে মাস দু তিন—মহালে মহালে—নিজের গণ্ডী নির্দিষ্ট করে নিয়ে বাস করতে লাগলেন। এই গণ্ডীর মধ্যে পূর্বপুরুষের ধারায় এবং তাঁদের প্রতাপের স্মৃতির প্রভাবে—শাসন করেছেন, পালন করেছেন, কখনও কখনও হুঙ্কারও ছেড়েছেন যতটুকু পেরেছেন। ক্রমে তিরিশ সাল থেকে দেশের পরিবর্তনের সঙ্গে তিনি পাল্টালেন কতটুকু ভগবান জানেন—তবে সভয়ে হাতের মুঠো আলগা করলেন। এই পরিবর্তনে সব জমিদারের অবস্থা খারাপ হল। তাঁরও খারাপ হল তিনি মন্ত্র দীক্ষা আগেই নিয়েছিলেন—এখন তাই নিয়েই মগ্ন হতে চেষ্টা করলেন। বিরোধ তিনি কারুর সঙ্গেই করতেন না। করলেও দেওয়ানী মতে আদালত মারফৎ। তারপর দেশ হল স্বাধীন। সব লোক নাকি হল সমান। হতচকিত হয়ে তিনি আরও ঘরে ঢুকলেন—হে ভগবান! সব সমান! চণ্ডাল ব্রাহ্মণ, বেগার জমিদার, পায়ে মাথায়, সব সমান! পরিত্রাণ কর মা জগজ্জননী, আর নয়।

তারপর এই সম্প্র গেল জমিদারী। সব জমিদারী গভর্নমেণ্ট নিলে। তিনি তাঁর গোয়ালবাড়ীর বাইরের এলাকায় পা-দেওয়াই ছেড়ে দিলেন। গোয়ালবাড়ীর পাশেই একটি বড় পুকুর, ভাল জল,

সকল লোকে স্নান করে আর এই পুকুরের উত্তর পাড়ের উপর ব্রাত্যদের বসত। বাউড়ীপাড়া। এ পাড়া চৌধুরীবাড়ীর হাতের মুঠোর আমলকী। এই পুকুরে তিনি কিছু কাঠ চিরিয়ে ডুবিয়ে রাখিয়েছিলেন—পাকা কাঠকেও পাকা করবার জন্য। হঠাৎ লক্ষ্য করলেন—কাঠ চুরি যাচ্ছে। নিজের সীমানায় দাঁড়িয়ে চাকরবাকরকে বেশী-ই একটু তম্বি করলেন। কিন্তু তাতেও বন্ধ হল না। কোন সন্ধান পেয়ে আজ ভোরে তিনি উঠে গোয়ালবাড়ীতে এসেই দেখলেন—একজন বাউড়ী একখানি কাঠ কাঁধে তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছে। তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ছুটে এসে পিছন থেকে ধরলেন তার চুলের মুঠোয়। হারামজাদ!

ধপ্ করে কাঠখানা ফেলে দিয়ে লোকটা ঘুরে দাঁড়িয়ে মালিককে দেখে থমকে গেল।

গোপালবাবু চুল ছেড়ে দিয়ে হেঁট হয়ে নিজের পায়ের চটি তুলে নিলেন—চোট্টা কাঁহাকা—।

অঘটন ঘটল। লোকটা খপ করে হাত বাড়িয়ে চটিটা ছিনিয়ে নিয়ে তাঁরই মাথায় বসিয়ে দিয়ে ছুটে পালাল।

বজ্রাহতের মত স্পন্দনহীন হয়ে গেলেন গোপালবাবু। তারপর যা হল সে কল্পনাতীত। হয়তো বা গোপালবাবুর কল্পনাতেও তা ছিল না, বোধ হয় একান্ত আকস্মিকভাবে ঘটে গেল, সেইখানে পড়েছিল একটা টুকরো কাঠ। হ্যাড়া বাউড়ী বিক্রী করবার জন্য চেরাই কাঠখানা নিয়েছিল কাঁধে এবং ঘরে পোড়াবার জন্য টুকরোটা নিয়েছিল হাতে, বা দুটোই ছিল কাঁধে—ফেলবার সময় দুটোই পড়েছিল পাশাপাশি ; গোপাল চৌধুরী মিনিটখানেক পর স্তম্ভিতভাব কাটতেই নিদারুণ ক্রোধে বা আত্মগ্লানির ক্ষোভে কাঠখানা কুড়িয়ে নিয়ে সজোরে নিজের কপালে, যেখানে হ্যাড়া তাঁকে তাঁর চটি দিয়ে আঘাত করেছিল—সেইখানটাতে আঘাত করেছিলেন এবং চীৎকার করে বলে উঠেছিলেন—এই নে!

কপালটা গেল ফেটে এবং তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে গেলেন পড়ে। প্রায় পাঁচ মিনিট পরে খবর পেয়ে ছুটে এল শুভেন্দু, তার ছোট নবেন্দু ; গোপালবাবুর খুড়তুতো ভাই নেপালবাবু এবং তার ছোট ভূপালবাবু। তাঁরা এলেন—দেখলেন রক্তাক্ত মুখে গোপালবাবু পড়ে আছেন—সমস্ত বাউড়ীপাড়ার লোক দূরে দূরে আড়ালে আবডালে দাঁড়িয়ে আছে—কিন্তু কেউ এগিয়ে আসে নি।

শুভেন্দু কাকাদেরও ছুঁতে দেয় নি গোপালবাবুকে। ওদের ঘরে ঘরে মনোমালিন্য মর্মান্তিক। বলেছিল—না। সংসারে আমাদের কেউ নেই, আমরা একা। দয়া করে আমাদের ব্যবস্থা আমাদের করতে দিন।

তারপর গাড়ী করে নিয়ে এসেছে আশু সিংয়ের ডাক্তারখানায়। হাসপাতালে নিয়ে যেতে চায় নি। আশু ডাক্তারকে বাড়ীতেই ডাকত—ডেকে ফি দেবার মত অবস্থা আছে, কিন্তু তাতে দেরী হত ডাক্তারকে পেতে। ডাক্তারখানার রোগীদের ফেলে কলে আসা সহজ নয়। কেমন করে এমনটা ঘটল—সে কথা শুভেন্দু গোপনে ডাক্তারকে বলেছে, কিন্তু প্রচার হয়ে গেছে, বাতাসে ভেসে এসেছে।

"আরও জ্বলবে। জ্বলার এখন হয়েছে কি ?"—কথাটি যে বলেছে—তাকে অন্য কেউ না চিনুক শুভেন্দু চিনেছে। সে হল সোনাডাঙ্গার সতীশ আচার্যি। একদিন সে শুভেন্দুদের বাড়ীতেই রান্না করত, ঠাকুর ছিল। সতীশদের সমাজে কন্যার জন্য পণ দিতে হয়—বা হত। অবশ্য অবস্থা ভাল যাদের—তাদের ছেলের এবং লেখা-পড়া জানা ছেলের কথা আলাদা, এবং বামুনঠাকুরের বৃত্তিধারী পাচক ছেলের কথা উল্টোদিকে আরও আলাদা পণ দিয়েও সেখানে কন্যা মেলে না। সতীশের সম্বল ছিল একটি—পুরুষালি চেহারা। ওই মূলধনে এক অব্রাহ্মণ বাড়ীর একটি ভ্রষ্ট চরিত্রা মেয়েকে নিয়ে এসেছিল—ঘর বাঁধতে। গোপালবাবুর সঙ্গে তাঁদের মহালে গিয়ে সেখানেই হয় প্রেমের সূত্রপাত এবং সে-দফা নিরীহের মত বাবুর সঙ্গে ফিরে আসে।

কিছুদিন পর একদা রাত্রে সেই গ্রামে গিয়ে তাকে নিয়ে এসে চন্দনপুরেই লুকিয়ে রেখেছিল। কথাটা প্রকাশ হলে—গোপালবাবু রাগে কাঁপতে কাঁপতে তার গালে একটি চড় মেরে তৎক্ষণাৎ বাড়ী থেকে দূর করে দিয়েছিলেন। এ সতীশ। সেই সতীশ। সতীশ এখন যাত্রার দলে ভাত রান্না করে। সেই মেয়েটি এখনও তার কাছে আছে, এবং যাত্রার দলে ভাত রান্না ছাড়া সতীশ সভাসমিতিও করে বেড়ায় ঝাণ্ডা উড়িয়ে, লোকে বলে, ঐচ ড়ের আক্রোশে।

সে লজ্জা সঙ্কোচ কাউকে করে না। নিজের মনের কাছে যেটুকু লজ্জা, তাও ঐ ঝাণ্ডার ঝাপটায় উড়ে গেছে। ভয়ও সে কাউকে করে না। তবু আজ ঐ কথাটা বলে সে মুখ নামিয়েছে। সেটা বোধ হয়—অনেকদিন ওদের বাড়ীতে ছিল বলে। অথবা অন্য কিছু? হয়তো অন্তরে সমর্থন করলেও সতীশও আজকের ঘটনাটি প্রকাশ্যে উচ্চকণ্ঠে সমর্থন করতে পারছে না।

আশু সিংয়ের ডাক্তারখানার ওদিকে আর একটা ভিড় জমে আছে। সে ভিড়টায় জমাট বেশী। অনেক লোক।

ওখানে বিস্ময় আছে, কৌতুক আছে। এতটুকু আহা উহুর কোন কারণ নাই। কৌতুক রসের পাকটা ওখানে প্রবল উত্তাপে ধরা গন্ধ ছড়িয়েছে। মধ্যে মধ্যে একজন হেঁকে উঠেছে—বাহা রে বাহা রে কলিকাল!

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধ্বনির মত দু-চারজন ধ্বনি তুলছে—তাঁহুরে তাঁহুরে।

অনেককাল আগে এখানে একজন চানাচুরওয়ালা আসত পূজার সময়। ছ'মাস থেকে গেঁজলে ভর্তি টাকা নিয়ে ফিরত। তার হাঁক ছিল—বাহা রে, বাহা রে ভাজা! তারপর ছড়া বলত। সে সব ছড়ার চল তো আর নেই, কিন্তু—'বাহা রে বাহা রে' শব্দটি এ অঞ্চলে শব্দমালা স্থায়ীভাণ্ডারে স্থান পেয়ে গেছে! কৌতুক রস কোনক্রমে

গেঁজে উঠলেই—এই 'বাহা রে' শব্দটি জনতার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে। আর তাঁহুরে শব্দটি এখানে প্রচলন করেছিল কোন এক লাজুক যুবক। কথাটা অর্থহীন। যুবকটি মাঠে ঘাটে একা হলেই আপন মনে চীৎকার করত—'বাহা রে'র সঙ্গে তাঁহুরের ধ্বনিগত সাদৃশ্য আছে বলেই বোধহয় একটা বললেই আরেকটা বেরিয়ে আসে।

আরও অনেক রকম কথার বুদ্বুদ উঠছে। উঠছে ফাটছে।

অর্থহীন কথা।

—শালা মারে ডাণ্ডা!

—ভো—কাট্টা!

—হুঁা—হুঁ! কাটা ঘুড়ি লাট খেয়ে পড়ছে থানার বারান্দায়!

—গোঁত্তা খেয়ে পড়। দে পাক।

—সাত পাক। এক আধ পাকে হবে না।

কে একজন অতি উৎসাহ বা উৎসাহের মত্ততায় উল্লাস প্রকাশের ভাষা না পেয়ে বলে উঠল—চেল্—কিৎ—কিৎ—কিৎ—কিৎ!

সমস্ত জীবন যেন একটা প্রমত্ততা বহুদিনের মজা-পুকুরের পাঁকের মধ্যে গ্যাসের মত সঞ্চিত হয়ে রয়েছে, সামান্য আলোড়নেই তলা থেকে ঘুলিয়ে উঠছে উপরে—ফোয়ারার ধারায়।

ঘটনাটি অবশ্য নতুন না হলেও ঘটনাটির আত্মপ্রকাশের ভঙ্গিটি নূতন। একেবারে নূতন।

একটি উনিশ কুড়ি বছরের যুবতী কুমারী। অধিবাসের অর্থাৎ গায়ে-হলুদের চিহ্ন গায়ে নিয়ে নতুন কাপড় পরে থানার বারান্দায় বসে আছে। মাথায় ঘষা চুল ফুলে ফেঁপে পিঠে এবং মুখের দু পাশ আংশিকভাবে ঢেকে ছড়িয়ে রয়েছে। সম্ভবত আমলার গন্ধও পাওয়া যাবে। না হলে সাবানের গন্ধ।

আজ তার বিয়ে।

রাত্রিতে বাড়ীর সকলে ঘুমুলে সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়েছিল;

লুকিয়েছিল চণ্ডীতলার জঙ্গলে। ভোরবেলা এসে উঠেছে থানায়।

বিয়ে সে করবে না। বাপ মা তার জোর করে বিয়ে দিতে চায়। সে থানায় এসেছে আশ্রয়ের জন্য।

তার বয়স আঠারো বছরের বেশী।

সে বিয়ে করবে না। থানা যদি তাকে আশ্রয় না দেয় তবে সে আত্মহত্যা করবে। তার জন্য দায়ী হবে থানা গবর্ণমেণ্ট।

এর আগে এই ঘটনা ঘটেছে। অনেক ঘটেছে। বিয়ের রাত্রে কনে নিখোঁজ হয়েছে। অপবাদ রটেছে। কিন্তু হয়তো বা সেই দিন—নয় তো বা পর দিন তার দেহ পাওয়া গেছে নদীর দহে। কিংবা সেই দিনই মেয়ে বিষ খেয়েছে। এমনও হয়েছে, মেয়েকে পাওয়া গেছে আট-দশ মাইল দূরে ভিখারিনীর বেশে।

কারুর সঙ্গে পালিয়ে যাওয়া স্বতন্ত্র কথা। তার সঙ্গে এর মিল নেই। এ মেয়ে থানায় এসেছে—বাপ মা সমাজ সবার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য। খারাপ মেয়ে হলে সে এই সুযোগে নিখোঁজ হত—থানায় আসত না। বাপ আসত থানায়। পথের ধারের জনতার কথাবার্তাগুলি এখানে, মৃদুস্বরে হচ্ছিল না। এখানে কোন বেদনা নেই। এখানে উল্লাস—উচ্ছৃঙ্খল উল্লাস রয়েছে, তার প্রকাশ কণ্ঠস্বর উচ্চ থেকে উচ্চতর হওয়াই স্বাভাবিক নিয়ম। এখানেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। কিন্তু মেয়েটি আশ্চর্য। তার কোন চঞ্চলতা নেই। সে স্থির হয়ে আছে।

হঠাৎ ভিড় ঠেলে যেন পড়তে পড়তে এগিয়ে এল নসুবালা। স্টেশন থেকে খবর শুনে সে ফিরে এসেছে। তার থানা পুলিশের ভয় ঘুচিয়ে জেগে উঠেছে কৌতূহল।

—হেই মা। বিয়ের কনে পালিয়ে এসে থানায় এয়েছে। বলে বিয়ে করব না। জোর করলে মরব। গলায় দড়ি, বিষ, কাপড়ে আগুন, জলে ঝাঁপ, বঁটিতে গলা কাটা, ছাদ থেকে লাফানো—মরার তো হাজার পথ। হাজার কেন—লাখো পথ। কিন্তু সে পথ ধরে কে? এত সাহস কার?

যার এত সাহস সে কি মেয়ে গো! ডাকিনী না যোগিনী না ভেরষ্টা না পিশাচী না দেবতা! সে কি নস্থবালার না দেখলে চলে?

নস্থবালা এসে তার মুখের কাছে একটু হেঁট হয়ে ঝুঁকে দেখে দেখে বললে—হেই মা—তুমি? তাই তো বলি! সীমে?

॥ ৩ ॥

হায় মন রসনা আমার—
একি তুই পারবি—গাহিতে—
নতুন কালের নতুন ভাতুর নতুন মহিমে,
এক মুখে যে নারি কহিতে।

গুনগুনিয়ে গান ধরেছিল—নস্থবালা।

ওই দিনই সন্ধ্যেবেলা।

মেয়েটিকে নস্থবালা জানে। এ চাকলায় ভিক্ষাজীবী নস্থর অচেনা বড় কেউ একটা নেই? বিশেষ করে আইবুড়ো বিয়ের যুগ্যি মেয়ে। কারণ সে হল ভাতুর মা। কুমারী মেয়েদের উপর তার, একটা স্নেহের টান আছে। তা নইলে সে ভাতুর মা হয় কেমন করে।

ওদিকে ফটিকদাস মাটি তৈরী করছিল, পুতুল তৈরী করবে। আজ একদিকে ওই হাঙ্গামা, অন্যদিকে সেটেলমেণ্ট আপিসে তিনখানা গাঁয়ের লোক এসে আর এক হাঙ্গামা জুড়েছিল। জমিদারী উচ্ছেদের পর জমি জেরাতের নতুন ব্যবস্থা বিলি হবে, তার আগে মাপ জোক হচ্ছে, কার কোন জমি—কতটা জমি—কি স্বত্বে দখল ক'রে লেখা হচ্ছে; এরপর পরচা হবে। শোনা যাচ্ছে পঁচিশ একরের বেশী জমি কেউ রাখতে পাবে না, রাখলে সরকার নিয়ে নেবে। তারপর নাকি ভাগ করে দেবে—যারা গরীব, চাষ করে খেটে খায়, অথচ নিজের এককাঠা জমি নেই তাদের। কিন্তু—

ফটিকদাস কথাটা শুনেছে—ওই আপিসের সামনেই লোকেদের

বলতে শুনেছে ; এবং শুনে সে বুঝতেও পেরেছে ব্যাপারটা। আজ এসেছিল আকুটি গ্রামের লোকেরা। তার মধ্যে চাষীভূষী গেরস্তরা এসেছিল হেঁটে এবং পাঁচখানা ছইওয়ালা গরুর গাড়ী করে এসেছিল আকুটির ঘোষালবাবুদের পাঁচ তরফ। তারা প্রায় হাতাহাতি করে গেছে।

সেটেলমেণ্ট আপিসের পাশে ছুটো গাছতলায় পাঁচখানা সতরঞ্জি বিছিয়ে বসেছিল বাবুরা। মধ্যে মধ্যে ঝগড়া,—মধ্যে মধ্যে হাসি-ঠাট্টা চলছিল। মধ্যে মধ্যে গালাগাল। মেজ তরফের মেজবাবুই এখন পাঁচ বাড়ীর মধ্যে বয়সে বড়। সারাদিন বারচারেক আফিং খেয়েছে আর যোগেশ দাসের দোকান থেকে বার আস্টেক চা খেয়েছে, ঝিমিয়েছে, সিগারেট বিড়ি টেনেছে। ঝিমিনির, মধ্যেই বোল কেটেছে।

ছোট তরফের ছোটবাবু এককালের শৌখীন লোক, কাঠকাঠরার আসবাবে বিলাতী ছবি পুতুলে ঘর সাজাবার তার ঝোঁক ছিল কোট প্যাণ্টলুন মিহিধূতি পাঞ্জাবী—দামী সাজ পোশাকের বাতিক ছিল—এখন অবস্থা খারাপ বলে ও সব ঝোঁক মন্দা পড়েছে। সেই ফটিককে ডেকে তার পুতুল দেখেছিল। কিনেছেও সব পুতুল ছুটো করে! সেই সময় কথাগুলি মন দিয়ে শুনবার অবকাশ পেয়েছিল ফটিক। ওঃ! সে কি কথা।

গোমস্তা এসে বলেছিল—বাবু আপত্তি করছে ওরা! বলছে ওরা! —বলছে এ হবে না!

বাবু চোখ না খুলেই বলেছিল—ক'টাকা চাচ্ছে রে? ক টাকা দিতে গিয়েছিলি?

—টাকা নেবে না।

—ওরে বাবাঃ। ভূতের বেটা বেহ্মদত্যি! সেটেলমেণ্ট করতে এসে টাকা নেবে না।

—বলছে ধরা পড়লে চাকরী যাবে। আর ধরা পড়বেই। বলছে যেখানে ছুঁচ চলে না সেখানে ফাল চলে?

—চলে। বল্ গিয়ে এ কাপড় সেলাই নয়, জমি সেলাই। ওতে ফালই লাগে। চালুনীর ফাঁক দিয়ে চালতে পারলে হাতী গলে যায়। বল গে হয়। মহাভারতে আছে। একটা মেয়ের এক সঙ্গে পাঁচটা স্বামী হয় না তো মহাভারতে হল কি করে। পাণ্ডুরাজার পাঁচ পুত্তুরের কোন পুত্তুরটা পাণ্ডুর নিজের? তবু পাণ্ডুর রাজ্য কোন্ আইনে পায়? এ তো শালা বাপ থাকতে বেটারা ভিন্ন হয়েছে। নে এই দানপত্তরটা নিয়ে যা। বলবি ভাল করে ঠাণ্ডা জলে চোখ ধুয়ে পড়তে। বলবি—পারলে এমনি করে ফালে সেলাই হয়। এ স্তোর সেলাই নয়। কাছির সেলাই। না—না! তারপরই ঘন ঘন বারকয়েক সিগারেট টেনে বলেছিল—দে-রে, ও ছোটখোকা আমার আফিংয়ের কৌটোটা!

আফিং খেয়ে বলছিল—কচু পোড়া খেলাম রে বাবা, সায়েবরা চলে গেল; নাড়াবুনেরা কীত্তুনে হল। জমিদারী নিয়ে আশ মিটল না। জমি নেবে। পঁচাত্তর বিঘের বেশী রাখতে দেবে না। চারটে ছেলে আমার, তাদের ভাগে তা হলে উনিশ বিঘেও পোরে না। এক বিঘের ধান বিড়ি তামাক; পাঁচ বিঘে অন্য নেশা। তারপর তো অন্য খরচ।

আবার একটু থেমে বলেছিল—শালা তিনদিনকা যোগী পাও বরাবর জটা। কোথা থেকে বাউণ্ডুলে চাক্‌রের বেটা চাক্‌রে দু কলম ইংরেজী শিখে হাকিম হয়ে বসেছে। আইন দেখাচ্ছে। আমরা বাবা সাতপুরুষ জমিদারী করে এলাম। মাকে মামার বাড়ী দেখায়।

এর সঙ্গে খারাপ কথার মিশেল ছিল অনেক।

চমৎকৃত হয়েছিল ফটিক কথার বাঁধুনীতে আর বাহারে। বলেই চলেছিল বাবু। তার ভিতর থেকে ফটিক আসল তথ্যটি সংগ্রহ করেছিল।

বাবুর জমি আছে তিনশো বিঘে। পতিত জমি তাও পাঁচশো বিঘে। জমিদারীর পতিত জমি চেক কেটে বউ বেটির নামে বন্দোবস্ত দেখিয়েছে। এখন জমির বেলা দেখাচ্ছে জমিতে চার ছেলের মালিকান।

তিনি তাদের দানপত্র করেছেন। তা হলেই চার ছেলেকে পঁচাত্তর বিঘে খেয়ে যাবে!

তা বটে—একেই বলে ফাল দিয়ে কাছির দড়ির সেলাই। এ সেলাই টেনে ছিঁড়বে না। বলিহারি বুদ্ধি। ওরা চলে ডালে ডালে তো এরা চলে পাতায় পাতায়।

আর শুনেছে যেখানে যত পতিত আছে সেখানে নানান গাছের ডাল কেটে বসাচ্ছে। আর এ গাছ সে গাছের চারা বসাচ্ছে। ব্যস্ তা হলেই রক্ষে। বাগান হয়ে গেল। ফলের বাগান হলে জমি বাজেয়াপ্তির আইনে পড়বে না।

ওখানেই কে একজন ছোকরা বলেছিল—লে হালুয়া! নিবি জমি কেড়ে? করবি মানুষে মানুষে সমান?

এখানেই বেধেছিল হাঙ্গামা, বাবুদেরই কোন এক তরফ একজন প্রজাকে দিয়ে এতে আপত্তি দিয়েছে। বলেছে মেজবাবু বেনাম করছে।

ফটিক দাস মাটি তৈরী করতে করতে সেইসব কথা ভাবছে। নসুর গান তার কানে ঢুকছে না। সেও গান বাঁধছে। কিন্তু মুশকিল হল যে ফটিক গাইতে পারে না, গলা নেই। না থাক, তবু মন থামছে না। মনের মধ্যে কলি ঘুরছে—

পুরনো চালের শোন গুণ-মহিমে—
ফাল কাছিতে জমি সেলাই—ছিঁড়তে নারে ভীমে।

নসুবালার তখন নতুন কলি জুগিয়েছে।

নতুন কালের তপ্ত খোলায় কনক চূড়ের খই—
ভাদুর আমার মুখ ফুটেছে—ও মন রসনা আমার—
শুনে যা লো সই।

নবীনপুরের এক আঁজলা কনকচূড়ের খই ওই মেয়ে! ডাক নাম—কনক।

নবীনপুরের অমর চক্কোত্তির মেয়ে—ভাল নাম—সীমা। ওই ওই

তার কনকচূড়ের ধান। লোকে বলে গেছো মেয়ে—একটা ভাঙা সাইকেলে চড়ে ইস্কুলে আসত। গত বছর পর্যন্ত এসেছে।

অমর চক্কোত্তি এ কালের বিচিত্র মানুষ। নসু বলে, না পোলোয়া না খিচুড়ী--ভুনি খিচুড়ী। ওর মধ্যে নাই কি? চক্কোত্তি নয় কি?

চক্কোত্তি—বামুন—হা তা বটে। কে বলবে নয়? ওদের বংশ চণ্ডীতলার সেবাইত ক'ঘরের একঘর,—পালা পড়লে চান ক'রে কে'টের কাপড় প'রে কপালে সিঁদুরের টিপ্ প'রে চণ্ডীতলায় যায়। ভাগ নিয়ে ঘরে আসে। মাসে আটদিন পালা।

ইস্কুলে পড়ে একটা-পাশ-করা লোক, রেজেস্টারী আপিসে দলিল লিখে রোজগার করে বারমাস। আটঘড়ার শেখজী—আমজেদ আলির সঙ্গে এক তক্তপোশে বসে ওখানে কাজ করে, এক সঙ্গে বসে চা খায়, লোকে বলে মদও খায়, কোন কোনদিন রাত্রে এক সঙ্গে খায় দায়। শেখ মুরগী রাঁধে। সে অবিশ্যি আঙুলের আড় দিয়ে করে। আবার জেলার কাগজে বেনামী চিঠি লেখে। লোকে তারিফ করে, চক্কোত্তি এমন রসিয়ে লেখে! আর দারোগা হাকিম জমিদার কাউকে ছাড়ে না। ভুবনপুরে যাত্রার দল আছে, সেই দলে আবার এ্যাক্টোও করে।

বাবাঃ, সে কি তেজ চক্কোত্তি ঠাকুরের! যখন বিশ্বামিত্র সেজে নামে, তখন যত গোলমাল থাকুক আসরে—সব চুপ হয়ে যায়। ওরে বাবা—

—দিনু শাপ—সবংশে নির্বংশ হবি—
অনন্ত নরকে যাবি—আরে রে দুর্মতি।

সে শুনে লোকজনের বুক গুরগুর করে ওঠে। মনে হয় হাত জোড় করে ছুটে গিয়ে বলে—হেই চক্কোত্তি ঠাকুর, থাম বাবা, রাগ খানিক থামাও। ওরে বাবা, এত রাগ! হেই মাগো। নিব্বংশ বলতে আছে! শুধু এই নয়, সে আমলে চক্কোত্তি স্বদেশী করে জেল খেটে-ছিল তিন মাস। তখন খদ্দর পরত। এখন খদ্দর পরে না। তবে

ভোটের সময় গাজনের ঢাকীর মতো ঢাক বাজিয়ে নেচে বেড়ায়। বক্তৃতাও করে।

॥ ৪ ॥

অমর চক্কোত্তির ছেলে নাই, আছে চার মেয়ে। এ মেয়ে সেজ অর্থাৎ তৃতীয়া। ভাল নাম সীমা। ডাক নাম কনক। হয়তো কনকই আসল নাম। কিন্তু পর পর দুই মেয়ের পরও যখন কনক হল—তখন নাম হল সীমা। বড় মেয়ে বনলতা—মেজ—স্বর্ণলতা—তারপর মিলিয়ে হয়েছিল কনকলতা। কিন্তু আর যেন মেয়ে না হয় সেইজন্য পাল্টে রাখা হয় 'সীমা'।

আর্ণাকালীর মত নামগুলি অমর চক্কোত্তির পছন্দ হয় নি। সীমার পরও আবার মেয়ে হয়েছিল—তার নাম 'ক্ষমা'। তারপরও মেয়ে—কিন্তু সে মেয়ে বেঁচে নেই। মেয়ে-মা এক সঙ্গে গিয়ে অমর চক্কোত্তি খালাস পেয়েছে।

দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। তখন চক্কোত্তির জমিজমাও ছিল এবং দেশে একটু খাতির না হোক আদর ছিল। জেলখাটা লোক! জমি বেচে বিয়ে দিয়েছে তাদের। তারপর থেকে চক্কোত্তি পাল্টেছে। তার আদর গেছে।

তার কারণ মদ। এবং আরও একটি কারণ। এক বিধবাকে ঘরে এনে রেখেছে। ওদিকে আশ্চর্যের কথা—চণ্ডীতলার পাওনা কমে এসেছে। এখন চণ্ডী মায়ের একরকম নিজেরই চলে না—তা দু আনার অর্ধেক অংশের শরীক চক্কোত্তির চলবে কি করে।

চক্কোত্তিও তাতে দমে নি। সে মেয়ে সীমাকে আগে থেকেই সাইকেল চড়া শিখিয়ে নিজের ভাঙা সাইকেলটা তাকে দিয়েছিল। সীমা চন্দনপুর মাইনর ইস্কুল থেকে বৃত্তি পেয়ে পাশও করেছিল। চক্কোত্তি তাকে বই কিনে দিয়ে বলেছিল—তা হলে তুই পড়। তোর

জন্যে আমি নিশ্চিন্তি। দরকার মতো হাইস্কুলে যাবি। পাশেই রেজেস্টারী আপিসে থাকি। মাস্টারদের কাছে দেখিয়ে টেকিয়ে নিয়ে আসবি।

সীমা মাইনর গার্লস স্কুলে পড়বার সময় রেসিটেশন করত ভাল। চক্কোত্তিই শিখিয়েছিল। তখন গার্লস স্কুল—বয়েজ হাইস্কুলের প্রাইজ হ'ত এক সঙ্গে। দুইই মাধববাবুর প্রতিষ্ঠা করা। রেসিটেশনে সেবার নাম করেছিল সীমা। রবীন্দ্রনাথের দুর্ভিক্ষ শ্রাবস্তীপুরে যবে—কবিতা আবৃত্তি করেছিল। তখন দুই ইস্কুলের সেক্রেটারী ছিলেন—মাধব-বাবুর ছোট ছেলে রায় বাহাদুর পবিত্রবাবু। পবিত্রবাবু বই লিখতেন, তাঁর থিয়েটার ছিল—নিজে খুব ভাল পার্ট করতেন। তিনি পরের বছর সীমাকে এবং চন্দনপুরের গোপাল চৌধুরীর ছেলে শুভেন্দুকে নিয়ে—চন্দ্রগুপ্ত থেকে চাণক্য এবং মুরার দৃশ্য রেসিটেশন করিয়েছিলেন। তার পরের বৎসর ওদের দুজনকে দিয়েই করিয়ে-ছিলেন—'অভিসার' রেসিটেশন। দুজনেই সুর মিলিয়ে আরম্ভ করেছিল—সন্ন্যাসী উপগুপ্ত, মথুরাপুরীর প্রাচীরের তলে—একদা ছিলেন সুপ্ত। তারপর 'সন্ন্যাসী গায়ে ঠেকিতে চরণ থামিল বাসব-দত্তা' আসতেই—শুভেন্দু শুয়ে পড়েছিল এবং সীমা ডান হাতখানিতে প্রদীপ ধরার ভঙ্গি ক'রে—তার মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে বলেছিল—

ক্ষমা কর মোরে কুমার কিশোর—
দয়া কর, যদি গৃহে চল মোর—
এ ধরণীতল কঠিন কঠোর
এ নহে তোমার শয্যা।

এরপর শুভেন্দু উঠে বসে আরম্ভ করেছিল।

অয়ি লাবণ্যপুঞ্জে,...
সময় যেদিন আসিবে আপনি
যাইব তোমার কুঞ্জে।

তারপর আবার, দুজনে আরম্ভ করেছিল—'সহসা ঝঞ্ঝা তড়িত

শিখায় মেলিল বিপুল আস্য।' এমন ভাবেই শেষ করেছিল গোটা কবিতাটি আবৃত্তি। সেবার সেটি এত ভাল হয়েছিল যে—জেলা ম্যাজিস্ট্রেট দত্ত সাহেব খুশী হয়ে বলেছিলেন, এদের মেডেল দেওয়া উচিত। আমি আশা করি ইস্কুল কর্তৃপক্ষ এদের মেডেল দেবেন আসছে বার।

তখন সীমা ছোট ছিল। বয়স তখন দশ এগারো। তারপরও সে অনেক সুনাম অর্জন করেছে, অন্ততঃ রেসিটেশনে। একা করেছে। দুজনে করেছে। শুভেন্দুর সঙ্গে আবার থিয়েটারও করেছে। বয়েজ ইস্কুলের সুবর্ণ জয়ন্তী হল উনিশ শ একান্ন সালে ওরা দুজনে করেছিল কচ ও দেবযানী! প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনে—কর্ণকুন্তী-সংবাদ করেছে। সে শুভেন্দুর সঙ্গে নয়, তাপু—তপন সরকারের সঙ্গে। সে পুরনো কথা। ১৯৫০ সালের কথা। তারপর কয়েক বছরই চলে গেছে। ১৯৫৫ সালে সীমা প্রাইভেটে ম্যাট্রিক দিয়েছিল। অমর চক্কোত্তি আশা করেছিল সীমা পাস করবে। পাস করলে সীমাকে এখানকার গার্লস স্কুলে ঢুকিয়ে দেবার ইচ্ছে ছিল তার। ষাট সত্তর যা পাবে তাই তার সংসারে আসবে। সংসারে এখন বড় টানাটানি। দিন দিন জিনিসের দর বাঁশের ডগায় গিয়ে ঠেকেছে। আর ক্ষমাটার বিশেষ কিছু হবে না। মেয়েটা দেখতে খুব সুন্দর, কিন্তু বুদ্ধি প্রখর নয়। তার উপর—বোধ হয় রূপ আছে বলেই—সাজবার গুজবার খুব ইচ্ছে। ওটাকে কারুর ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারলে নিশ্চিন্তি। সীমা হয়তো শেষ বয়সে তাকে পুষতে পারবে। কিন্তু যেমন ভাগ্য! ভাগ্য ছাড়া কি বলবে অমর চক্কোত্তি? নইলে যে দোষ চাপে তার ঘাড়ে। সে সব বই কিনে দিতেই পারে নি মেয়েকে। সুতরাং ভাগ্য মন্দ বলাই ভাল। ভাগ্যের জন্যেই সীমা ফেল করলে। ১৯৫৬ সালের ইলেকসনে বেশ টাকা পেয়েছিল অমর। সেই টাকায় বই কিনে দিয়ে মেয়েকে বলেছিল—এবার ফেল হলে শুনব না। কিন্তু এবারও ফেল করেছে সীমা।

চক্কোত্তী বাড়ীর বিধবা কর্ত্রীটির সঙ্গে সীমার বনিবনাও হত না। এ কাল—সমাজতন্ত্রের কাল—কিন্তু সমাজের কাল নয়; ও বিষয়ে সমাজতন্ত্রের মতামত উদার। তবুও সেকালের লোক আছে বেঁচে—একেলেদের মধ্যেও সেকেলে আছে, এবং একেলের মতামতের এমন অনেক আছে যারা অন্যের নিন্দে যে-কোন ছুতোয় পেলেই হল—তাতেই তারা জিভ শানিয়ে কথা বলে। সেসব কথা সীমাকে শুনতে হয়। কারণ সে ইস্কুলে আসে। পরীক্ষার ছ মাস আগে সে এখানে মেয়েদের হোস্টেলে ছিল। শনি রবিবার বাড়ী যেত। ওই বাইসিকিলে চড়ে যেত। এবং দেড় দিনে সাড়ে পাঁচ দিন শোনা কথার বিষয়গুলির ঝাঁজ কোন না কোনপ্রকারে তার কথার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসত।

বিধবা সহ্য করত। মধ্যে মধ্যে বলত—দেখ সীমা—আমি তোমার গুরুজন! বয়সে বড়। সম্বন্ধ কিছু না-মান কিন্তু বয়সে বড়, বাড়ীর রাঁধুনী বলেও মানা উচিত। আমি তোমাদের বাড়ী যেচে আসি নি, তোমার বাবা আমাকে এনেছে। তোমার লজ্জা—রাগ—আমার উপর করে তো লাভ নেই—তোমার বাবার উপর করো। বল তো তোমার বাবাকে আমি বলব।

সীমাকে চুপ করতে হত। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার একটা কোন ছুতোয় নতুন করে বাধত। ক্ষমা এ সবের মধ্যে থাকত না। তার সঙ্গে মাসীর সত্যিই একটা স্নেহের সম্পর্ক আছে এবং ক্ষমা বোধ হয় এ সবের মধ্যে দোষ দেখে না। মাসী চাল ধান বেচেও তার শখ ও সাধ মিটোয়।

চক্কোত্তি বলে—সে বাপের খাতির রাখে না, তা সত্যিই সে রাখে না—; এই বিধবা প্রসঙ্গ উঠলেই সে সঙ্গে সঙ্গে এখানকার সকল জনের সকল বাড়ীর অতীত ইতিহাস আওড়াতে শুরু করে—। কার কোন ব্রাত্য বংশের নারীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল—কোন্ অভিজাত বংশে কার কোন্ রক্ষিতা ছিল—এসব তার নখদর্পণে। সীমার সঙ্গেও এ নিয়ে

তার বাকযুদ্ধ হয় নি এমন নয়। হয়েছে ; লোকজন যেই উপস্থিত থাকে তাদের সামনেই উঁচু গলায় হয়েছে।

নস্তুবালার গানের কলিতে সেসব কথার উল্লেখ আছে। নস্তুবালা ভোলে নি একটি বর্ণও। সে বলে—পক্ষীর মত শুান। যা শুনি তাই বলি। ভুলি না। বুজেচ বেয়াই। হ্যাঁ। আমি মা তোর পোষা পাখি, যা শেখাস মা তাই শিখি, সেই বিত্তান্ত।

তারপর হঠাৎ বলে, সেই হাটকুড়ো জেলের বাড়ী সরক পাখি ছিল, সেই সরকের সরক পাখি আমি। মাছ নিতে গিয়ে বাড়ীর উঠোনে দাঁড়ালেই, বাস্—'ভাতারখাগী আঁটকুড়ি'—। যত গাল শুনত, সব বলে যেত একে একে। তারই মধ্যে বলব, হেই মা! বাবুমশাই। যাই বাবু মাছ দিয়ে আসি! আবার তখুনি বলত, মর মর মর মিন্‌সে! বলা দেখ!

নস্তুবালা তাই বটে। চক্কোত্তির কথা ও গানের মালায় গেঁথে রেখেছে। সপ্তাহে একদিন সে চক্কোত্তির গাঁয়ে যায়! গেলে ওদের বাড়ী যাবেই। যত ভাব তার সীমা ক্ষমার সঙ্গে তত ভাব তার ওই ওদের বিধবা মাসীর সঙ্গে। নস্তুবালার কাছে কারুর কোন দোষও নেই বিচার নেই। যে কেউ ওকে সমাদর করে ভাতুর মা বলে ডাকলেই হল।

নস্তুবালার গানে বলে—

আগে গাছের ডালে কাঁটা
তবে ডালের ডগায় ফুল—
বহিলে কলঙ্ক নদী ও মন রসনা আমার
তার ভাঙনে গড়ে কুল।
পতিতপাবনী গঙ্গা, শিব ধরিল মাথায়
ঝাঁপ দিয়ে পালাল ধনী—ও মন রসনা
শান্তনু রাজা কোথায়?

চক্কোত্তির কণ্ঠখানি বাজে যেন শঙ্খ—
গঙ্গা পঙ্ক তিলক আঁকে
মনরসনা—পবিত্র কলঙ্ক—।

মস্ত ছড়া। গায় ওদের নিজের সেই এক ঘেয়ে সুরে। তাতে কোন কথাটি বাদ নেই। চক্কোত্তি পুরাণে কলঙ্কের কথাই বলে না; গ্রামের এবং আশপাশ গ্রামের লোকেদের গোপন প্রেমের কথা বলে না, তাদের নিজেদের বংশের কথা বলে!

অমর চক্কোত্তি সীমার কাছেই বলছিল, বলতে এতটুকু মুখে আটকায় নি, আমার ঠাকুরদাদা কেঁচুনীপাড়া যেত শিবের মত। মাঠে মাঠে কাঠকুড়ুনী ঘাসকাট্‌নীদের পেছনে পেছনে ঘুরত। আমার বাবার আমল থেকে হাল আমল—বাবা সন্ধ্যেবেলা ঝড় নাই জল নাই, যেত শুদ্দুপাড়ায় যোল বছুরে বিধবা সৈরভীর বাড়ী; আমার পৈতের সময় মুখ দেখিয়েছিল সৈরভীকে; আমার ভিক্ষেমাকে দেখেছিস তো হারামজাদী। এ কালে আমার পালা। বাবা! আজ আর রাজা প্রজা নই, বামুন শুদ্দু নই, সবাই সমান। অন্যের বাড়ীর চৌকাঠ মাড়াতে গিয়ে মাথা দেবে? পতিত নাই পঞ্চায়েত নাই, ভয়টা কিসের? তোকে ভয় করতে হবে? তোর লজ্জা লাগে তুই আপনার পথ দেখ। লাজলজ্জা ভয়ডর আমার নাই। লোকে বলে আমি মদ খেয়ে চণ্ডীমায়ের মাটির ঢিপিতে কিল মেরেছিলাম। মদের ঘোর মিছে কথা, মেরেছিলাম জেনেশুনে টনটনে জ্ঞান ছিল। মদ খেয়েছিলাম —যারা থাকবে, তারা তো এরপর মারবে, সেই মার সহ্য করবার জন্যে। আর যদি বলে সেবাইত থেকে খারিজ করব, তবে বলবার পথ থাকবে—মদ খেয়ে আমার জ্ঞান ছিল না।

চণ্ডীমায়ের সেবাইত চক্কোত্তি, একদিন মদ্যপান করে চণ্ডী-রূপিণী যে স্তূপটি আছে সেই স্তূপটির উপর দমাদম কিল মারতে শুরু করেছিল—এবং চীৎকার করেছিল, লাগ্‌তা হ্যায় তো চিল্লাও—স্রিফ মাটি হায় তো ভাঙো।

এইটি নম্বুবালা সহ্য করতে পারে না। চণ্ডীমায়ে তার অসীম ভক্তি বিশ্বাস। নিত্য সকালবেলা গিয়ে সেখানে প্রণাম করে, মনের প্রশ্ন নিবেদন করে। আবেদন জানায়, মায়ের ঘরের একটি টিক্‌টিকি টক টক করলেই সে তার মধ্য হতে জবাব আবিষ্কার করে নেয়। জঙ্গলে ঘেরা চণ্ডীমায়ের স্থান, সেখানে কীটপতঙ্গের সরীস্পের ইঁদুর-বাঁদরের মেলা—টিক্‌টিকিও সেখানে অনেক। যে-কোন টিকটিকিই টক টক করুক সেটি নম্বুর সেই আদি ও অকৃত্রিম টিক্‌টিকিটি যে নাকি মায়ের হয়ে কথা বলে। যাক্‌। এই ঘটনার অর্থাৎ মাকে কিল মারার পর সে চক্কোত্তির উপর খুব ক্রুদ্ধ হয়েছিল এবং সে কিছুদিন ওদের বাড়ী যাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল। নিত্য সকলে উঠে প্রত্যাশা করত যে, শুনতে পাবে গতরাত্রে অমর চক্কোত্তি মুখ দিয়ে রক্ত উঠে মরেছে, অথবা সর্পাঘাত হয়েছে কপালে, অথবা ওলাওঠা হয়েছে। দিনের পর দিন তা না হওয়াতে সে বিস্মিত হয়েছিল। একদা সেই বিস্ময়বশে ওই চক্কোত্তির বাড়ী গিয়ে সরাসরি তাকেই প্রশ্ন করেছিল—তোমার কিছু হল না কেন বল দিকি ?

—কি ? কি হবে ?

—মায়ের বুকে তুমি ঢাই ঢাই করে কিল মারলে—তবু—।

আর নম্বুকে বলতে দেয় নি চক্কোত্তি, হা-হা করে হেসে উঠেছিল বিরক্ত হয়ে নম্বু বলেছিল—

এমন করে হেসো না—হা-হা করে। হ্যাঁ।

—হাসব না ?

—না। রহস্যটা বল।

—এই মরেছে—

—হ্যাঁ মরেছেই বটে। বল। তুমি তাহলে—

—কি ?

—সাধকটাধক বট ? এ্যাঁ ?

গম্ভীরভাবে কৌতুক রসটিকে প্রগাঢ় করে তুলে চক্কোত্তি বলে-

ছিল—বলিস নে কাউকে খবরদার। তাতেই কাজ হয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে। সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেছিল চক্কোত্তির কথা। একটা প্রণাম করে নস্থ বেরিয়ে এসেছিল।

এ নিয়ে তার বেয়াইয়ের সঙ্গেও কথা হয়েছিল। ফটিক দাস হেসে বলেছিল, তোমার নিজের মহিমে আছে বেয়ান, তাই সবাইয়ের মধ্যে তুমি মহিমে দেখ।

বেয়ান রেগে বলেছিল—মরণ। মিন্‌সের কথা শোন।

—শোন বেয়ান শোন! যাত্রার দলের রাধা বলত, শুনেছ তো, তমাল গাছ, তাকে কেষ্ণ বলত; তালগাছ—তাকেও বলত, এই আমার শ্যাম। শ্যাম বিরিক্ষির পাতা পেড়ে—শ্যাম পিদীমের কালো শিবে—শ্যামসোহাগী কাজল পড়লে তাই হয়।

—তোমার কথা আমি মানি না হে মানি না।

—মেনো না ভাই।

এ সব পুরনো কথা।

তারপর সীমা দ্বিতীয়বার ফেল করলে।

খবর যেদিন এল, সেদিন চক্কোত্তি মদ খেয়ে বাড়ী এসে কিছুক্ষণ কেঁদেছিল; সীমার দোষ নেই, দোষ তার। কতটুকু করেছে সে তার পড়ার জন্যে? নিজে? নিজে সে একদিন দেখিয়ে দিয়েছে? তবে?···ওই যে ঘরে অলক্ষ্মী অধর্মকে পুষে রেখেছে তার ফল—? তার ফল যাবে কোথায়?

বিধবাটির নাম মনোরমা। সে কাজ করছিল—ঘর ঝাঁট দিয়ে চলেছিল, নিরুত্তরে কাজই করে গিয়েছিল, কোন উত্তর দেয় নি। চক্কোত্তির একদফা খেদোক্তি শেষ হতেই সে চাবীর গোছাটি খুঁট থেকে খুলে চক্কোত্তির সামনে ছুঁড়ে দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। শুধু

বলে গিয়েছিল—পাপ অধর্ম চলল ঘর থেকে, সংসার তোমার ধর্মে পুণ্যে পবিত্র হোক।

চক্কোত্তি চমকে উঠেছিল—এ কি? এটা কি হল? এই—! এই! যেতে তাকে সে দেয় নি। মনোরমা যেতেও ভরসা করে নি, ফিরেছিল। এবং এরপর চক্কোত্তি উল্টো গাইতে শুরু করেছিল। সীমার শ্রাদ্ধের মন্ত্র নয়—ঘটী বাজানো বামুনেরা চাবী দিয়ে ঘটী বাজিয়ে টাকা না পেলে যেভাবে মৃত ব্যক্তির নরকে দুর্দশার কথা বর্ণনা করে পথে দাঁড়িয়ে তাই করেছিল।

এই বিধবাটিই এবার বলেছিল, অনেক হয়েছে। অনেক দেখালে। এই পাড়াগাঁয়ে মেয়েকে বাইসিকিল চাপা শিখিয়ে ইস্কুল পাঠালে, বোর্ডিংয়েও ক' মাস রাখলে, পাস করিয়ে মেয়েকে চাকরী করাবে-- মেয়ে তোমাকে পুষবে। ওসব আশা ছাড়। এখন দেখেশুনে একটা বিয়ে দিয়ে দাও, এখনও কুড়ি পার হয় নি, বুড়ী হয় নি। ম্যাট্রিক ফেল, পাড়াগাঁয়ে দু চারজন শখ করে বিয়ে করতে চাইবে। তোমরা মেয়ের জন্যে বিয়েতে পণ নাও, পণ হয়তো বেশী পাবে।

চক্কোত্তির কথাটা ভালো লেগেছিল, সে ভালোলাগা ভয়ঙ্কর ভালোলাগা। মনে হয়েছিল এই কথাটাই সে খুঁজছিল, খুঁজে পাচ্ছিল না। সে মনোরমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছিল, আধমিনিট, তারপর বলেছিল, আচ্ছা বলেছ তো। আবার বলেছিল—ঠিক বলেছ।

পাত্র বের করতে তার দেরী হয় নি।

পাত্র—চন্দনপুর থেকে তাদের গ্রাম দু মাইল। তাদের গাঁ থেকে আরও পাঁচ মাইল উত্তর-পূর্ব কোণে বনচাতরা গাঁয়ের গোবিন্দ পাঠকের নাতি—ভুবন পাঠকের ছেলে রমেন পাঠক। গোবিন্দ পাঠকের শোনা যায় বিশ হাজার টাকা, পাঁচশো বিঘে জমি ছিল। ভুবন পাঠক যুদ্ধের বাজারে এবং পরে কণ্ট্রোলের সময় কালো-বাজারে ধান বেচে বিশ ত্রিশ হাজার টাকাকে দু লক্ষে দাঁড় করিয়েছে। ভুবন পাঠক চন্দনপুরের ছাত্র, থার্ড ক্লাস পর্যন্ত পড়েছিল, তার

পাঠ্যাবস্থায় বাপকে সাইকেলের জন্যে ধরেছিল। বাপ একশো টাকা দাম শুনে বলেছিল নমুনা দিস, আমার কামার খাতক আছে, তাকে লোহা দেব সে গড়ে দেবে, দশটা টাকা মজুরী। লোহা তো ভাঙা-চোরা বাড়ীতেই আছে। ভুবন পাঠক বাপের মৃত্যুর পর সাইকেল কিনেছিল। খড়ের চাল তুলে টিনের চাল করেছিল। সেই ভুবনের ছেলে—ম্যাট্রিক ফেল করে মালিক হয়ে বসে। মাটির দেওয়াল টিনের চাল তুলে পাকা ইঁটে দালান বাড়ী করেছে! সাইকেল এখন তার এছাড়া তিনখানা। এছাড়া রমেন গ্রামে থিয়েটারও খুলেছে। সেই সূত্রে অমর চক্কোত্তি সেখানে যাওয়া আসা করেছে কিছুদিন। রমেন শৌখীন ছেলে। বিয়ে হয়েছিল—বউ মরে গেছে। দুটি বাচ্চা ছেলে, মানুষ করছে রমেনের মা। রমেন এখন পথ ধরেছে, পাড়াগাঁয়ের মেয়ে মুখ্যু মেয়ে সে বিয়ে করবে না— তার লেখাপড়া জানা মেয়ে চাই।

রমেন তার বাড়ীও কয়েকবার এসেছে। বাইসিকিলে চড়ে। মানুষ হিসেবে মেজাজটা আমিরী, দু-পুরুষের কৃপণ অপবাদ ঘুচিয়ে এখন বাবু সাজতে চায়।···চকচকে সাইকেল, দামী শৌখীন গীয়ার কভার ফিট করা, ইলেক্‌ট্রিক ব্যাটারী ফিট করা আলো, পোশাক-পরিচ্ছদ খাস কলকাতার বড় দোকানের তৈরী। ফ্যাশানে একটু ব্যাকডেটেড—এখনও ওপেনব্রেস্ট কোট পরে। তা হোক। দামী সিগারেট খায়। প্রথম থিয়েটার করবে—তারই জন্যে এসে-ছিল—অমর চক্কোত্তির কাছে, চন্দনপুরের বাবুদের অনেক ছোকরার চেয়ে তার পার্ট ভাল হত। বড় বড় পার্ট করেছে। ওখান থেকে —আশেপাশে থিয়েটার যখন গজাতে লাগল, তখন সে তাদের মাস্টারী করেছে, ডিরেক্টরী করেছে। স্টেজ বাঁধা থেকে অ্যাক্টিং পর্যন্ত সবই সে তাদের শিখিয়েছে। জায়গায় জায়গায় শক্ত পার্টও দিয়েছে। টাকা নিয়ে অবশ্য। ফি তার মিনিমাম পঞ্চাশ টাকা। এ ছাড়া খাওয়া-দাওয়া সিগারেট, মদ এ তো আছেই। রমেন যখন

এসেছিল, তখন সে জিজ্ঞাসা করেছিল, আমার ফি জান তো।

—জানি না ঠিক। তবে শুনেছি। সে তো একরকম নয়!

—হ্যাঁ। মিনিমাম একটা আছে। তা সেখানে কাজও সেইরকম করি। বাতলে দি। তাতে যতটা হয়। যতটা পারে। সপ্তাহে দু দিন রিহার্শ্যালে যাব। প্লের একদিন আগে যাব—প্লের পরদিন ভোরে চলে আসব। এক রাত্রির প্লে—পঞ্চাশ, দু রাত্তিরে পঁচাত্তর, তিন রাত্তিরে নব্বইও নিই—একশো নিই। আর পুরো খাটবো—সপ্তাহে চারদিন রিহার্শ্যালে যাব, দরকার হবে পার্ট করব, প্লের তিন দিন আগে যাব—প্লে হয়ে গেলে—স্টেজ খুলে দিয়ে আসব—একরাত্তিরে —একশো—দু-রাত্তিরে একশ পঁচিশ তিন রাত্তিরে দেড়শো।

রমেন বলেছিল, আমাদের তিন রাত্তির প্লে। আমি আপনাকে দুশো টাকা দোব। প্লে সাকসেসফুল হলে, আপনাকে কাপড় চাদর দিয়ে বিদেয় করব।

খুশী হয়ে চক্কোত্তি বলেছিল, আর একটি কণ্ডিশন বাপু।

—বলুন।

—ওখানে যে কদিন থাকব, সিগারেট দু প্যাকেট করে। বাজে সিগারেট খাই না আমি।

—কি সিগারেট বলুন।

চক্কোত্তি বলেছিল—"আপনি কি হারাইতেছেন তাহা আপনি জানেন না" যার বিজ্ঞাপন। কচ কচ। কাইচি। চক্কোত্তি প্রতিপদেই রসিকতার পরিচয় দিতে ছাড়ে না। কথা শেষ করে চক্কোত্তি হেসেছিল।

রমেন বলেছিল, তাই দোব।

—আর—। একটি হাত উপরে অন্যটি নীচে রেখে লম্বা মাপের কিছু ইঙ্গিত দেখিয়েছিল চক্কোত্তি। তারপর বলেছিল—"দব্যি"। অর্থাৎ দ্রব্য।

দ্রব্য মানে কি এবং ওই লম্বা মাপ কিসের তা রমেন সঙ্গে সঙ্গে বুঝেছিল। সে হেসে বলেছিল—ব্যবস্থা আমার ঢালাও। সে

দোকানের জিনিস নয়। আমার সব 'গৃহজাত'। আঙুল চুবিয়ে দেশলাই জ্বেলে দিন—দপ দপ করে জ্বলবে।

চক্কোত্তি বলেছিল—বেঁচে থাক ভাই, তুমি আমার সোনার চাঁদ।

রমেন বলেছিল—একটি শর্ত কিন্তু।

—এর পর তুমি দুশো শর্ত বাতলাও মেনে নোব। বল।

—দিন এক বোতলের বেশী পাবে না। বিকেলবেলা এক পাঁট দোব। রিহার্শ্যাল শেষে এক পাঁট। সকালবেলা থেকে না।

এক ঢোঁক দিয়ো ভাই। না দিলে খোঁয়াড়ি মরবে না। সাইকেল হাঁকিয়ে আসতে হবে সাত মাইল পথ। পথ তো নয়—শালা—আরাবল্লীর পাথুরে গোপথ। না খেয়ে ঠ্যাঙাতে পারব না সাইকেল। আবার রেজেস্ট্রী অপিস চণ্ডীতলা সেরে ঠিক চারটের সময় হাজির হব। ও দুটো না-রাখলে তো চলবে না ভাই। বারো মাসের ভাতঘর!

—বেশ তা হলে পাকা কথা দিলেন তো?

—হাতীর দাঁত দিলাম। মরদকা বাত হাতীকা দাঁত! কি বই ধরছ?

—কর্ণার্জুন—সীতা—আর একখানা আধুনিক। মানে খুব মডার্ন।

—ঠিক আছে। বায়না কিছু দিয়ে যেয়ো। আর একটা কথা। ওয়ান মোর।

—বলুন।

—প্লে সাক্‌সেসফুল হলে কাপড়-চাদর দেবে বলেছ। তা ওটা—! মানে চণ্ডীতলায় হাজরে দিতে হয়। ওটা যদি তসরের দাও—তো বুয়েচ না—। কালো নরুণ পেড়ে। ওটাই এখন ফ্যাসান হয়েছে। বুঝেচ?

তাও দিতে রাজী হয়েছিল রমেন।

মেজাজ তার আমিরী। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ছিল আগে, এখন শুধু মেম্বর। সদর শহরে—এস. ডি. ও. চন্দনপুরে বি. ডি. ও.

আপিসে হরদম যাওয়া আসা। মধ্যে মধ্যে খদ্দরের কাপড় জামা পরেও আসে,থানা কংগ্রেসের মিটিংয়ে। এখন রমেন কংগ্রেসের মেম্বর।

চতুর ছেলে! শুধু ইঙ্গিত বোঝে বলেই চতুর নয়। ওর চতুরতা দেখে চক্কোত্তি যে চক্কোত্তি তারও বিস্ময় জন্মেছিল। চক্কোত্তি পলিটিকস্ বোঝে বলে অহঙ্কার করে। পলিটিক্স্ করে। আগে, চল্লিশ সালের আগে, কংগ্রেসের ভোটে মাতত। তারপর চুয়াল্লিশ-পয়তাল্লিশে জনযুদ্ধের মহড়ায় নেমে পড়ে। প্রথম—আই পি. টি. এ.। তারপর সাতচল্লিশ-আটচল্লিশে কম্যুনিস্ট আন্দোলনে তে-ভাগা 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়' নিয়ে মাতামাতির সময় এই অঞ্চলে এক কম্যুনিস্ট পকেটে নেতা হয়ে উঠেছিল। কিন্তু যেই কম্যুনিস্ট পার্টি বেআইনী ঘোষিত হল, অমনি কম্যুনিস্টদের সঙ্গে কোন সংস্রব নেই বলে ফতোয়া দিয়ে শান্ত নাগরিক হল। রেজেস্ট্রী আপিসে এসে জুটল এই সময়। তারপর বাহান্ন সালে কংগ্রেস আপিসে যাতায়াত শুরু করলে। কংগ্রেসের হয়ে কাজ করবে। এখানকার কংগ্রেসপ্রার্থী ছিল ধনী মারোয়াড়ী। তবে মারোয়াড়ী হলেও আজীবন কংগ্রেসকর্মী। তা হোক বা না হোক তার টাকাটাই ছিল চক্কোত্তির সব থেকে বড় বিবেচনার বিষয়! খেটেছিল সে। টাকাও পেয়েছিল এবং মেরেও ছিল, উপরন্তু একখানা বাইসিকলও সে আর ফেরত দেয় নি। তারপর ছাপ্পান্ন সালে এখানে কংগ্রেস ক্যাণ্ডিডেট ছিল এ জেলার একজন ধনী ব্যক্তি। প্রতিদ্বন্দ্বী কম্যুনিস্ট ছিল ক্যাণ্ডিডেট, কংগ্রেস হারল। লোকে বললে, কংগ্রেসের নিজের লোকেরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। যারা করেছে, তার মধ্যে চক্কোত্তি একজন প্রধান। চক্কোত্তিও হেসেছে। বলেছে, প্রমাণ দিলে জুতো খাব।

—তুমি ডাঙ্গাল বনের মিটিংয়ে কি বলেছ?

—কি বলেছি? তারা জিজ্ঞাসা করলে, মশায়, বাবুটি কবেকার কংগ্রেসী? বললাম—ঠিক জানি না, তবে আজীবন হতে পারে!

তারা বললে—আজীবন? ওর বাপ নামজাদা ইংরেজের পক্ষের লোক ছিলেন না? বললাম—ছিলেন, কিন্তু তাঁর চেয়ে দেশহিতৈষী কে আছে? তারা বললে—তা হতে পারে! কিন্তু কংগ্রেসী তো নয়। সেরকম তো অনেক দেশপ্রেমিক আছে মশায়! আপনি কংগ্রেসী বলছেন তাই বলছি! তাই বলছি বাপের পথ ছেড়ে—বাপ চিরকাল কংগ্রেস বিরোধী ছিলেন, আজ উনি কংগ্রেসী হলেন কেন, এম. এল. এ. হবার জন্যে, মন্ত্রী হবার জন্যে? ওঁর নিজের শালা, তিনি কম্যুনিষ্ট, বক্তৃতা করে গেলেন, তা উনি তাই হলেন না কেন? কংগ্রেসী কেন? বলুন! আমি বললাম—যদি বোঝেন কখনও কংগ্রেস মন্দ, কম্যুনিস্ট ভাল, তখন উনি নিশ্চয়ই তাই হবেন। যেমন বাপের মতকে ভুল বুঝে আজ উনি কংগ্রেসী হয়েছেন। তারপর হেসে বলেছে, ওর নিজের শালা বড় কম্যুনিস্ট লীডার, সে এসে বড়লোকীর ছাদ্দ করে গেল, মানে উনি বড়লোক, ওঁর ছাদ্দই করে গেল। লোকে ওঁকে ওর, বাবাকে চেনে জানে। আমার বলায় কি যায় আসে বল। যদি বল যায় আসে তো বলব, আমি কোন মিথ্যে কথা বলি নি। কংগ্রেস বার করে দেয় দেবে। আমি তো জানি, আমি কোনদিন এম. এল. এ. হব না। মন্ত্রী হবার কোন সাধ নাই, এমন কি মন্ত্রীর আরদালী হবার দরখাস্ত করব না কোন দিন। এই বলেই শেষ নয়, সে কম্যুনিস্ট এম. এল. এ-র সঙ্গে নতুন করে দহরম-মহরম জুড়ে দিলে প্রকাশ্যে এবং পারমিট, রিলিফ, ক্যাশডোল প্রভৃতির ব্যাপারে একজন অন্যতম ছোটখাটো কর্তা হয়ে বসে পড়ল।

এমন যে অমর চক্কোত্তি সেও চমৎকৃত হল, এই রমেনের পলিটিক্সের বুদ্ধি দেখে। ওই থিয়েটারের সমারোহের মধ্যে কোথা দিয়ে সে কি করলে তা কেউ জানলে না, তবে থিয়েটারের পরেই ইউনিয়ন বোর্ডের মিটিংয়ে হিসাব-নিকাস পাসের প্রস্তাবে এমন শোচনীয়ভাবে প্রেসিডেন্টকে হারিয়ে দিলে যে, প্রেসিডেন্টের আর পদত্যাগ না

করে উপায় রইল না। তারপরও চতুর রমেন নিজে প্রেসিডেণ্ট হয় নি, তার এক কর্মচারীকে প্রেসিডেণ্ট করে নিজে মেম্বারই থেকে গেছে। করে সবই রমেন। প্রেসিডেণ্ট আপিসে পুতুল, বাড়ীতে তার মাইনে করা কর্মচারী। অন্য মেম্বররা থিয়েটারে পার্ট করছে। রমেনের অভিন্নহৃদয় বন্ধু। এ মনুষ্যটি সাধারণ নয়। অসাধারণ। কংগ্রেস বা কম্যুনিস্ট বা পি. এস. পি. যে পার্টিতে ও যাবে সেখানেই ও ঠিক নিজের জায়গা করে নেবে। লীডার হবেই। ভগবান সহায়— খুঁটোর জোর আছে। ভুবন আচার্যির দু লক্ষ টাকা ওর হাতে। আমিরী মেজাজ হলেও বিষয়বুদ্ধিতে আমিরী ফাঁক রাখে নি— সেখানে আমিরী সূক্ষ্মবুদ্ধি আছে। ওখানে রমেনের হিসেব সেই চৌবাচ্চার হিসেব। চৌবাচ্চা হতে নির্গমনের নলে ঘণ্টায় যখন দশ গ্যালন জল নির্গত হয়, তখন জল আগমনের পথে অন্তত বারো গ্যালন প্রবেশের ব্যবস্থা পাকা রেখে কাজ করে সে। ঠাকুরদা করত মহাজনী চাষ, বাবা সেটাকে বাড়িয়েছিল, সুযোগ পেয়েছিল কনট্রোলের বাজারে। ওদের বাড়ীটা দুটো জেলার সীমানা ঘেঁষে। সুযোগ বুঝে এ জেলার খরিদ্দারকে সীমানা পার করে—বিক্রী করে দাঁও মেরেছিল। রমেন এখন দোকান করেছে—চাল ধানের গদী, তার সঙ্গে মনিহারী, কাপড় লটকোন। ওদের গ্রাম বনচাতরা থেকে তিন মাইল পশ্চিমে সদর-ঘাট। একটা রাস্তা ঘাটের দুই মাথা থেকে তিন দিকে চলে গেছে উত্তরে একটি সাঁইথিয়া অন্যটি পাঁচথুপী কাঁদী, দক্ষিণে চন্দনপুর হয়ে কুয়ে পার হয়ে সোজা বোলপুর পর্যন্ত। ঘাটের মাথায় রমেন ধান কেনে কম দামে, কাপড় মনিহারী লটকোন বেনেতি মালমসলা বেচে অপেক্ষাকৃত বেশী দামে। মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের কলাই লঙ্কা শাঁখ আলু—কেনে সে সস্তায়, চন্দনপুরে সে যায় না, নদীর ওপার থেকে যে রাস্তাটা সাঁইথিয়া গেছে, সেটা এখন ভাল রাস্তা, পিচ হয় নি, তবু সুগম পথ,—এই পথে চলে যায় সাঁইথিয়া। সেখানেই ওর বেচাকেনা। ফলে চৌবাচ্চায় বারো

গ্যালনের পথে পনর গ্যালনের চাপ সৃষ্টি হয়েছে। তাতে খানিকটা তো চৌবাচ্চা ছাপাবেই সেই ছাপানো জল থিয়েটারের সমরোহে গৃহজাত মদ্যের প্রাচুর্যের জন্যে ব্যয় করেছে। ওদিকে ইনকাম ট্যাক্সোর খাতা হাল্কা হচ্ছে।

এ ছেলে যদি ভাল পাত্র না হয় তো ভাল পাত্র কে? চেহারা একটু বেঢপ্ মোটা বেঁটে; তা হোক। সাজলেগুজলে বেশ লাগে! এই তো কর্ণার্জুনে কর্ণের পার্ট করলে—সীতাতে রাম—মাটির ঘরে—অলক, কি খারাপ লেগেছিল! একটু বেঁটে। তা ওরাই যে বেঁটে ছিল না প্রমাণ কি! আর তার মেয়ে সীমাই বা কি এমন আশ্চর্য পদ্মাবতী বা সীতা বা ওই যে অলকের ভালবাসার মেয়ে। বেশ হবে। শ্রীমান রমেনের বুদ্ধির সঙ্গে অমর চক্কোত্তির বুদ্ধির যোগাযোগ ঘটলে আশ্চর্য ঘটনা হবে। দুর্যোধন শকুনি, রাবণ কালনেমি মামাভাগনে, এ শ্বশুর-জামাইয়ে এমন একটা নতুন কিছু হবে, যা একটা আশ্চর্য ঘটনা!

বেশ—বেশ বলেছে মনোরমা। দিয়ে দাও বিয়ে ঐ রমেনের সঙ্গে। অমর চক্কোত্তি সেদিন ওই রমেনের দেওয়া তসরের কাপড় পরে মা চণ্ডীর ওখানে গিয়ে জবাফুল মাথায় দিয়ে বলেছিল—মা-গো সেদিন কিল্ মেরেছিলাম—সাড়া দিস নি। আজ জবাফুল চড়ালাম, প্রণাম করলাম, আজ সাড়া দে। না হলে—।

ঠিক করতে পারে নি, চক্কোত্তি কি করবে! ভাঙবে? কিংবা —দেওয়ালে ঝুলানো খাঁড়াখানা নিয়ে কোপ মারবে? কি, কি করবে? কিছু যে ভেবে না পেয়েই কিছু কি করা হয় নি।

পরের দিনই সে গিয়েছিল বনচাতরা। সীমাকে রমেন দেখেছে। তাকে সাইকেলে চড়ে ইস্কুলে যেতে দেখেছে। ক'বছর আগে, ইস্কুলের সুবর্ণ জয়ন্তীতে সীমা এবং শুভেন্দু দেবযানী অভিনয় করেছিল। —সে অভিনয়ও রমেন দেখেছে।

কথাটা পাড়বামাত্র রমেন ঘাড় তুলে চক্কোত্তির দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বললে, আমি কাল যাব আপনার বাড়ী, গিয়ে উত্তর দিয়ে আসব। সীমাকে দেখেছি আমি, আর একবার দেখব। কিন্তু কোন কথা কাউকে বলবেন না। তাকেও না। ওর আমি পেণ্ট করা চেহারা দেখেছি, সহজ চেহারা দেখে নিজে ভেবে নিয়ে বলব। আপনার তো দুটি মেয়ে আছে। একটি বেশ সুন্দরী।

—সেটি ছোট। ক্ষমা। সে মেয়ের রূপই আছে। বুয়েচ না, তুমি যা চাও তা নয়। এই ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়েছে। বুয়েচ।

—দুটিকেই দেখব আমি। সেই জন্যেই বলছি, কাউকে কিছু বলবেন না। সাজাবেন না। কেমন ? একজনকে না-একজনকে হাঁ বললে তো একজনের মনে কষ্ট হবে।

যাই হোক দেখে শুনে রমেন সীমাকেই পছন্দ করলে, হাঁপ ছেড়ে বাঁচল চক্কোত্তি। ক্ষমার বিয়ের ভাবনা নেই—ওর পাত্র ঠিক হয়ে আছে। ছেলেটির বাড়ী বোলপুরের কাছে। সে এম. এ. পড়ছে শান্তিনিকেতনে। ভাল ছেলে। তার সঙ্গে ক্ষমার বিয়ের সম্বন্ধ হয়ে আছে অনেকদিন থেকে। তার মা সম্বন্ধ করে গেছে। এই চণ্ডীতলাতেই সম্বন্ধ হয়েছিল। ছেলেটির মা এসেছিল চণ্ডীতলায়, ওরা অনেক দিন থেকে চক্কোত্তিদের কুটুম্ব, ওরা চণ্ডীতলায় এসেছে খবর পেয়ে কুটুম্বিতা করবার জন্যই মা গিয়েছিলেন চণ্ডীতলায় ; এবং অনুরোধ করেছিলেন, পরের বেলাটা থেকে যাও আমাদের বাড়ী।

সঙ্গে সীমা ক্ষমাকে নিয়ে গিয়েছিল। তাদের বয়স তখন আট বছর, পাঁচ বছর। সেই সময় ফুটফুটে ক্ষমাকে দেখে ছেলের মা বিয়ের সম্বন্ধ করেছিল চণ্ডীতলাতেই। চণ্ডীতলার কোন গুরুত্ব চক্কোত্তি মানে না, তবে মা সম্পর্কে তার দুর্বলতা আছে। তা সে অস্বীকার করতে পারে না। বাপ সম্পর্কে সে ভিক্ষেমা-সৈরভীর সংস্পর্শের কথা অনায়াসে সহাস্যে বলতে পারে। কিন্তু মায়ের বিরুদ্ধে একটি কথাও সে নিজে বলা দূরের কথা পরে বললেও সহ্য করতে পারে না।

চক্কোত্তির মা এই সেদিনও বেঁচেছিল। পুত্রবধূর মৃত্যুর পর সে মরেছে। তার মা একটু বোকা-সোকা মানুষ ছিল, সে কথা বললেও চক্কোত্তির সহ্য হয় না, তখন আর এক মানুষ হয়ে দাঁড়ায়।

তার কারণ আছে। তার মনে পড়ে যায়, তিরিশ সালে ইস্কুল ছেড়ে সে যখন আইন অমান্য আন্দোলনে নেমেছিল, তখন তাকে থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে বলাতে চেয়েছিল, আর এ কাজ করব না। কোনও ভয়েই অমর তা বলে নি, শেষ পর্যন্ত বেত মারা হয়েছিল. পুলিসের বেত। কিন্তু তাতেও সে বলে নি। প্রতি বেতের শেষে সে চীৎকার করেছিল, করব। করব। সে তার উঁচু মাথা—সেই তার চোখের দৃষ্টি, বিশৃঙ্খল চুল, সেই চেহারা, যারা দেখেছিল, তারা কেউ ভোলে নি। মায়ের কথায় সেই চক্কোত্তি যেন উঁকি মারে। বোকা বললে বলে—না। কথা বলতেও জান না। কাকে কি বলতে হয় শিখো, বুঝলে! মা আমার দেবী ছিলেন। সাক্ষাৎ দেবী। সংসারে যদি কোন পাপ বা অন্যায় করে থাকেন, তো সে পরের গরুর গোবর কুড়িয়ে নেওয়া। বাস। সেই মায়ের দেওয়া কথা রক্ষার জন্যও বটে, আর ক্ষমা তার ছোট মেয়ে, দেখতে মিষ্টি চেহারা অনেকটা চক্কোত্তির মায়ের মত, তার বাল্যকালে অনুগতও ছিল একটু এইসবের জন্যও বটে, ক্ষমাকে তার জীবনের লাভ লোকসানের হিসাবের মধ্যে সে টানতে চায় না। কিন্তু রমেন শক্ত ছেলে ; ছেলে আর কেন,—বয়স চল্লিশের কাছে, সুতরাং শক্ত মানুষ, ব্যক্তি, চিজ ; রমেনের কথায়

গররাজী হতে চক্কোত্তি পারত না। কিন্তু মা চণ্ডী নিজেকে সত্যপ্রমাণ করলেন অমর চক্কোত্তির কাছে। রমেন সীমাকেই পছন্দ করলে!

* * * *

বিপদ বাধল এর পর। রমেন রাজী হলে কি হবে, সীমা বেঁকে বসল। অমর চক্কোত্তি বলে দিলে—এর নড়চড় করতে ভগবানের বাবার সাধ্যি নাই। তুই তো সীমা!

একদিন মদ খেয়ে তাকে প্রহারও করলে। তারপর আবার কাঁদলে, খুব ঘটা করে কাঁদলে—নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ফলাও করে বলে কেঁদে ভাসিয়ে দিলে। এবং সে তার অভিনয় নয়। দুটোই অকৃত্রিম অকপট।

এ যুদ্ধ চলল আট দশ দিন। শেষে হার মানলে সীমা। সে একা আর সকলে একদিক। বাবা, মনো-মাসী এমন কি ক্ষমা পর্যন্ত। পাড়াপ্রতিবেশীর কাছেও গোপন ছিল না। চক্কোত্তিবাড়ীর কোন কথাই গোপনে হয় না—সবই হয় উচ্চ নাদে। তারাও সকলে বাবার পক্ষে। তারা একবাক্যে বললে—এ তো ভাগ্যির বিয়ে গো। এমন হয় কার। অনেক ভাগ্যি মা, তোমার অনেক ভাগ্যি—এ তুমি লক্ষ্মীর আসনে বসতে যাচ্ছ, তাতে লাথি মেরো না। লাথি মেরো না। এমন তো কখনও দেখি নাই মা!

মনোরমা বললে—আমার কথা তোমার ভাল লাগে না জানি! তবু বলছি সীমা—এতে তোমার ভাল হবে—সুখে থাকবে।

মনোরমা তার নিজের জীবনের কথা বলেছিল। বলেছিল, এই আমার দিকে দেখ। আমি এমন ছিলাম না। বিয়ে দিয়েছিল, —পাত্র দেখে, ঘর দেখে নি বিষয় দেখে নি—শুধু পাত্র। পাত্র সুপাত্র, ভাল লেখাপড়া—চাকরী ভাল—শ্বশুর শাশুড়ী নেই—মনে হল এমন বিয়ে কার হয়। পাঁচ বছর যেতে না যেতে বিধবা হলাম। নিরাশ্রয়। ভাই—বিদেশে চাকরী করে। সেখানে ছিলাম কিছু দিন কিন্তু সে দাসী বাঁদার চেয়ে অধম অবস্থা। রাঁধুনী ঝি-এরাও

খেতে পায় কাপড় পায়। এ শুধু, পেট ভাতা। আর বউয়ের বাক্যবাণ সে অসহ্য। সেখান থেকে চলে এলাম গাঁয়ের ভিটেতে—ভিক্ষে করে খাব খেটে খাব। তাও তো অভ্যেস নেই, পারলাম না। একদিন মরতে যাব বলে বেরিয়েছিলাম। গলায় দড়ি দিতে পারি নি। বিষ গুলে খেতে পারি নি। শেষ—নদীতে ঝাঁপ খাব না হয় বর্ষার রাত্রে পথে সাপে কামড়াবে বলে রাত্রে পথে বেরিয়েছিলাম। সেই রাত্রে পথে তোমার বাবার সঙ্গে দেখা। কোথা থেকে আসছিল।

একটু থেমে হেসে মনোরমা আবার বলেছিল, তোমার বাবাকে লোকে পাষণ্ড বলে। হয়তো সে পাষণ্ড আজ হয়েছে। কিন্তু সেদিন আমার সঙ্গে পাষণ্ডের ব্যবহার কিছু করে নি। শুধু বলেছিল—আজকের দিনটা তুমি মরা ক্ষান্ত দাও। চল আমার বাড়ী চল। আমার বুড়ো মা আছে তার কাছে থাকবে রাত্রিটা, কালকের সন্ধ্যে পর্যন্ত। তারপর যদি চাও রাত্রে ঠিক এই ভাবেই বেরিয়ে আসবে। বলেও দিচ্ছি কি ভাবে মরবে। পথে বের হলেই সাপে কামড়ায় না। আমি একরকম নিশাচর, আমাকে দেখ আজও সাপে কামড়ায় নি। নদীর জলে ঝাঁপ দিয়েও মরতে না পার। ট্রেন! ওই চন্দনপুরের ধারে নদীর উপর ব্রিজের মুখে লাইনে মাথা দিয়ো। দেখ—স্বামীর যদি খুদ কুঁড়ো কিছু থাকত—তবে আমাকে এই দুঃখদশায় পড়তে হত না। আজকের দশাকে আমি দুঃখদশা বলি না। তোমরা জান না, লোকে জানে না, জানতেন তোমার ঠাকুমা। পরের দিন ভেবে ভেবে যখন মরবার সাহস ফুরিয়ে গেল—তখন তোমার বাবাকে বললাম—আমাকে একটা কাজকর্ম দেখে দিন—আমি খেটেখুটে খাব। তোমার বাবা বললেন,—কি কাজ করবে? রাঁধুনীগিরি? সেখানেও বিপদ আছে। অনেক বিপদ। তাঁর চেয়ে একটা কথা বলব? আমার ঘরে থাক—আমার মা-মরা মেয়ে দুটোকে মানুষ কর—বুড়ো মায়ের সেবা কর। তোমার ঠাকুমা একদিন ডেকে বললেন—বাবা, বিধবা বিয়ে তো হয় শুনেছি। তোরা

দুজনে বিয়ে কর। আমার চোখে ছানি পড়ছে—তবু আমি দেখতে পাই বুঝতে পারি তোরা দুজনকে ভালবেসেছিস। তা আমার কথা শোন। ভাল হবে। ধর্ম খুশী থাকবেন। বিয়ে আমাদের হয়েছে। তোমার ঠাকুমার সামনে—মালা বদল করে বিয়ে হয়েছিল। কথাটা গোপন রাখতে হয়েছে। চণ্ডীতলার সেবাইতগিরির জন্যে—আর তোমাদের বিয়ের জন্যে। অপবাদ মাথায় করে আমি নিয়েছি—ওই সেবাইতগিরি দশ পনের টাকা আয়ের জন্যে। সেও টাকা—সীমা। এ কালে—এ কালে কেন সব কালে—পুরুষের চরিত্রদোষ—চাঁদের কলঙ্ক। রক্ষিতা রাখলে মাপ হয় সব। কিন্তু বিধবাবিবাহ? সর্বনাশ! আমার কথা শোন। এতে তোমার ভাল হবে। তুমি তো শক্ত মেয়ে। রমেনের পয়সা আছে, বুদ্ধি আছে খাতির আছে—ওর দোষটোষ শুধরে নেবো!

সীমা এই কথাতেই সেদিন প্রথম টলেছিল। প্রণাম করেছিল মনোরমাকে। মনোরমা কোলের কাছে টেনে নিয়ে বলেছিল—আমাদের বিয়ের কথা বলো না সীমা। তা হলে ওই দশ-পনেরটা টাকা যাবে। ক্ষমার বিয়ে যেখানে ঠিক হয়ে আছে সেও ভেঙে যাবে।

ক্ষমা এ সব কথা শোনে নি। সে সীমাকে ভয় করত এবং দেখতেও পারত না। সীমা ওকে বলত—বিবি। সে ক্ষমার সাজ-গোজে অনুরাগের জন্য।

ক্ষমা ওকে বলত—মেয়ে প্রহ্লাদ! ধিঙ্গী!

ক্ষমাও ওর হাত ধরে বলেছিল—কেন কেলেঙ্কারী করছিস দিদি? না—না—না। এ সব তুই করিস নে। বাবার মুখটা হাসাস নে। লোকে যাচ্ছেতাই বলছে তুই শুনিস নি।

সপ্রশ্ন ভঙ্গিতে ভুরু দুটি কুঁচকে উঠেছিল—কি যা তা বলছে?

—বলছে; চন্দনপুরে তুই বাবুদের ছেলেদের প্রেমে পড়েছিস। ওখানে পড়তে যাস; বাবুদের ছেলেদের সঙ্গে রেসিটেশন করেছিস—থিয়েটার করেছিস—সেই সব নিয়ে যা তা বলছে। সেই জন্যে

তুই বিয়ে করতে চাচ্ছিস না।

তার রাগও হয়েছিল—হাসিও পেয়েছিল। বাবুদের ছেলে—ওই শুভেন্দু? দূর। থিয়েটারে ও কচ সেজেছিল—সে সেজেছিল দেবযানী। শুভেন্দু আবৃত্তি ভাল করে, এ্যাক্টিং করে, কিন্তু রোগা লিক্‌লিকে—কোল কুঁজো—দূর! তপনের সঙ্গেও রেসিটেশন করেছে। সে তো তার থেকে বয়সে ছোট—তাকে দিদি বলে! রাম রাম রাম!

ক্ষমা তার হাত ধরে ফিস ফিস করে প্রশ্ন করেছিল—সত্যি কথা সীমা?

সে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলেছিল—ভাগ্‌!

—তবে?

সে উত্তর দেয় নি। উঠে চলে গিয়েছিল। বিকেলবেলা মনোরমা তাকে বলেছিল—ক্ষমা একটা কথা বলছিল সীমা—

—সে সব মিছে কথা মাসী। ওটা একেবারে পচা। দিন রাত্রি প্রেমের স্বপ্ন দেখছে। ওর জন্যেই সাবধান হয়ো।

মনোরমা মুখে প্রশ্ন করলে না—মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। অর্থাৎ উত্তরটা ঠিক সম্পূর্ণ হয় নি। সীমা হেসে বলেছিল—আমাকে বললে—লোকে বলছে—তুই বাবুদের ছেলেদের প্রেমে পড়েছিস। তারপর হাত ধরে চুপি চুপি বলে—সত্যি কথা সীমা? তা কি বলব? বললাম—ভাগ্‌। তাতেই মনে হয়েছে ওর সত্যি। তা বল না—কি বলতে পারতাম আর? খুব চীৎকার করে বলা উচিত ছিল? না—কোমর বেঁধে রাস্তায় বেরিয়ে চেঁচাতে হত—কোন্ আবাগী ভাতারখাগী বলে—কোন ঝাঁটাখাগী পোড়ারমুখী বলে—আমি বাবুদের ছেলেদের প্রেমে পড়েছি? সে হেসে ফেললে।

মনোরমাও হাসল। বললে—তা হলে একটা কিছু ঠিক করতে হবে তো?

—কি আর হবে? যা চিরকাল হয়। বাপ যখন হাড়কাঠে ফেলে কোপ মারে তখন বাঁচায় কে। গর্দান দিতে হবে!

—না না। এমন তুমি ভাবছ কেন?

—না মাসী। ভাবছি নে এমন। বাবাকে বলো—তাই হবে, বিয়ে ওকেই করব। প্রেমেট্রেমে কারুর পড়ি নি আমি। আমার ইচ্ছে ছিল পাশ করে চাকরী করব। ম্যাট্রিকটা পাশ করলে—ছোট ইস্কুলে একটা মাস্টারি নিতাম—তারপর প্রাইভেটে—আই.এ. বি.এ পাশ করতাম। ওই চাকরী করব ভারী শখ ছিল আমার জান এই দিদিমণিরা ওই সব মেয়ে অফিসাররা—কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে আসে—কেমন স্বাধীন জীবন—এই রকম হবার সাধ ছিল। বাবাও বলত—পাশটা কর চাকরী করবি। তা বাবার দোষ তো খুব দিতে পারব না? সে তো পড়বার সুযেগে দিয়েছিল, লোক-নিন্দে মানে নি—আমাকে সাইকেল চালানো শিখিয়ে—সাইকেল দিয়েছিল। বলেছিল, চলে যা চেপে ইস্কুল। যে যা বলে বলুক। মাস্টারদের বলে দিয়েছিল— দেখিয়ে শুনিয়ে দেবেন। আমিই পাশ করতে পারলাম না। আর একবার দিলেও পাশ করব—তাই বা কি করে বলি। তার থেকে ঠিক বলেছ—বিয়েই ভাল। তবে লোকটাকে ভাল আমার লাগে না।

মনোরমা খুশী হয়েছিল। হেসে বলেছিল - পরে ভাল লাগবে তোমার, তুমি দেখো।

॥ ৭ ॥

এরপর বিয়ের দিন স্থির হয়ে আয়োজন হয়েছিল। সীমা আর কোন কথা বলে নি। তার মনের মধ্যে একটি অতি মৃদু করুণ আক্ষেপ—অতি ক্ষীণ স্বরে বিলাপের মত ধ্বনিত হয়তো হয়েছে,—কিন্তু বিয়ের আয়োজনের সানাই কাঁসি ঢোলের আওয়াজের মধ্যে সে সুরটি হারিয়ে গেছে। সে নিজেও শুনতে পায় নি—সে করুণ ধ্বনি বা—বুঝতেও পারে নি যে, চোখ তার যেন ভিজে-ভিজে। হয়ে

উঠেছে। এরই মধ্যে গায়ে হলুদও হয়ে গেল। হলুদ মাখা হল,—রঙ খেলা হল। তখন সীমা যেন কেমন হয়ে গেল। একটা আশঙ্কা—তার সঙ্গে আনন্দ। সে বিচিত্র অবস্থা। অনেকটা বিহ্বলের মত।

তারপর বিকেল বেলা এসে উপস্থিত হল চন্দনপুরের ইস্কুলের বন্ধুরা। চন্দনপুরের ইস্কুলের কজন—মেয়ে সঙ্গে তাদের একজন শিক্ষয়িত্রী 'আরাধনা দি।' আরাধনা দি—বয়সে হয় তো দু এক বছরের বেশী, ছোট্টখাট্টো শ্যামলা মেয়েটিকে কেউ শিক্ষয়িত্রী ভাবতে পারে না, ক্লাস নাইন টেনের মেয়েরা তার থেকে মাথায় বড়। বয়সেও দু জন বেশী। আই.এ. ফেল করে আরাধনা ইস্কুলে চাকরী নিয়েছে মাত্র মাস ছয়েক। এর মধ্যে সে ছাত্রীদের সঙ্গেই বেশী মিশে গেছে। অন্য শিক্ষয়িত্রীরাও সকলেই অল্পবয়সী নস্তুবালা বলে ঃ—সব দুধের মেয়ে গো! এই খানিকটা হাঁপালো! অর্থাৎ তার ধারণা প্রকৃত বয়স থেকে ওদের একটু বেশী বড় দেখায়। ওদের সকলেই কুমারী বলে—এ ধারণা তার হয়েছে। নস্তুর কথা নস্তুরই – সে থাক। আরাধনার সঙ্গে এই সব শিক্ষয়িত্রীর বয়সে পার্থক্য অল্প বলে সে তাদের সঙ্গে মেশে একটু সঙ্কোচের সঙ্গে, তার মেলামেশা বয়স্কা ছাত্রীদের সঙ্গেই বেশী। সেই সূত্রে গত কয়েক-মাসের মধ্যে সীমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বেশ নিবিড় হয়েছিল। পরীক্ষার আগে মাস দেড়েক সীমা হোস্টেলে ছিল। সিট ছিল না—, তখন আরাধনাই তার সিটের চৌকির সঙ্গে একখানা বেঞ্চি যোগ দিয়ে—সেটাকে ডবল সিট করে নিয়ে সীমাকে জায়গা করে দিয়েছিল।

বিয়ের সময়ে সীমা ওদের নিমন্ত্রণ করিয়েছে। ওরাও দল বেঁধে বিকেলে এসে হাজির হল। অন্য দিদিমণিরা সব আসবেন সন্ধ্যেবেলা। আরাধনা বললে—কাল আমি থাকছি না সীমা। আসতে পারব না।

সীমা সপ্রতিভ মেয়ে এবং প্রগল্‌ভার চেয়েও বেশী, একটু প্রখরা। তবে সে সেদিন কেমন লজ্জায় কোমল অবনতমুখী হয়ে গেল!

আরাধনার কথা শুনে সে জিজ্ঞাসা করেছিল—কেন? আসতে পারবেন না কেন?

—একটা ইণ্টারভ্যু আছে। বর্ধমানে যাব। চাকরীটা ভাল। তাই আজ এলাম শুভেচ্ছা জানাতে! গুডলাক্! তোমার এ সব দুর্ভাবনা ঘুচল।

একটি ক্লাস টেনের মেয়ে—বয়স সবার বেশী, চন্দনপুরেরই মেয়ে—সে বললে—হ্যাঁ। গরু-জন্ম খালাস!

অন্য একজন বললে—হিংসা হচ্ছে না কি?

—তা ভাই হচ্ছে। পাশও করতে পারছি না—বাবাও বিয়ে দিয়ে বিদেয় করতে পারছে না। এ কি—বিচ্ছিরি কাণ্ড বলতো! আমার দাদু—কি, বলে জানিস? আমাকে পড়তে শুনলে বলে—এই—এই থাম। ঘ্যানর—ঘ্যানর! সেই যে কোন্ মান্ধাতার আমলে আরম্ভ করেছে—One morn I met a lame man in a lane close to my farm—সে লেন আর পার হল না আজ পর্যন্ত। লেংচে লেংচে লেংচে চলেইছে চলেইছে। বন্ধ কর। যা ভাত রাঁধ গে যা।

সকলে হেসে উঠল।

তারপর গান হল। দুটি বোন কলকাতায় বাড়ী—ভাল গাইতে পারে—তাদের একজন গান গাইলে। ফিল্মের গান—

জানতাম তুমি আসবে—তুমি আসবে—
এসে হাসবে, ভালোবাসবে কোনদিন।

মেয়েরা মুচকে মুচকে হাসতে স্থরু করেছিল। সীমা মুখ নত করে তাকিয়েছিল মাটির দিকে। তারই মধ্যে সকলের অলক্ষ্যে টপ টপ করে দুটি ফোঁটা জল ঝরে পড়েছিল। তাড়াতাড়ি জল মুছে :ফেলেছিল বটে, কিন্তু মনের সেই যে চাপা দেওয়া বেদনা দুঃখ-অতৃপ্তি, যাই তার নাম হোক; আবার বের হতে স্থরু করেছিল অগ্ন্যুদগারের মত, সে আর নেভে নি। সারা রাত্রি সে জেগে ছিল।

প্রেমে সে কারুর পড়ে নি; না—না—না। তবে যার প্রেমে

পড়তে পারে কখনও কোনদিন—সে ওই কালো মুস্‌কো ওপেন-ব্রেস্ট কোট পরা টাকার অহঙ্কারে অহঙ্কারী রমেন আচার্যি নয়। তার প্রেম ওই নতুন কালের দিদিমণিত্বের সঙ্গে। ওই যে সেদিন জীপে করে নতুন সোস্যাল এডুকেশন অফিসার মিস বিশ্বাস এসেছিলেন—ওই অফিসারত্বের সঙ্গে। অফিসারত্ব তার রাজপুত্র। দিদিমণিত্ব তার মন্ত্রীপুত্র। হাসপাতালের নার্সরা আছে—ওটা তার কাছে কোটালপুত্র। কোটালপুত্রকে সে বরণ করবে না। রাজপুত্র দুর্লভ। মন্ত্রীপুত্র খুব দুর্লভ নয়।

তার বাবা ঠাট্টা করে বলে—বলে নয় বলত—পাশ তো কর। তারপর বিয়ে যদি করিস তবে রাজপুত্তুর পারব না—মন্ত্রীপুত্তুর একটা জুটিয়ে দেব। এক এক প্রভিন্সে এখন মন্ত্রী উপমন্ত্রী তিন তিন ডজন করে।

কিছুতেই মনকে সে শান্ত করতে পারে নি—এই নতুন কালের মেয়েদের এই আশ্চর্য সুন্দর স্বাধীন জীবনের হাতছানি কোন কিছুতেই আড়াল পড়ে নি। শেষ রাত্রে সে ঘড়ি দেখেছিল টর্চ জ্বেলে। গায়ে-হলুদের তত্ত্বে রমেন—নানান জিনিস পাঠিয়েছিল—তার সঙ্গে দামী রিস্টওয়াচও ছিল। টর্চটা ছিল। না-ছিল কি? রিস্টওয়াচ থেকে হাইহিল লেডী সু। রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতা গীত-বিতান থেকে—কলার বক্স পর্যন্ত। অর্থাৎ গার্ডেন পার্টি টিপার্টি থেকে সাহিত্যসভা—শিল্পসভা—পর্যন্ত বিচরণের পক্ষে প্রয়োজনীয় সর্ববিধ উপকরণ। সেই ঘড়িটাতেই সময় দেখেছিল—তখন সাড়ে তিনটে। ক্ষমা পাশে ঘুমিয়ে আছে সে উঠে, সমস্ত গহনাগুলি খুলে রেখে—নিঃশব্দে দরজা খুলে খালি পায়ে বেরিয়ে পড়েছিল। নীচে নেমে এসে—বাড়ীর দরজা খুলে চারিদিক দেখে নিয়ে সোজা পশ্চিম মুখে পথ ধরেছিল। পথে এসে উঠেছিল চণ্ডীতলায়—; নবীনপুর এবং চন্দনপুর দুই গাঁয়ের ব্যবধান দু মাইল দেড় মাইল; এরই ঠিক মাঝখানে চণ্ডীতলা। চণ্ডীতলার সঙ্গে তাদের আবাল্য পরিচয়।

সেবাইত ঘরের মেয়ে। চণ্ডীতলায় কোথায় কি আছে, কোথায় বিপদ কোথায় নিরাপদ স্থান সব তার সুবিদিত। চণ্ডীতলা ঢুকতেই যে শিবমন্দিরটি আছে সেই মন্দিরে ঢুকেই সে লুকিয়েছিল। বড় নিরাপদস্থান। ভয় তার হয় নি। সেবাইত ঘরের মেয়ে—দেবতাদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ; মূর্তির কতটা পাথরত্ব কতটা দেবত্ব তাও তাদের ভালভাবে জানা আছে বলেই নাড়তে ছুঁতে—গা ঘেঁষে বসতে ভয় হয় না। তার উপর সীমা হল অমর চক্কোত্তির কন্যা। চল্লিশ সালের পর চক্কোত্তি যখন থেকে দেশ-সেবক থেকে রাজনীতিজ্ঞ হল—তখনই ওর শৈশব। সে দিক থেকে, চণ্ডীর-পেটে কিল-মারা অমর চক্কোত্তির কন্যা সে। সে মন্দিরে ঢুকে মার্কণ্ডেয়ের মত শিবের কাছে গড়িয়ে পড়ে নি—জড়িয়ে ধরে নি—তাকে অবশ্য অপমান করেও কিছু করে নি—শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি অনুযায়ী দেওয়াল ঘেঁষে বসেছিল। মন্দিরটি পূর্বমুখী, ভোরের আলো দরজার ফাঁক দিয়ে পড়বামাত্র সে সেখান থেকে বেড়িয়ে পড়েছিল। প্রথমটা পথ ধরেছিল—ইস্কুল হোস্টেলের। খানিকটা গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিল। না—। ওখানে বাবা আসবে প্রথমেই। দিদিমনিরা যদি—। যদি নয়, নিশ্চয় তাঁরা তার পক্ষ নেবেন না। কারণ অন্য মেয়ের অভিভাবকেরা বিরূপ হবেন। এবং মানে দাঁড়াবে এই যে, দিদিমণিরাই এমন শিক্ষা দিয়েছে। ও ইস্কুলে পড়তে দিলে মেয়েরা বিয়ে করবে না। বলে একটা বদনাম রটে যাবে ইস্কুলের। আরাধনা দি'র চাকরী তো যাবেই।

তা—হলে ? সে দ্বিধার মধ্যে স্টেশনের পথ ধরেছিল। ভোর পাঁচটায় ট্রেন আছে একটা। চড়ে বসবে সেই ট্রেনে।

তারপর ?

তারপর যা হবার তা হবে।

হবে—? ঘষা চুলে এলো খোঁপা—পরনে কোরা তাঁতের কাপড় —তাতে হলুদের আভাস—বিয়ের কনে টিকিটের পয়সা নেই বিনা টিকিটের যাত্রী—এ যে ঘর থেকে পালানো বিয়ের কনে বুঝতে দেরী

হবে না এবং পরের স্টেশনে নামিয়ে পাল্টা ট্রেনে চন্দনপুর ফিরে পাঠাবে—বাবা এসে স্টেশন থেকে ধরে নিয়ে যাবে।

তবে ?

তবে—থানা। হ্যাঁ থানা। থানাই সে যাবে। থানাই একমাত্র আশ্রয়। সঙ্গে সঙ্গে থানা মুখো ঘুরেছিল সে—এবং হন হন করে এসে থানার বারান্দায় উঠে সামনে যে সিপাই ছিল—তাকেই বলেছিল—দারোগাবাবু কোথায় ?—কে আছে থানায় ?

সিপাহী অবাক হয় নি—তবে ভেবেছিল অন্যরকম। না। তাও তো নয়। মেয়েটির কাপড়-চোপড় বেশভূষা তো বিপর্যস্ত নয়। সে জিজ্ঞাসা করেছিল—কোথা বাড়ী ? কি হয়েছে ?

—সে দারোগাবাবুকে বলব—তুমি তাঁকে ডেকে দাও।

—এখনও তো ঘুম থেকে ওঠেন নি। বস তুমি ?

—বসব কোথায় ? মাটিতে ? একটা কিছু দাও।

সিপাহীটি এবার তাকে চিনেছিল, এ তো এখানকার ইস্কুলের মেয়ে,একে তো বাইসিক্‌ল্‌য়ে চড়তে দেখেছে। তাই নিয়ে রঙ্গরসিকতাও করেছে নিজেদের মধ্যে। এ তো সেই। সে একখানা মোড়া বের করে দিয়েছিল—তাদের নিজেদের মোড়া। আপিস ঘর তখনও বন্ধ।

সীমা প্রথম মোড়াটায় বসেছিল, তারপর ঢুলতে শুরু করেছিল, কিছুক্ষণ পর আর বসে বসে ঢুলতে পারে নি। মোড়া থেকে নেমে বারান্দার উপর শুয়ে পড়েছিল। থানায় এসে নিশ্চিন্ত বোধ করছে। সত্যই নিরাপদ বোধ করছে সে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম তার সর্বাঙ্গ অবশ করে দিচ্ছে।

ছটা হতে হতে—রাস্তার লোকের চোখে পড়েছিল—থানার বারান্দায় একটি মেয়ে শুয়ে আছে। তারা থমকে দাঁড়িয়েছে কি ব্যাপার ? চুরি করেছে ? ধর্ষিতা হয়েছে ? কি ? কি ? কি ? সংসারে পাপও যত—পেনাল কোডের ধারাও তত। সব ধারাগুলো মনের

মধ্যে সাড়া তুলে চলে গেল সে সকলজনের।

ঘণ্টা দেড়েক সে গভীর ঘুম ঘুমিয়েছিল। তারপর উঠেছিল জেগে। সামনে খানিকটা দূরে তখন জনতা। গুঞ্জন করছে। সঙ্গে সঙ্গে সে পিছন ফিরে বসেছিল। কেউ চিনতে পারে এ ইচ্ছে তার ছিল না। হঠাৎ সকলকে ঠেলে নস্থ এসে তার কাছে দাঁড়াল!—এ-ই! হেই মা গো! তুমি? সীমে?

ঘাড় ফিরিয়ে নস্থকে দেখে আবার সে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

এই সময়েই দারোগাবাবু এসেছিল বেরিয়ে—কি ব্যাপার?

—এই মেয়েটি ভোরবেলা থেকে এসে বসে আছে স্যার।

—আরে? তোমাকে যেন চিনি চিনি লাগছে! হ্যাঁ—। তুমি তো—ইস্কুলে পড়।

সীমা একেবারে হুড়হুড় করে বলে ফেলেছিল—আমার নাম সীমা চক্রবর্তী, আমার বাবার নাম অমর চক্রবর্তী—নবীনপুর আমাদের বাড়ী। এই ইস্কুলে আমি পড়তাম। এবার ফেল করেছি। বাবা আমায় জোর করে বিয়ে দিতে চাচ্ছেন। আমি বাড়ী থেকে ভোর রাত্রে পালিয়ে এসেছি; আমাকে রক্ষা করতে হবে। জোর করে বিয়ে দিলে আমি বিষ খাব—নয় তো গলায় দড়ি দোব—নয় তো ট্রেনের তলায় ঝাঁপিয়ে পড়ব। আপনারা দায়ী হবেন।

—হেই মা—হেই মা—হেই মা। দশ হাত পিছিয়ে গিয়েছিল—নস্থবালা।

দারোগাবাবু তাকেই ধমক দিয়ে উঠেছিলেন—এ্যাই ও! ঢঙ করতে এসেছে দেখ—সঙ কোথাকার!

চমকে উঠেছিল নস্থ। সীমাই বলেছিল—আমিও ওকে চিনি। ও রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল।

দারোগা বলেছিল—ওই বুঝি মন্ত্রণাদাতা?

—না! সীমা জবাব দিয়েছিল।

নস্থবালা বলেছিল—দেখ দিকি বাপু। বদনাম দেওয়া দেখ দিকি!

—চুপ কর ! যা তুই এখান থেকে ! যা—।

আঙুল দেখিয়ে দিলে দারোগা।

নস্থ যাবার জন্যই ফিরল—কিন্তু কয়েক পা গিয়েই আবার ফিরে এল এবং দারোগাকে বললে—যেতে আমি পারব না দারোগাবাবু। আমি থাকব।

—থাকবি ?

—হ্যাঁ মশায় আমি থাকব। দেখেন—আমি ভাতুর মা—চির জীবন ভাতুকে নিয়ে কাটালাম। এই কন্যেটি বলছে—জোর করে বিয়ে দিলে—আমি বিষ খাব—গলায় দড়ি দোব—নইলে ট্রেনের চাকায় কাটা পড়ব। তা শুনে আমি কি করে যাই ? যেতে আমি পারব না। আপনারা কি বেবস্থা করেন দেখব ? সীমেকে শুধোব —মা আর তো মরবে না ? সীমে বলবে—না, তবে আমি যাব। তা আপনি রাগই করেন আর রোষই করেন। আমি মশায় বসলাম !

সত্যি সত্যিই বসল নস্থ।

দারোগা বললে—যাও তো রাইটারবাবুকে ডাক তো। ডাইরীটা লিখে নিন। আর শোন বাপু,—কি নাম তোমার গো মেয়ে ? সীমা —বললে না ? হ্যাঁ, সীমা। শোন—ডাইরী মুহুরীবাবু লিখে নিচ্ছেন। তোমার বাবা জোর করে বিয়ে দিলে—খবর পেলে আমরা নিশ্চই গিয়ে বন্ধ করব। তবে সময়ে খবর পাওয়া চাই। হ্যাঁ। আর আশ্রয় দেবার ব্যবস্থা তো আমাদের নাই। আছে একটা হাজতঘর —সেখানে তো চুরি ডাকাতি না করলে ঢোকানো যায় না !

—তা হলে আমি থাকব কোথায় ? যাব কোথায় ?

—তা তো বলতে পারব না বাপু।

জনতা পায়ে পায়ে এগিয়ে এসেছিল—নস্থর এগিয়ে যাওয়া ও চেপে বসবার পর।

এই এগিয়ে আসা দলের কে একজন জনতার মধ্যে থেকে বললে—শুভেন্দুর বাড়ীতে খবর দেব ?

কথাটা অন্তরাল থেকে শব্দভেদী বাণের চোরাগোপ্তা মারের মত মার একটা।

অন্য কে একজন বললে—শুভেন্দুর বাবার মাথা ফেটেছে, এখন তার মাথা ঘামাবার সময় নাই হে।

জবাবে প্রশ্ন এল ওপাশ থেকে।

প্রশ্নকর্তা অজ্ঞাত।

—তা হলে তপন ?

সীমার কানের পাশ দুটো গরম হয়ে উঠল। ঝিঁঝিঁ পোকার মত একটা কিছু ডেকে উঠল কানের দু পাশে। সেই কথা! সেই কথা! সেই কথা! সেই কথা ছাড়া আর কিছু নেই সংসারে। মেয়ে আর পুরুষ হলেই বাস—সেই এক সম্বন্ধ! এক কথা!

কোন কিছুর আকস্মিক দংশনে মানুষ যেমন ভঙ্গিতে চমকে, উঠে দাঁড়ায় তেমনি ভাবে সে উঠে দাঁড়াল—সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—কে বললেন কথা ? কে ? বলুন একবার, বলুন!

চোখ দুটো তার জ্বলছে।

এবার সব চুপ হয়ে গেল। একটি কথার সাড়া উঠল না। তবে একটা চাপা হাসির গুঞ্জন উঠল। কিছু লোক মাটির দিকে চেয়ে রয়েছে মাথা হেঁট করে। মধ্যে মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে সকৌতুকে দৃষ্টি বিনিময়ও চলছে। অন্য সকলে অন্য দিকে চেয়ে রয়েছে, তাদের মুখের হাসি গুঞ্জনমুখর নয়, শুধু নীরব রেখায় ফুটে উঠেছে। কিছু লোক ভুরু কুঁচকে তিক্ত দৃষ্টিতে সীমার দিকে চেয়ে আছে। সীমার কথা তাদের আহত করেছে।

নন্টুও উঠে দাঁড়িয়েছে সীমার সঙ্গে সঙ্গে। সেও সবিস্ময়ে দেখছে সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে। সীমা উত্তরের প্রতীক্ষা করছে—ওরা হাসির শব্দে রেখায় বিরক্তিতে উত্তর দিচ্ছে। এরই মধ্যে নন্টু হাত জোড় করে বললে—কি রকম করণ! ভদ্দ সন্তান সব! এ কি কাজ! একটি কুমারী কন্যে, আপনাদের কন্যে! হায় হায়

হায়। টুকটুকে পারা ভাল ঘরের ছেলে কেউ এগিয়ে এস—বল—চল আমার ঘরে চল—আঃ লক্ষ্মী পথে চলে যাচ্ছে—কেউ দোর খুলে ডাকে না গো!

সীমা তীব্র কণ্ঠে বলে উঠল—না। ভাতুর মা তুমি থাম। চুপ কর বলছি। বিয়ে আমি করব না।

অবাক হয়ে গেল নসু—বলে উঠল—হেই মা! ওই কালোমুসকো মুন্‌সেকে বিয়ে করবে না—ওই যখের ঘরে পা দেবে না আলাদা কথা, তাই বলে—।

—না—না—না। মধ্য পথেই বাধা দিল সীমা।—চুপ কর তুমি। তুমি যাও এখান থেকে।

দারোগাবাবুটি চুপ করেই বসে সমস্ত দেখছিল—শুনছিল। বুড়ো লোক এবং লোকটি চতুর বলে খ্যাতি আছে। লোকে বলে, নীলার তুল্য কতকগুলি রত্নসম ব্যক্তির একটি চক্রবলয় গঠন করে দারোগাবাবুটি তার মাঝখানে সম্পদ ও শক্তির সৌভাগ্যের মসনদে বসে আছে। পাত্র রমেন আচার্যও সেই চক্রবলয়ের রত্নগুলির অন্যতম একটি বড় রত্ন। দারোগাবাবু রমেনের বিয়ের কথা জানে এবং তার নিমন্ত্রণও আছে, অমর চক্কোত্তির বাড়ীতে আজ সন্ধ্যায় বরযাত্রী যাবার কথা। বিয়ের পর বিশেষ বন্ধু সম্মেলনেও নিমন্ত্রণ আছে—সেখানে সেই বোধ করি তার প্রধান অতিথি হয়ে বসবে। এখন এটা কি হল?

মাঝে মধ্যে মন তার খিঁচড়ে ওঠে। দেশ স্বাধীন হল। গণতন্ত্র হয়েছে! কচু হয়েছে। ইংরেজ আমল হলে—এক ধমকে বা একবার গলা ঝেড়ে রক্তচক্ষে লোকগুলোর দিকে তাকালে সঙ্গে সঙ্গে সব সাফ হয়ে যেত। বিলকুল সাফ। এবং সে নির্ভয়ে মেয়েটাকে হাজতে পুরে খবর পাঠিয়ে দিত অমর চক্কোত্তির কাছে—একজন চৌকিদার ছুটিয়ে দিত বন্‌চাতরায়! কিন্তু এই ইনকিলাবের কাল—আর গণতন্ত্রের রাজত্ব; —সে করতে সাহস হয় না। কিন্তু করবেই

বা কি ? কুল কিনারা তো দেখতে পাচ্ছে না।

ইতিমধ্যে মুহুরীবাবু এসে পড়ল। ধমক দেবার একটা লোক পেয়ে রাবণারি সিংহ ফেটে পড়ে বাঁচল বললে—কতক্ষণ লাগে তোমার মুখ ধুতে হে। নাও, এই মেয়েটার ডাইরী লিখে নাও। যাও গে মেয়ে— বলগে—ওঁকে, কি বলবে ? আর শোন—

—কি ?

—যদি আত্মহত্যা করবে বল—তা হলে তোমাকে এ্যারেস্ট করব আমরা। বুঝে ডাইরি লিখিয়ো।

—বেশ তো ! আমি তাই চাচ্ছি ! জেলে চলে যাব। তাও আমার ভাল।

—না। তোমাকে পাগলা গারদে পাঠানো উচিত। কিন্তু ওসব কোথাও পাঠাবো না। তোমার বাপকে ডাকব—বলব, এই শুনুন আপনার মেয়ে কি বলছে।

হঠাৎ তিনি ফেটে পড়লেন—ডেঁপো—ইচড়ে পক্ক ফাজিল মেয়ে কোথাকার ! যেমন ওই চক্কোত্তি বামুনটা—তেমনি তো হবে তার মেয়ে। মাতাল চরিত্রহীন—আবার পলিটিকাল ওয়ার্কার—আজ তেরঙ্গা ধরে,—কাল লালঝাণ্ডা ঘাড়ে করে ইনকিলাব করে পরশু হিন্দু মহাসভার ঝাণ্ডা তুলে নাচে। পেতে হবে না তার ফল ?

—আপনি চুপ করুন।

—আপনি চুপ করুন। ভেঙিয়ে উঠল দারোগা।— অনারেবল মেয়ে-মন্ত্রী এলেন আমার। হুকুম চালাচ্ছেন।

সীমা এবার লাফিয়ে নেমে পড়ল বারান্দা থেকে—বললে— চললাম আমি। ডাইরীতে আমার দরকার নেই। আপনারা সাক্ষী থাকুন। দারোগাবাবু যা বললেন— যে ব্যবহার আমার সঙ্গে করলেন আপনারা তা চোখে দেখেছেন, কানে শুনেছেন।—এরপর আমি যাব সদরে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আর পুলিশ সাহেবের কাছে।

দারোগা চমকে উঠল।—কনেস্টবল ! এ্যারেস্ট হার। পাকড়ো !

সঙ্গে সঙ্গে সীমা ঘুরে দাঁড়াল কেন? খবরদার আমার গায়ে হাত দেবে না।

—এস তুমি আমার সঙ্গে এস। আমি তোমাকে নিয়ে যাব ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে।

ভবানীকিঙ্করবাবু। এই গ্রামের এককালের উচ্চ মধ্যবিত্তের সন্তান। এখানকার পুরানো কংগ্রেস কর্মী—সেই উনিশ শো তিরিশ থেকে।

—বাঃ! ঠিক সময়ে এসেছেন ভদ্রলোক। দারোগা বক্রহাস্যের সঙ্গে বললেন—কিন্তু শুনুন ভবানীবাবু—আপনি আমার কাজে বাধা দিচ্ছেন।

—বেশ তো—তার জন্যে যা হয় করবেন। চল তুমি—।

—দাঁড়ান। আপনার বিরুদ্ধে একটা নারীঘটিত ব্যাপার নিয়ে কেস হয়েছিল।

—সে কেস মিথ্যা। আদালত রায় দিয়েছে! আপনিই সে কেস করিয়েছিলেন।

—না, করাই নি। একথা আমি মেয়েটি বলছি—। ওগো মেয়ে, তুমি তার পরও যাবে ওঁর সঙ্গে?

—যাব।

হঠাৎ জনতার পিছন দিকে একটি চাঞ্চল্য—ঘটনার প্রবাহটিকে, বন্যার স্রোতকে যেমন—পাশের কোন বিলের আধারে টেনে নেয়, তেমনি ভাবেই মোড় ফিরিয়ে দিলে। দুটি আধুনিকা মেয়ে এগিয়ে এল ভিড় ঠেলে।

—দয়া করে একটু সরুন তো! একটু পথ দিন!

সুশ্রী মার্জিতরুচি আজকালকার মেয়ে। এখানকার ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রী। হেডমিস্ট্রেস আর একজন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট টীচার, কমলা দিদিমণি।

তারা এসে দাঁড়াল—সীমার পাশে। সীমা মাথা নামালে। সে বুঝতে পারলে না—কি বলতে এসেছেন বড় দিদিমণি আর

কমলা দিদিমণি। সে ভাবছিল, দিদিমণি বলবেন—এ কি করেছ সীমা। আমাদের বদনামের যে শেষ থাকবে না! ছি—ছি—ছি।

না। তা বললেন না। কমলাদিদি বললেন—আমরা এই মাত্র খবর পেলাম।

বড় দিদিমণি বললেন—চল, আমার ওখানে চল। পাগল মেয়ে কোথাকার।

দারোগা বললেন—তা হলে ওকে বুঝিয়ে ওর বাপের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। বুঝলেন? ওর বাপকে আমি খবর পাঠাচ্ছি। সে এসে নিয়ে যাবে!

—ও যদি যেতে না চায় তো পাঠাব কেন? কমলা দিদি বললেন। বড়দিদিমণি ভুরু কুঁচকে তাকালেন কমলার দিকে। বড়দিদিমণি কানে খাটো। কমলা খুব কাছে এসে ওকে বললেন কথাগুলি। মুখের দিকে চেয়ে—শুনে—বুঝতে পারেন তিনি।

দারোগা বললেন—একটা কথা মনে রাখবেন—মেয়েটি মাইনর!

—না। ওর বয়স আঠারো পার হয়ে গেছে।

—আপনি কি করে জানলেন?

—আমাদের স্কুলের খাতায় আছে। ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্য যে ফর্ম পূরণ করেছে—তাতে আছে। সীমা মাইনর নয়। চলো সীমা!

ভবানীবাবু এতক্ষণ চুপ করেই দাঁড়িয়েছিল—সে বললে—ভালোই হল। তুমি তাই যাও। তোমার বাবা আমাকে ভাল চোখে দেখে না। তুমি তা জান। সে ভাবত, লোকেও ভাবত—আমি শত্রুতা করবার জন্যেই তোমাক বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে আশ্রয় দিয়েছি। এই জন্যে অনেকক্ষণ লোকেদের পিছনে দাঁড়িয়ে শুনেছি আর ভেবেছি। এ খুব ভাল হল।

দিদিমণিদের সঙ্গে সীমা—বড়দিদিমণির কোয়ার্টারে এসে উঠল; পিছনে পিছনে জনতার অংশ।

তারা তখনও পেছন ছাড়ে নি।

বাড়ীর দোরে দুহাত মেলে সকলকে আটকে বারবার ভবানীবাবু বললে—আর কেন সব ? কেন পিছনে পিছনে আসছ ? যাও। যে যার বাড়ী যাও। কাজে যাও। যাও।

তাতে দু চারজনই খসল। বাকী সব একটু দূরত্ব বাড়িয়ে চলতে লাগল। নসু কিন্তু সঙ্গ ছাড়ে নি। সঙ্গে সঙ্গেই চলছে। মাত্র দু চার পা পিছনে থেকে। আপন মনেই বলছিল—ভাতুর আমার কালের বা' লেগেছে। হায় হায় হায়।

ভাদু আমার বিয়ে করবে না !—তবে কি করবে ভাদু মা ? —না নেকাপড়া শিখে চাকরী করব। হায় হায় হায়। তা, চাকরী করে, 'ভাতুর মা দুখিনী'কে একখানি কাপড় দিয়ো যেন। সেই কাপড় পরে নাচব—আর তোমার মহিমে গাইব। ও মন রসনা আমার।

॥ ৮ ॥

সন্ধ্যের সময় সেই গানই জুড়েছিল নসুবালা আর গুন-গুন করছিল। সীমার সঙ্গেই তার একটা বেলা কেটেছে। ভিক্ষেই আজ করা হয় নি। তা না হোক। ভবানীবাবুর বাড়ীতে আধ সের চাল পেয়েছে। তার মা দিয়েছেন। মেয়েদের বোর্ডিং আর ভবানীকিঙ্করদের বাড়ী লাগালাগি—এক দেওয়ালে। ভবানীবাবুদেরই ন' আনার শরিকদের দালান সমেত বাস্তুবাড়ী কিনে মেয়েদের বোর্ডিং হয়েছে। সে শরিকরা এখন ফকির। ভবানীবাবুর মা—সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা ঠাকরুণ। দুর্গা মা। দয়ার আর পারাপার নাই। ওঁর কাছে গেলেই পেটটা ভরবে। আধ সের চাল। সেই চাল ক'টি নিয়েই বাড়ী এসে ফুটিয়েছে, স্নান করে —ভাদুকে মুখ মুছিয়ে কাপড় ছাড়িয়ে—খানকয়েক বাতাসার ভোগ দিয়ে—খেয়ে নিয়ে বসে বসে শুধু ভেবেছে। সীমার কথাগুলি মনের মধ্যে—ফুলন্ত গাছের চারিপাশে উড়ন্ত মৌমাছির মত, প্রজাপতির

মত ঘুর ঘুর করে ঘুরছে। হায় হায়—ভাতুর আমার ভাবনা শোন দিকি! সাধ শোন দিকি!

আগের কালে লোকে বলত—লক্ষ্মী হও মা। লক্ষ্মী হও!

ভাতু বলছে—না বাবা, লক্ষ্মী নয়—বল সরস্বতী হও!

ভাতু বলে—লক্ষ্মী আমি হব না কো—
উটি বলো না—
খাটিতে নারিব আমি—ও মন রসনা আমার—
নারায়ণের তিলশুনা।

সেই লক্ষ্মীর কথায় আছে- এক গরীব ব্রাহ্মণের ক্ষেতের দুটি তিলফুল কানে পরেছিলেন বলে—নারায়ণের হুকুমে এক বছর লক্ষ্মী-কে বামুনের ঘরে দাসীবৃত্তি করে 'তিলশুনো' খাটতে হয়েছিল। তা বটে—বাপের ঘরে—কন্যে লক্ষ্মী—হাত-মুড়কো—মানে ছোটখাটো ফাইফরমাশের ছোট ঝি। শ্বশুর ঘর যাবার সময় বাপকে আধ মুঠো ধান দিয়ে আধ মুঠো ধান সঙ্গে নিয়ে যায়। তা গেলে কি হবে, শ্বশুরবাড়ীতে কন্যের অবস্থা হয় ওই তিলশুনো খাটা লক্ষ্মী তার চেয়ে সরস্বতীই ভাল।

নতুন কালের ভাতু আমার
নাম হয়েছে সীমে।
মহিমে তার ঢাকে ঢোলে—ও মন
রসনা আমার তার সঙ্গে শিঙে।

মধ্যে মধ্যে ছুটে ছুটে গিয়েছে বেয়াইয়ের সন্ধানে।

—বেয়াই! বলি ফিরেছ?

বেয়াই ফেরেনি, ঘরের তালাটা ঝুলছে; অগত্যা নসু ফিরে এসেছে।

কখনও খানিকটা এসে সেখান থেকেই হেঁকেছে—বে-য়াই-হে।

সাড়া না-পেয়ে ফিরে গেছে। বেয়াই আজ খুব বিকিকিনি পেয়েছে তা হলে। সেটেলমেণ্টের ক্যাম্পে আজ ওই দিককার লোক। আকুটির বাবুরা পুরানো বাড়ী। আর লক্ষ্মীকে ওরা বেশ

শক্ত টানে বেঁধেছেঁদে রেখেছিল। এবারে গেলেন মা, রাজ আজ্ঞেতে যেতে হল। ঠেকাবে কে? তারা সব এসেছিল সেটেলমেণ্ট ক্যাম্পে যতটা রাখা যায় মা লক্ষ্মীর পেসাদ! সেইখানেই আজ জমেছে বেয়াই, ফেরবার নাম নাই।

বেয়াই বলে ভাল। বলে, জান—তোমার ওই সব ভাল লাগে। —আমার ভাল লাগে এই সব। খানিক খানিক বুঝি তো। তা বেয়ান, তোমার পাগলের সে গান—সেরা গান। বুয়েচ।—

যে গড়েছে সেই ভাঙে ভাই—
যে ভাঙে সেই গড়ে—
বিধেতা পাগল বুড়ো—
ও মন রসনা আমার—খেলয়ে বালুচরে।
ব্রজধাম সে রচেছিল—কই সে ব্রজ হায়—
বুড়োই ভেঙেছে ব্রজ
ও মন রসনা আমার—তবু বংশী থামে নাই।

বুয়েচ, এও তাই। বিধেতা হুকুম করলেন সেই হুকুম—সেই হুকুমে সাহেবরা গেল; রাজলক্ষ্মী এলেন, গান্ধী রাজার শিষ্যসেবকদের কাছে। বিলিতি বস্ত্র ছাড়লেন—খদ্দর পরলেন—শঙ্খ পরলেন, পাটে বসলেন।

রাজলক্ষ্মী হুকুম করলেন—রাজা-রাজড়ার বাবু জমিদারের বাড়ীর লক্ষ্মীকে নোটিস হল—সব এস—এসে আমার সঙ্গে মিশে যাও।

ফটিক দাসের কাছে রসের উৎস ওইখানে। সব মানুষ সমান হয়ে যাচ্ছে, বেশ লাগছে তার। ফটিক বলে—আমি বেয়ান বনমৌমাছি —বাগানের ফুলে ঘুরি না। ফসলের ক্ষেতে ঘুরি! যত রস ধানেরই ভিতর, বুয়েচ বেয়ান। ধান কোথা হয়? না—জমিতে। ধান কি করে? চাল করে সিদ্ধ করে ভাত বানিয়ে খায়। আর কি হয়? বেচলে টাকা হয়। তাহলে কি হল? রসের গোড়া হল জমি— আগা হল টাকা।

বেয়ান হে, মা গঙ্গার স্তব তো তোমাকে পড়ে শুনিয়েছি।

—হ্যাঁ হে হ্যাঁ। বন্দ্য মাতা সুরধুনি—পুরানে মহিমা শুনি—পতিতপাবনী নারায়ণী—

—হ্যাঁ। মা গঙ্গা ছিলেন ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে, পিথিমীতে নেমে পাহাড় বন দেশ ঘাট ভাসালেন মানুষের জীবন উদ্ধার হল—কিন্তু গেলেন কোথা—না গঙ্গাসাগর।

—বটে বেয়াই বটে। বলছ ভাল। হাকিমকেও বলতে হবে ভাল।

—হ্যাঁ, মা গঙ্গার আদি হল ব্রহ্মার কমণ্ডলু অন্ত হল গঙ্গাসাগর, চান করলে সব কামনা সিদ্ধ হয়। জমি ব্রহ্মার ঘর—টাকা গঙ্গাসাগর আমি সার বুঝেছি—খাঁটি বুঝেছি। আমার ঘর হল না টাকা নাই বলে। জমি থাকলে টাকা হত। শেষ কথা বুঝে নিয়েছি। তোমার রঙের কথা—তোমাকে ভাল—তোমার ভাতুকে ভাল। উ সব দুজন একজন। তাই বুয়েচ—আমি মজা পাই ওই সবে। বসে পুতুল বেচি আর দেখি। হরি হে, তুমি সত্যি হলে, তুমি কখনও জমি কখনও টাকা। তা না হলে ব্রেজধামের রাখালি ছেড়ে মথুরা পালাতে না। রাধাকে ছেড়ে কুঁজিতে মজতে না। শেষ কথা। সার কথা। কুঁজি নয়, মথুরার সিংহাসন।

নসুবালা হাসে। কি বলছে বেয়াই। হায় হায়, দু-দুটো বোষ্টমী আনলে—দুটোই পালাল। বেয়াই বলে—টাকা জমি থাকলে পালাত না। তা আধা সত্যি বটে। কিন্তু! না-না-না। তাই হয়! তুমি জান না বেয়াই শেষ কথা তুমি জান না। শেষ কথাটি সে জানে।

সংসারে শেষ কথা জানা ভারী শক্ত। কিন্তু শেষ কথাটি না জানলে তো মানুষের ঘুম হয় না। নানান জনে নানান কথাকে শেষ কথা ধ'রে নিয়ে মনকে বোঝায়, বলে শেষ কথা পেয়েছি। তাতেই শান্তি পায়, স্বস্তি পায়। সংসারের শেষ কথাটি বুঝেছে ভেবে নিয়ে পরমানন্দে গান গায়। কেউ গান গায় সুরে—কেউ মনে মনে।

সন্ধ্যাবেলা—সুরে স্বরে গান গাইতে গাইতে ফিরল—ফটিক দাস। সে ইচ্ছে করেই উচ্চকণ্ঠে গাইতে গাইতে ফিরল।

ফালের ফুটোয় কাছি পরাও—
দিনের আলোয় আলোয়—
ফাল কাছিতে জমি সেলাই—
ও মন রসনা আমার—সারো ভালোয় ভালোয়।

তালা খুলে আলো জ্বেলে বসতে বসতে তার সাড়া পেয়ে ছুটে এল নস্যুবালা।—বাবাঃ কি বেসাত করলো বেয়াই? কত টাকার বেচলে? সারা দিনটী কাটালে যে!

—বিলকুল ফক্কা বেবাক ফাঁক। সব পুতুল বেচেছি। ডালা খালি। আকুটির বাবুরা আরও বরাত দিয়েছে।

—ওদের অনেক পয়সা নয়?

—ফাল কাছিতে জমি সেলাই করে জমিদারী শালের দোসর দোলাই তৈরী করছে বাবুরা। বাবুদের পয়সা থাকবে না? বলিহারির বুদ্ধি। বসে শুনেছি আর গান বেঁধেছি। দাঁড়াও আগে মাটিটা দেখি—ভিজিয়ে রেখে গিয়েছিলাম। ওঃ, চাষীদের পয়সা কত! শখ কত। হে! একটা ছুটো বেরাকেট ফি জনার চাই। বরাত মেলাই। তোমার খবর বল।

আমি বেয়াই আরো আশ্চর্যি দেখে এসেছি। ফিরেছি কখন! তিন তিনবার তোমার বাড়ী এসে ফিরে গিয়েছি কথাগুলো পেটে গজগজ করছে, শোন। শোন—আমার নতুন ভাদু—সীমেরানীর গান শোন!

—আমারটা আগে শোন বেয়ান। আগে আমারটা। ফাল দিয়ে জমি সেলাই! এ কখনও শুনেছ?

—উঁহু আমারটা আগে!

—দাঁড়াও তো, দাঁড়াও তো!

—ক্যানে—। ওই দেখ—ক্যানে বলছি! ক্যা-নো—ক্যানো!

ফটিকদাস বললে, ব্যাঙের বাজনা বাজছে না!

—ব্যাঙের বাজনা ?

— হ্যাঁ, শোন !

—হুঁ ! দাঁড়াও দাঁড়াও। দেখি দাঁড়াও। দীঘির পাড়ে উঠে দেখি। ওখান থেকে নবীনপুরের শড়ক ফটফটে দেখা যায়।

—দেখতে হবে না। রমেন আচায্যি বিয়ে করতে আসছে।

—হা হা হা। হেসে গড়িয়ে পড়ল নস্থ।

—হাসছ ?

—শোন, গান শোন আমার—।

সে শুরু করল তার গান। ফটিক মাটি ঠাসতে শুরু করল। নস্থ গাইতে গাইতেই বললে—না মাইরি, তুমি যেন কি ? বেয়াই !

—ক্যা-নো ?

—এয়েছ, চা খেলে না ; আমি বেয়ান—চা দিলে না। মাটি ঠাসতে বসলে !

—মাটি না ঠাসলে কালকের ডালা ফাঁক। রেতে গড়ে - আগুনে সেঁকে শুকুতে হবে। সকালে রঙ। পেট ভরতি তো রাজ-ফুর্তি। পয়সা নইলে পেট ভরে না ! নাও। চা কর। আমি ওখানে খেয়েছি। বাবুরা খাইয়েছে। লাও—লাও। এই একটা সিগরেট লাও। এও বাবুদের।

—দাও। রেখে দিই। চা খেয়ে খাব।

হঠাৎ রাস্তা থেকে কে যেন বললে—ওরে, তোদের দেশলাই আছে ?

ভারী গলার আওয়াজে দুজনেই চমকে উঠল।

দুজন লোক—সেই কালিপড়া লণ্ঠনটির স্বল্প আলোয় আলোকিত অন্ধকারের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। ও রে—দেশলাই আছে ?

—কে ? কে বট ? চমকে উঠল নস্থ।

—আমি রে ! যোগপুরের ডাক্তারবাবু !

যোগপুরের ডাক্তারবাবু—ধ্রুব ডাক্তার ! বাপরে ! লোকে বলে এখানকার বিধান রায়। ফটিক দাস এসে হেঁট হয়ে প্রণাম করলে—প্রণাম ডাক্তারবাবু !

—হেই মা গো ! সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি গো !—ও বাবা। নস্থ এগিয়ে হেসে দাঁড়িয়ে বললে—আমাকে চিনতে পারছ তো। আমি ভাতুর মা। কোথা এয়েছিলেন—কার কি হল ?

—জোরে বল—আমি শুনতে পাই না। কানে কালা। এঁটে-এঁটে বল। বদ্ধ কালা আমি।

—আমি ভাতুর-মা, চিনেছ আমাকে ?

—চিনেছি। দে দেখি দেশলাই না হয় আগুন। আলোটা জ্বেলে নিই। রাস্তায় দপ করে নিভে গেল !

কালিপড়া হ্যারিকেন এবং দেশলাই—তুই আনলে ফটিক। আলো পড়ল ডাক্তারের উপর।

শক্ত কাঠামো কালো রঙের মানুষটিকে বড় তো বড়—ছোট ডাক্তার বলেও চেনবার উপায় নেই। পায়ে জুতো একজোড়া আছে, কিন্তু সে জুতো কাদায় ধুলোয় বিবর্ণ শ্রীহীন। শুধু সোলখানা পুরু এটা বোঝা যায়। পরনে মোটা কাপড়, গায়ে গেঞ্জি—জামা, কোট একটা, কাঁধে ফেলা আছে, মাথায় একখানা চাদর বাঁধা। মুখে একজোড়া ভারী গোঁফ, মাথার চুলের ডগাগুলি চাদরের পাগড়ীর প্রান্ত থেকে বেরিয়ে কপালের উপর পড়েছে। তবে ডাক্তারকে দেখেছে সকলে, মাথার চুল তার পাতলা এবং সেগুলি অবিন্যস্তই থাকে। পিছনে ডাক্তারের অনুচর একজন, তার হাতে কলব্যাগ।

ডাক্তার আলোটা জ্বালবার উদ্যোগ করছে - এমন সময় পিছনে অন্ধকার থেকে কে ডাকলে—ধ্রুবদা !

ডাক্তার শুনতে পেলে না, সঙ্গের লোকটি উত্তর দিলে—এইখানে—।

ফটিকদাস সঙ্গে সঙ্গে বললে চীৎকার করে—আমি ফটিক, ডাক্তারবাবু আমার বাড়ীতে।

ডাক্তার মুখ তুলে প্রশ্ন করে তাকালে। সঙ্গের লোকটি ঝুঁকে উঁচু গলায় বললে—ভবানীবাবু ! বলতে বলতে টর্চের আলো এসে পড়ল উঠোনে।

ভবানীকিঙ্কর এসে দাঁড়াল।—এই নাও, দেশলাইটা রাখ। কিনে আনলাম। পথে ও-লণ্ঠন আবার নিভবে।

—দাও। ডাক্তার পকেটে পুরলে দেশলাইটা।

নসু জিজ্ঞাসা করলে—দাদাবাবু—ডাক্তারবাবু কাকে দেখতে আইছিলেন।

—গোপাল চৌধুরীকে রে! মাথা ফেটেছে!

—মাথা ফেটেছে—তা কেমন মাথা ফাটা? বড় ডাক্তারবাবুকে—।

—একটু বেশী বটে। শিরা ছিঁড়েছে—রক্ত বন্ধ হচ্ছে না।

শুনতে পেয়েছিল ধ্রুব ডাক্তার। মুখ দেখে বোধ হয় কথা বুঝতে পেরেছিল। সে ভবানীকিঙ্করকে বললে—বেঁচে যাবে। তবে আর কাজকর্ম করতে পারবে না। হ্যাঁ। বেঁচে যাবে! চল! বরযাত্রীরা পৌঁছুল বোধ হয়। রমেনের বাবা ভুবনের সঙ্গে পড়েছিলাম। রমেনকে একবার টাইফয়েড থেকে বাঁচিয়েছি। কথাগুলি বললে সে ভবানীকে।

ভবানী বললে—তা হ'লে এইটুকু রাস্তা টর্চেই চলে যেতে।

—তা যেতাম। অন্ধকারেও যেতে পারি। যাই তো। তা সেদিন একটা খালে পা পড়েছিল। বয়স হ'ল তো, আলো এবার চাই। রাত্রেই আবার বাড়ীও ফিরব—। সকালে রোগী আসবে। তা তুমি যাবে না? রমেন তো তোমার চ্যালা গো। থানা কংগ্রেসের মেম্বর, তুমি প্রেসিডেন্ট। নেমন্তন্ন করে নাই?

—করেছে। তবে এই ব্যাপার, মানে, আসল কনে তো, এখানে পালিয়ে এসেছে। মিস্ট্রেসরা সাহস করে এগিয়ে এল—তাই—নইলে তো আমিই নিয়ে যাচ্ছিলাম আমার বাড়ী! এখন ছোট মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে। তা খবর তো গোপন থাকবে না। আমিও গোপন করি নি। রমেন কিছু বলুক না বলুক—অমর চক্রোত্তিকে তো জানেন। আর রমেন নামে মেম্বর, সুবিধের জন্যে মেম্বর। নইলে এখানকার যে দল আমার বিরুদ্ধে তাদের সঙ্গে কারবার। আমি যাব না, তুমি যাও।

বলতে বলতেই তারা [illegible] উঠোন থেকে রাস্তায় নেমে

এল। পথে উঠে ডাক্তার বললে—চললাম রে ভাদুর মা! ফটিকচন্দ্র হে—চললাম!

ফটিক বললে—পেনাম ডাক্তারবাবু!

নস্থ বললে—একটা নয় ধন্বন্তরী—একশো পেনাম। রোগে ধরলে মরণে ধরলে সে তুফানে মা চণ্ডী কাণ্ডারী, তুমি তার হাতের হাল বৈঠে! বাবা রে!

ফটিক বললে—শুনতে পেলে না।

—না পাক। আমি তো বলেছি যা বলবার! ভগবান তো আরও কালা। তার ওপর কানে তুলো গোঁজা। তবু তো বিশ্বব্রেহ্মাণ্ড কত ইনিয়ে বিনিয়ে বলেই চলেছে।—কিন্তুক—শুনলে তো—! রমেন্দোর বিয়ের কথা!

—শুনলুম বৈকি! ছোট মেয়ে ক্ষমার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে। বেয়ান হে—যত রস ধানের ভিতর হে ধানেরই ভিতর! রমেন্দোর ধান আছে—জমি আছে—টাকা আছে। কনে পালালে বিয়ে আটকায়? মাটির থেকে কনে গজায়। তুমি নাচছ—

"হায় রমেন্দোর বিয়ে হ'ল না—
নতুন কালের বা' এসেছে, ও মন রসনা আমার
ভাদুরা বিয়ে করবে না—কেউ তা
বলো না!"

—উঁহু! উঁহু!

—উঁহু, কিসের উঁহু!

—শোন বা? না-না-না, শুনিবেন?

—শুনিব।

নস্থবালা গান ধরলে—

"ও হায় নাকের বদলে নরুণ,
ফুলের বদলে রাঙা বিলিতী বেগুন
সীমার বদলে ক্ষমা—ও মন রসনা আমার

তাকত্নমাত্নম !
তাই ঘুনাঘুন—তাই ঘুনাঘুন—
চরণে নূপুর বাজে তাই ঘুনাঘুন।”

ফটিক না-না জানিয়ে নীরবে ঘাড় নাড়ে আর হাসে। মাঝে মাঝে গানের ফাঁকের মধ্যে বলে—বিলিতী বেগুনের অনেক গুণ; অনেক পোষ্টাই। রমেন্দোর এতে ভাল হবে।

এরই মধ্যে আবার কার ভরা গলার সাড়া এল,—ফটিকচন্দ্র! নস্তুবালা!

জিভ কেটে থেমে গেল নস্তুবালা। ফটিক ব্যস্ত হয়ে সসম্ভ্রমে জবাব দিলে—দে-মশায়?

—হ্যাঁ হে। রাত্রি বেশ হয়েছে বাবা! এইবার ঘুমোও। আমরাও ঘুমোই। কি বল!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এই থামলাম আমরা দে মশায়।

—বেশ-বেশ! আমরা যে কানের কাছে কি না!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমরা বুঝতে পারি নাই এত রাত্তির হয়েছে।

—হ্যাঁ। জমেছিল! আমারও ভাল লাগছিল। তা ঘুমের তো দরকার আছে!

ফটিকের বাড়ীর হাত চল্লিশেক তফাতে বড় রাস্তাটার একটা তে-মাথায় দে মশায়ের নতুন পাকা বাড়ী। সেই বাড়ীর বারান্দা থেকে কথা বলছে দে মশায়।

দে—শিবনাথ দে এখন চন্ননপুরের সব থেকে বড় ব্যবসায়ী—লোকে বলে ধনীও বটে। মস্ত গদির মালিক তার সঙ্গে একটা গোটা রাইস মিল—তারও মালিক। কিন্তু আশ্চর্য অনুত্তেজিত ধীর মানুষ। নিতান্ত সামান্য অবস্থা থেকে আজ বিরাট সম্পদের অধিকারী। জীবনটা শুধু হিসেবের জীবন। জাতিতে গন্ধবণিক; বাল্যজীবনে নিদারুণ দুঃখ কষ্ট নির্যাতন সহ্য করেছে দে। বাপ ছিল সেকালের

এক দুর্ধর্ষ মানুষ, উচ্ছৃঙ্খল জীবন ছিল তার। দেনায় আকণ্ঠ ডুবে বিষয় সম্পত্তি বিক্রী করেছিল। তারই ছেলে শিবনাথ। সে ছিল অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলে। চৌদ্দ পনের বছর থেকে নিজের পড়াশুনো করেছে, বিষয় সম্পত্তি নিয়ে মহাজনের সঙ্গে মামলা লড়েছে, কিছু কিছু উপার্জনও করেছে। প্রাইভেটে নীচের ক্লাসের ছাত্র পড়াতো। টুকিটাকি ব্যবসা করেছে। মেলায় মেলায় ফিরেছে। জমিদার মহাজনের বাড়ী এসে দীনভাবে আবেদন করেছে, মহাজনের নালিশের ক্ষেত্রে তার পক্ষে সহানুভূতি ও সহযোগিতার জন্য। এরই মধ্যে ফার্স্ট ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ করেছিল। বাড়ীতে আইন পড়েছিল ওই মহাজনের সঙ্গে মামলার জন্য। তারপর পেয়েছিল চন্দনপুরের লক্ষপতিদের বাড়ী। নায়েব হয়েছিল।

তারপর সুরু করেছিল ব্যবসায়। সে ব্যবসায়ে তার সমৃদ্ধি হয়েছে ধূলো থেকে সোনার মত। কিন্তু সে কোন যাদুমন্ত্রে নয়, এ বিশ্বাস করে লোকে যে ধূলো সোনা হয়েছে দে মশায়ের বুদ্ধির এবং হিসাবের অতিসূক্ষ্ম ভাগমাপের রাসায়নিক ক্রিয়ায়। গ্রামের জমিদার পিছনে লেগেছে ইউনিয়ন বোর্ড লেগেছে—ব্যবসায়ীরা পিছনে লেগেছে—পুলিস লেগেছে—কিন্তু এই অনুত্তেজিত স্নায়ু শান্ত মানুষটি তার হিসেবের মাপ করা অকম্পিত পদক্ষেপে বলতে গেলে সোজা চড়াই ভেঙে উঠে এসেছে বিষয়সম্পত্তি ও সম্পদের পাহাড়ের মাথায়। মাটিতে পা কাঁপে নি—উপরে আকাশের দুর্যোগে মাথা টলে নি। লম্বা মানুষ, মোটা হাড়ে শক্ত কাঠামো, মেদবর্জিত শরীর; কথা বলতে গেলে কখনও মুখের উপর কথার ভাবের ছাপ পড়ে না। ঠাণ্ডা হিমের মত লোকটি। যেখানে ঢুকব মনে করে সেখানে ঢুকে যায়—কখনও সোজা পথে—কখনও বাঁকা পথে এবং সে পথে ছুঁত-পবিতের বিচার সে করে না। যে যতই দরবার করুক—ফৌজদারি বা দেওয়ানি যে কোন আদালতে, দে তার দিকের ন্যায় এবং আইনসম্মততা প্রমাণ করে বেরিয়ে আসে মাথা উঁচু করে, কিন্তু মুখে কোন উল্লাসের

চিহ্ন কেউ দেখতে পায় না।

জীবনে দে হল দাবা খেলোয়াড়; পাশা খেলোয়াড় নয়—যারা আড়ি মারতে কচে-বারো হাঁক হেঁকে কচে-বারো দান ফেলে—ছাদ ফাটানো চীৎকার করে ওঠে, পাড়া চমকে দেয়। দে—প্রতিপক্ষের মন্ত্রী মারবার সময় নিঃশব্দে সেটিকে তুলে নিয়ে নিজের বলটি বসিয়ে দেয়। শেষ কিস্তি দিয়ে মৃতুস্বরে 'মাৎ' শব্দটি উচ্চারণ করে—ফের বল্ সাজাতে বসে নতুন দানের।

সকালে উঠে মিলে যায় দে, দুপুরে ফিরে এসে খায়, ঘন্টা দুয়েক বিশ্রাম করে, আবার চারটেতে মিলে গিয়ে বসে—ফিরে আসে রাত্রি দশটায়। খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ে।

দে গ্রামের ভিতরের বাড়ি ভাই-ভাইপোকে দিয়ে—গ্রামে পূর্ব দিকে ব্রাত্যদের পাড়া ঘেঁষে বাড়ী করেছে। এখান থেকে আরও খানিকটা পূর্বে তার মিল। তার মিলের কাছেই সরকারী পাকারাস্তার ওপাশে—চণ্ডীতলা।

কেউ কেউ বলে—চন্দনপুরের একটা নতুন কাল এসেছিল—পঞ্চাশ বছর কি ষাট বছর আগে স্বর্গীয় মাধববাবুর আবির্ভাবে; তিনি গ্রামের পশ্চিম দিকের পোড়ো প্রাস্তর কিনেছিলেন বা তাঁকে কেউ গছিয়েছিল—তাঁর জমির ক্ষুধা দেখে; সে যাই হোক, পশ্চিম দিকটার কৃষ্ণসায়র থেকে মাইলখানেক পাকাসড়কের দুই পাশে ইস্কুল হাসপাতাল রেজেষ্ট্রি আপিসকে কেন্দ্র করে বেড়েই গেছে। এখনও সরকারী বাড়ীর ঘরদোরের বাড়ার ঝোঁক পশ্চিম দিকে। এবার নতুনকাল এসেছে নিজে; কারও পিছন পিছন আসে নি,—কালের পিছনে পিছনে যারা এসেছে তাদের মধ্যে দে মশায় একজন প্রধান। অন্তত এ কালের লক্ষ্মী যাদের আশ্রয় করেছেন—তাদের মধ্যে দে সর্বপ্রধান। দে পশ্চিম দিক থেকে গ্রামের মুখটা ফিরাতে চেয়েছেন পূর্ব মুখে। এদিকটায় ছিল দরিদ্র এবং ব্রাত্য যারা তারাই, এটা তাদেরই পাড়া। তাই মধ্যে মধ্যে রাত্রি এক প্রহরের পর ঢোল

বাজলে কি নাচ গান হলে—দে মশায় ডেকে বলে, ওহে—বাপুরা, এবার ক্ষান্ত দাও। ফটিক-নসুকে একটু স্নেহের সঙ্গে রসিকতা করেই বলে—ফটিকচন্দ্র হে—নসুবালা-ভাতুজননী। এইবার—একবার—! 'থামো' কথাটা উহ্য রেখে দেয়।

নসুবালাদের পালা এক প্রহরের আগেই সাধারণত শেষ হয়। কোন কোন দিন তারা এমনই মত্ত হয়ে পড়ে যে খেয়াল থাকে না—কখন মেঘের ডাকের মত গুর্ গুর্ গুর্ গুর্ শব্দের একটানা ডাক ডেকে এক প্রহর রাতের উড়োজাহাজ মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। আকাশের দিকে চাইলে দেখা যায় চলন্ত নক্ষত্র যেন দলে যাচ্ছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। রোজ নিত্য নিয়মিতই যায়। উত্তরবঙ্গের প্লেন সার্ভিসের পথ চন্নপুরে মাথার উপর দিয়ে চলে গেছে। প্লেন যায় কলকাতা দমদম। প্লেনখানিও পার হয়, ওদিকে আশেপাশে শিয়ালেরাও ডাক শুরু করে। ওদিকে ইস্টিশানে গাড়ি ছাড়ে—পুঁ শব্দে সিটি দিয়ে। কিন্তু এ ট্রেন প্রায় লেট থাকে। তাই প্লেন সার্ভিস হওয়ার পর থেকে ট্রেনের সিটির দিকে মানুষের কান বা মন থাকে না। মন থাকে প্লেনের শব্দের দিকে।

নসু উঠল। আর নয়! প্রহর রাত কখন পার হয়ে গিয়েছে। দে ঘরে এসেছে, খেয়েছে এবার শোবে। 'ল্যেট' হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ দেরী।

তার আর দোষ কোথায়? চন্নপুরে দশখানা গাঁয়ের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ঢেউ এসে মরে। প্রতিদিনই কিছু না কিছু ঘটে থাকে,—মারামারি, কথা কাটাকাটি, গান-বাজনা, রঙ্গরস, কোনদিন মিছিল—কোনদিন মিটিং—হয়েই থাকে! সাতচল্লিশের পর থেকে এসব—ঘরোয়া ব্যাপার। বিয়ের দিন থাকলে বিয়েও হয়। কিন্তু আজকের কাণ্ড সচরাচর ঘটে না। বিয়ের কনে পালিয়ে এসে থানায় হাজির! বিয়ে করবে না, নেকাপড়া করবে, বি-এ এম-এ পাশ দেবে।

আর গোপাল চৌধুরী ছোট জাতের হাতে চটি খেয়ে নিজ হাতে চেলাকাঠ মাথায় মেরে এমন করে ফাটালে—যে তার রক্ত বন্ধ হয়

না। ওদিকে রমেন্দ্র আচার্যি বুড়ো বয়সে—ক্ষমাকে বিয়ে করতে আসছে ব্যাণ্ড বাজিয়ে।

দোষ কি নসুবালার—দোষ কি ফটিক দাসের।

—চললাম বেয়াই চললাম। মা ভাতুমণি রাসমোহনের সঙ্গে ঝগড়া করো না। ঘর খুলে পালিয়ে গিয়ে ইস্কুলে উঠো না।

নসুবালা এসে উঠল—নিজের বাড়ী। ঘরের উঠানে এসে দাঁড়াল। কে কাতরাচ্ছে—কাঁদছে!

—কে বটে? কে? সাবি—না—কে লো? সাবি?

আওয়াজ এল—আমি লই, দাদা।

তবে কে,—গৌরো?

—হ্যাঁ—বাতটো বেড়েছে।

—হে ভগবান! নসুবালা ঘরে গিয়ে শুল।

ওঃ! কি প্রহার! সাবিত্রী শঙ্করী তরলা ফুরি—উরি - ওই এক বংশ! এ অঞ্চলে বাবুভাইয়ের আমলে খেল্ খেলেছে। ওঃ! রাত দুপুরে তখন এ কান্না কাতরানি শোনা যেত না—শোনা যেত হাসি-খিল্—খিল্—খিল্—খিল্! সঙ্গে সঙ্গে—ছোটার শব্দ আর কাচের চুড়ির রিনিঠিনি রিনিঠিনি শব্দ!—আরও রাত্রে ভারী পায়ের শব্দ শোনা যেত। আসত শশী—অভিলাষ গৌর শাব্‌লা—গোপ্‌লারা। ফিরত চুরি করে। ধান চুরি করে সামালদারের ঘরে মাল ফেলে টাকা নিয়ে ফিরত। ভয় লাগত নসুর তখন বাইরে উঠতে। তখন তারা বাঘ ছিল। আঃ, গোটা বংশটাকে কে যেন মাথায় বাড়ি মেরে একেবারে শুইয়ে দিয়েছে।

শশী অভিলাষেরা মরেছে। গৌরো গোপলা আছে কিন্তু রোগে পঙ্গু হয়ে আছে। আর এই মেয়েগুলো যারা সেকালে দেহ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে সব কুৎসিৎ রোগে পাড়ু হয়ে এখন ভিক্ষে করে বেড়ায়। তরলার কুষ্ঠ হয়েছে। এখন ওরা রাত্রে কাঁদে, কাতরায়।

চোর, খারাপ মেয়ে আজ আর নেই তা নয়। তবে এরা শুয়ে

পড়েছে। ভিক্ষে করে খায়। বর্ষার সময়—মাস দু-তিন সরকার থেকে গম পায়। সে গম সস্তা দরে দোকানীরাই কেনে।

দে-ও শুনতে পেয়েছিল এ কাতরানি। সে জানালাটা বন্ধ করে দিল। তার মত শান্ত শক্ত মানুষের মনও আজ চঞ্চল হয়েছে! সে মিলের গদী থেকে বেরিয়ে আজ সরাসরি বাড়ী আসে নি। সে দেখতে গিয়েছিল গোপাল চৌধুরীকে। চৌধুরীর সঙ্গে সে এক বছর পড়েছিল ছেলেবেলায়। গোপাল চৌধুরী জমিদারের ছেলে ফেল করাই ছিল তার জমিদারির গৌরবে। ফেল করেই দে'র সঙ্গী হয়েছিল, আবার ফেল করে দে'র পিছনে পড়েছিল কিন্তু বয়সে এক বলে যৌবনের প্রারম্ভ পর্যন্ত বন্ধুত্ব অটুট ছিল? তারপর যৌবনে গোপাল হয়েছিল জমিদারবাবু আর দে, সে-কালে সকল-জনের কাছে কূটবুদ্ধি জটিল-চরিত্র অপরাধী। ইদানীং আবার একটা সম্বন্ধ হয়েছিল। গোপাল ধান বিক্রী করে, দে কেনে। দরকার মত অগ্রিমও নিয়ে যায় বিশ পঞ্চাশ, একশো। সবই অবশ্য চিরকুটে লিখে—লোক মারফৎ চলে, সাক্ষাৎ দেখাশুনো হয় না। গোপাল তার গণ্ডী ছেড়ে বাইরে পা দেয় না। দে'রও সময় নেই। কিন্তু আজ সকালেই সংবাদটা পেয়ে অবধি ইচ্ছে হয়েছিল গোপালকে একবার দেখে আসে। ন্যাড়া বাউড়ীকে শাসন—সামান্য কথা। সে জন্য নয়, গোপালকে দেখবার জন্যই যেতে ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু সে ইচ্ছে সম্বরণ করেছিল কারণ গোপালের দুঃখ বাড়বে—লজ্জা পাবে। সন্ধ্যার পর যোগপুরের ধ্রুব ডাক্তার যখন নবীনপুর যাচ্ছিল—তখন পথের ধারে মিলে বসেছিল শিবনাথ দে। ধ্রুবকে দেখলে চকিত হয় সকলেই। কারণ বড় ডাক্তার। রোগ কঠিন না হলে আসে না। দে-ও চকিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল—আরে ডাক্তার! তুমি কোথায় ভাই? ধ্রুবের কাছে গোপালের অবস্থার কথা শুনে—সে আর ইচ্ছা সম্বরণ করতে পারে নি—গিয়েছিল তাকে দেখতে। দেখে কষ্ট পেয়েছিল। ওঃ গোপালের কি অবস্থা!

সেই মনেই আজ গৌরোর কাতরানি—দে'কে একটু চঞ্চল করলে। সে জানালাটা বন্ধ করে দিলে। অন্য দিন—কারুর কাতরানি এমন বিচলিত করে না দে-কে।

॥ ৯ ॥

দিন পাঁচেক পর গোপাল চৌধুরীও ঠিক এমনই চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে শূন্য দৃষ্টিতে খোলা জানালার মধ্য দিয়ে তাকিয়েছিল। এবং মধ্যে মধ্যে বিড়বিড় করে আপন মনে বকছিল।

ধ্রুব ডাক্তারের কথা সত্য হয়েছে। চৌধুরী বেঁচে গেছে এ যাত্রা, কিন্তু মাথার মধ্যে একটা গোলমাল হয়ে গেছে। বাইরের জগতে তাকিয়ে থেকেও সব দেখেও তার সঙ্গে তার মনের যোগ ঘটে না। অসংলগ্ন কথাও বলে যায়।

পাগল নয়। মাথায় আঘাতের জন্য এমনি ঘটে গেছে। নিজের মনের মধ্যেই হয়েছে এখন তার জীবনের বসতি। তার বাইরে আর কিছুই নেই।

তবে পক্ষাঘাত হয় নি এইটেই পরম ভাগ্য।

সেদিন রাত্রে দে যখন দেখতে এসেছিল— তখন চৌধুরী ওকে চিনেছিল কিন্তু ডেকেছিল ভুল নামে। ভুলটা তখন থেকেই শুরু। চৌধুরী ব্যস্ত হয়ে বলে উঠেছিল—ঠাকুর মশাই? ওরে আসন দে আসন দে!

ছেলে শুভেন্দু বলেছিল—কাকে কি বলছেন! উনি দে মশায়! আমাদের গ্রামের শিবনাথ দে, আপনার বন্ধু।

শুভেন্দুর কাঁধে হাত রেখে মৃদু একটু চাপ দিয়ে তাকে চুপ করতে বলেছিল দে মশায়। শুভেন্দু তার মুখের দিকে তাকালে অত্যন্ত মৃদুস্বরে বলেছিল—থাক।

একখানা হাতল-ভাঙা চেয়ারে বসেছিল দে মশায়।

কেঁদে ফেলেছিল গোপাল চৌধুরী। —দেখুন, দেখুন আমার দশা দেখুন! আমাকে—।

—হা—হা করে কেঁদে উঠেছিল চৌধুরী। এ দৃশ্য সহ্য করা দে মশায়ের মত মানুষের পক্ষেও কঠিন হয়েছিল।

প্রতিকার করুন। এর—। আবার কান্না।

শান্ত কণ্ঠে দে বলেছিল—হবে। তবে আপনি তো বড় বংশের সন্তান, পিঁপড়ের কামড়েও হাতীর শরীরে বিষ হয় জ্বালা করে—আপনি তো হাতী বড় বংশের সন্তান, ওটা তো পিঁপড়ের কামড়েও বিষ হয়, জ্বালা করে, তবে সেটা কি ধর্তব্য! চোরে খুন করে—ডাকাতে প্রহার করে—সে কি অপমান? ওকে আপনি বাউড়ী ধরছেন কেন? ও চোর। ধরা পড়ে পাগল হয়ে কাজটা করেছে। ডাকাত চোর—এদের কি জাত বিচার করে কেউ বলুন!

একথা শুনে চৌধুরী শূন্য দৃষ্টিতে পলেস্তারা-খসা ছাদের দিকে তাকিয়ে ছিল। অর্থাৎ কথাটার অর্থ সে বুঝেছিল।

এরপর শিবনাথ দে উঠে চলে এসেছিল। বলে এসেছিল—কাউকে এখন কাছে আসতে দিয়ো না। আমার আসাটাও ঠিক হয় নি।

তারপর চৌধুরীর ছেলে শুভেন্দুকে বলেছিল—যদি টাকাকড়ির দরকার থাকে তবে যেয়ো আমার কাছে। ধান দিয়ো পরে।

দে চলে গেলে গোপাল চৌধুরী হঠাৎ চীৎকার করে—উঠেছিল—সাপের মাথায় ভেক নৃত্য করে! ভেকের রাজত্ব! ভেকরাজ এসেছিল—ভেক রাজ! ঠাকুর মশাই! পটোঝাড়া বামুন—ভেকরাজ!

তিনদিনে অপেক্ষাকৃত সুস্থ হয়েছে চৌধুরী, বিপদ কেটে গেছে; কিন্তু এই গোলমাল সুরু হয়েছে। বাইরের জগৎ আর চিত্তলোকের গভীরের জগতের সঙ্গে যে একটি সেতু থাকে স্মৃতি শিক্ষা ও সচেতনতার পিলারের উপর—সেই সেতুটি ভেঙে না গেলেও একেবারে বেঁকে হেলে পড়েছে। বাইরের সঙ্গে ভিতরের যোগাযোগ সব ছিন্ন হয়ে গেছে।

চৌধুরীদের বাড়ী গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তের শেষ বাড়ী। তিন পুরুষ আগে তৈরী দোতালা চকমিলানো পাকা বাড়ী। শরিকে শরিকে ভাগ হয়েছে; পুরনোও হয়েছে। একটা দুটো ফাটলও দেখা দিয়েছে। একটা অংশে—তার শরিকদের অংশটা নতুন পলেস্তারায় মেরামতে অপেক্ষাকৃত শ্রীসম্পন্ন। তারই পাশে গোপাল চৌধুরীর অংশটায় পলেস্তারাই নেই; শুধু ফাটলগুলো সেরে সিমেন্ট বালির দাগরাজি-গুলো বিসর্পিলভঙ্গিতে প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় বিচিত্রগঠন সরীসৃপের ফসিলের মত দেওয়ালের গায়ে জেগে রয়েছে।

এ তিনদিনে চৌধুরীর মনের সেতুটাও অনেকটা ওষুধ-বিষুধ ও বিশ্রামের বালিসিমেণ্টে মেরামত হয়ে এসেছে। তবে ডাক্তারেরা বলে —ধ্রুব ডাক্তার প্রথম দিনেই বলে গেছে যে, ও আর ঠিক সোজা হবে না—বেঁকে থাকবেই।

সকাল বেলা সেদিন চৌধুরী বালিশের উপর তাকিয়া রেখে হেলান দিয়ে বসে জানালা পথে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিল। পুরনো কালের বাড়ী, জানালাগুলি ছোট, তিন ফুট দু ফুট বোধহয়। যে ঘরখানিতে চৌধুরী শোয় সেখানা উত্তর দক্ষিণে লম্বা। দক্ষিণ দিকে একটি জানালা—পূর্বদিকে দুটি। উত্তরে অন্য ঘরে ঢোকবার দরজা, পশ্চিমেও দরজা এবং একটি দেওয়াল আলমারী। পুরনো আমলের খাট, কতকাল আগের বার্নিশ এবং ধূলো ময়লায় কালো হয়ে গেছে, ছত্রিগুলো ভাঙা। দক্ষিণদিকে একেবারে অবারিত মাঠ, এক মাইল দূরে চাষী সদ্‌গোপের গ্রাম—গোপতলী দেখা যাচ্ছে। মাঝখানে পুরনো সড়ক—যেটা সিউড়ী থেকে চলে গেছে কাটোয়া—সেইটে। আগে ছিল লাল কাঁকরের, এখন সেটা পিচের হয়েছে। কালো ফিতের মত মনে হচ্ছে। তারও দক্ষিণে গ্রামের গাছপালার উপরে ও ফাঁকে ফাঁকে সকালের রোদ পড়ে টিনের চাল ঝকমক করছে। কত টিনের চাল? ওই—ওই—ওই! অথচ—! অথচ আগেকার কালে গোপতলীতে টিনের ঘর একখানাও ছিল না। আজ চৌধুরীর বয়স

পঞ্চান্ন ছাপান্ন, তার যখন বারো বছর বয়স, রাত্রিকালে গোপতলীতে একদিন আগুন লেগেছিল। —ছাদে উঠে সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য সভয়ে দেখেছিল। রাঙা হয়ে উঠেছিল দক্ষিণের আকাশ আগুনের ছটায়, আঁকা-বাঁকা শিখা মধ্যে মধ্যে লকলকিয়ে বনের ঘেরেরও মাথা ছাড়িয়ে যেন আকাশ ছুঁতে চাচ্ছিল। তার উপর উঠেছিল সাদা ধোঁয়ার কুণ্ডলী—উপরটা কালো। গোলমাল উঠছিল—ও—ও—ও—!

পরের দিন শুনেছিল—গোপতলীর পূবপাড়াটা গোটা পুড়ে গেছে সেই সময় দুই পাল চালে টিন দিয়েছিল। তাছাড়া আর গোপতলীতে টিন ছিল না। আজ নাকি সব টিন—সব টিন। শুধু টিন নয়, বাড়ীর সামনেটায় বারান্দাগুলো সব পাকা করে গাঁথা এবং ঘরের মেঝে সিমেণ্টের। ওঃ!

সকলের এখন বসবার ঘর হয়েছে। সে ঘরে তক্তাপোশের সঙ্গে চেয়ার সাজানো আছে।

ওঃ, আগের কালে গোপতলীর পালপাড়ার দুটি ছেলে পড়ত চৌধুরীদের সঙ্গে। ওদের খাটো আঁটশাট জামার পকেটে গুড়ের পাটালি নিয়ে আসত। একটা বিশ্রী গন্ধ উঠত। তার জন্যে ওদের পাশে বসতে চাইত না সে এবং এ-গ্রামের ছেলেরা! এখন ওদের ছেলেদের দেখে বিস্ময় লাগে।

পাল বংশের রূপ আছে। লালুমোড়ল—টুকটুকে পাকা আমের মত তার গায়ের চামড়া। লালু মোড়লের চার ছেলে—ভূপেশ দেবেশ-গোপেশ-সুরেশ। চারজনেই সুপুরুষ এবং চারজনেরই টকটকে গৌরবর্ণ রঙ ছিল। চারজনেই লেখাপড়া শিখেছিল। গোপেশ এম-এ পাশ করে উকীল হয়েছিল। তাতে কিছু হয় নি—শেষে মাস্টার হয়েছিল। লোকে বলত—পাশ করলে কি হবে? বামুন বদ্যি কায়েত না হলে ওকালতি সমুদ্রে হালে কি পানি পায়? তাদের ছেলেরা এখন এদিকে আসে যায়। গোপাল চৌধুরী দেখে—সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। রাজপুত্রের মত চেহারা—তেমনি পোশাক-পরিচ্ছদ, তেমনি

মার্জনা—! এরা সব চাকরী করে!

ওঃ—।

গোঁ—ওঁ—ওঁ—শব্দে চমকে উঠল চৌধুরী। কি বিশ্রী শব্দ! আঃ—এমন রাগ হচ্ছে! নাকে যেন বিশ্রী গন্ধ পাচ্ছে চৌধুরী এখান থেকে।—হ্যাঁ! ঠিক একখানা না—একখানা নয়—ছুখানা। দক্ষিণ দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখতে পেল—ছুটো বুনো জানোয়ারের মত ছুটো, কি নাম, কি নাম যেন? হ্যাঁ হ্যাঁ জীপ—জীপ!—জীপ—জীপ যাচ্ছে। ছুটো চারটে-ছটা এতো আসছেই আসছেই। জরীপ। কি নাম—? ব্লক--। হেন তেন---! ইরিগেশন, হায় হায় হায়—থিয়েটারের পর্যন্ত এস-ডি-ও হয়েছে। এরা সব আসছেই এরা সব আসছেই। অথচ লোকের জমিদারী নিয়েছে। টাকা নেয় নি। কবে দেবে ঠিক নেই। দশ বিশবার হেঁটে—হাত তোলা একশো টাকা কি ছুশো টাকা। খাও—তাই ভাঙিয়ে খাও বছর ধরে।

বিড়বিড় করে বকে উঠল চৌধুরী—কালেক্টারী—? কে দেবে আমার কালেক্টারী। অস্থাবর ক'রে আদায় করব!

অর্থাৎ তার জমিদারীর কম্পেনসেসনের কথা বলছে। ভুল করে বলছে কালেক্টারী অর্থাৎ গভর্নমেন্ট রেভেন্যু!

- বাবু মা-শা-য়!

গেঙিয়ে কে চেঁচাচ্ছে। ওঃ, সেই---সেই এসেছে! কি নাম?—চৈতন্য! না—! বলাই! না। কি নাম? ছেলেবেলা তাদের বাড়ীতে কি করত—? কি করত? রান্না করত! গরু নিয়ে চরাতে গিয়ে একটা বাছুর বিক্রী করে দিয়েছিল মুসলমান পাইকারকে! মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিল ছোট কাকা! তারপর লোকটা চোর হয়েছিল। চুরি করে জেল খেটেছে। ওর ছুটো বোন হ্যাঁ - হ্যাঁ—একটাকে—তাদের বাড়ীর চাপরাসী কানু শ্বশুরবাড়ী থেকে কেড়ে নিয়ে এসেছিল। মেয়েটা—মেয়েটা বজ্জাত। কিন্তু এ বেটা? কি নাম বেটার?

—এই! কি নাম তোর? এই!

—আংএ—আঙি—শ্যাই ! অর্থাৎ আজ্ঞে আমি মশাই !'

—আঙি শ্যাই—। ভেঙালে চৌধুরী!

চৌধুরীর স্ত্রী ঘরের কোণে বসে তরকারি কুটছিল এবং স্বামীর প্রতিও দৃষ্টি রাখছিল। সে শান্ত মানুষ এবং শক্ত মানুষও বটে। স্বামীর বিড়বিড় করে বকায় চঞ্চল সে হয় নি, কানও তাতে দেয় নি। এখন এমন ভাবে চীৎকার করতে দেখে সে বঁটীটা কাত্ করে রেখে উঠে এল এবং নীরবে জানলাটা বন্ধ করে দিল। কিন্তু খপ করে হাত চেপে ধরলে চৌধুরী।

স্ত্রী বললে—ছাড় !

চীৎকার করলে চৌধুরী—আমি কি মরেছি ?

—কেন ? মরার কি হল ?

—জানালা 'খুলে' দিচ্ছ ?

—খুলি নি, বন্ধ করে দিলাম, চেঁচাচ্ছ বলে !

—না। বলে নিজেই হাত বাড়ালে খুলে দেবার জন্য।

এবার জানালা খুলে দিলে চৌধুরীগিন্নী। চৌধুরী আবার চীৎকার করে প্রশ্ন করলে—তো—র না—ম কি—? এ—ই !

—ওর নাম গৌরো !

—হ্যাঁ-হ্যাঁ। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল চৈতন ! এ-ই তো-র সে-ই বোনটা মরেছে না আছে ?

—আজ্ঞে আছে, এই তো পাঁচদিন আগে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আপনকার বাড়ী এসেছিল। মহাব্যাধি হয়েছে !

—কি নাম ছিল আমাদের সেই—সেই—

—কালু শেখ চাপরাসী।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। আমরাই রেখেছিলাম তাকে। ওই কাণ্ডের পরও তাকে রেখেছিলাম। এর পর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে চৌধুরী বললে—তাকে চাল দিয়েছিলে ?

—দিয়েছিলাম। গৌরোকেও দেব। দিয়েই তো যাই।

গৌরো তোমাদের গরু চুরি করেছিল - তার জন্যে চাল আজও দিই। আর সে হারামজাদী সর্বনাশ করেছিল—কালু শেখ—তারপর সে লক্ষ পাপ করেছে—নিজের খেয়াল-খুশিতে করেছে—তার জন্যেও দিই। দিয়ে দিয়ে কুলুচ্ছে না। জমিদারীর আয় গিয়েছে, চাল বেচে সব—নুন তেল থেকে মেয়ের ইস্কুলের মাইনে—ছেলের লম্বা পাঞ্জাবীর টাকা। হবে আর কত বল?

—হবে আর কত? হ্যাঁ। হ্যাঁ। ঠিক বলেছ, হবে আর কত? ঠাকুর? খায়? ভোগ? ভোগ? ভোগ হয়?

—কি বকছ আবোলতাবোল? ভোগ হবে না কেন?

—হবে না। বন্ধ করে দাও!

—বন্ধ করে দেব? এ মতি না হলে এমন হবে কেন?

কচু! কচু! কচু! বাজে! মিথ্যে। ঠাকুর! দেবতা! সব সব বাজে বাজে।

শোও। চোখ বন্ধ কর। এমন করে পাগলামি করো না! হ্যাঁ গো —তুমি এমন করলে আমি কি করব বলতে পার? নাও, শোও দেখি।

চৌধুরী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। এবং স্ত্রীর এ অনুরোধ উপেক্ষা না করে, বালিশে হেলান দিয়ে শুয়েই পড়ল। স্ত্রী জানালায় মুখ বাড়িয়ে গৌরোকে বললে—এমন করে চেঁচাস না বাবা, যাচ্ছি, দিচ্ছি। বাবুর অসুখ! তারপর জানালাটা বন্ধ করে দিতে উদ্যত হল।

—না। না। না। চীৎকার করে উঠল চৌধুরী।

—বন্ধ করে দি। একটু ঘুমোও।

—আমি তো বাঁচব না। মরব। মরব। দেখব না? খুলে দাও।

জানলা খুলে দিয়ে চৌধুরীগিন্নী চলে গেল। দরদালানে বেরিয়ে মেয়েকে ডাকলে—নেলি! তোর বাবার কাছে কেউ নেই। তুই গিয়ে বোস্।

নলিনী—চৌধুরীর মেয়ে, ক্লাস নাইনে পড়ে, বিয়ে দেওয়া

সম্ভবপর হয় নি বলেই পড়ে। শান্ত মেয়ে। লেখাপড়ায় ভাল নয়। কিন্তু এই বাড়ীর মান-মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন। বই হাতে সে বাপের কাছে এসে বস্‌ল, আড় চোখে বাপের দিকে চাইলে। ভয় করে তার বাবাকে। আগে থেকেই ভয় করে, এখন তো অসুস্থ। বাবা চীৎকার করছে দিন রাত। আগে মানুষটা কত শান্ত নিরীহ ছিল। রাগ তাকে করতে সে কখনও দেখে নি। তার যত রাগ ছিল—তার জ্ঞাতি-ভাইদের উপর। তাকে দেখে শুধু ঘাড় নাড়ত—আক্ষেপের সঙ্গে ব্যঙ্গে মেশানো ছিল তার প্রকাশ। তার মানে নেলি বুঝত। নেলি ইস্কুল যেত বই নিয়ে বেণী ঝুলিয়ে—তার জন্যই আক্ষেপ ব্যঙ্গ তার প্রতি—তার দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়ত বাবা। এতে নেলির নিজের ওপর। বড় দুঃখ এবং ঘৃণা হত, শেষ পর্যন্ত। অর্থটা এসে দাঁড়াত এই যে কিছুতেই তার বিয়ে হচ্ছে না!

হঠাৎ এই সময়ে আবার উত্তেজিত ভাবে গোপাল চৌধুরী ডাকলে—সুরো, সুরো! ও-সু-রো-!

অগত্যা উঠে কাছে গেল নেলি বললে --কি বাবা?

—তুই?

—হ্যাঁ। মা নীচে গেছে ভিক্ষে দিতে। কি বলছ বাবা? কি হল?

—ওই—ওই—সেই—সেই—সেই যাচ্ছে না?

—কে?

—ওই যে! নেলি—নেলি।

—এই তো আমি নেলি!

—না—না। ওই যে!

নেলি জানালা দিয়ে দেখলে—একটি আধুনিকা মেয়ে কাঁধে ঝোলা এবং হাতে একটা স্যুটকেস ঝুলিয়ে চলে যাচ্ছে।

—ওই! সেই না? শুভেন্দুর সঙ্গে গায়েহলুদ হয়েছিল! পালিয়েছে!

—না! ও তো সে নয়।

—কি নাম তার?

—সীমা।

—হ্যাঁ। তা হলে লুকিয়ে বিয়ে হয়ে গেছে নাকি? তোর দাদার সঙ্গে?

—কি যা-তা বলছ?

—লোকে বলছে। তোরা বলছিস। তোর মা তোকেই শুধুচ্ছিল। আমি চোখ বুজে শুয়েছিলাম। তোরা ভেবেছিলি আমি মরে গিয়েছি!

নেলির মনে পড়ল। কাল বিকেলে—সে ইস্কুল থেকে এলে মা তাকে ডেকে এই নিয়ে কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। কাল সে যখন ইস্কুলে যাচ্ছিল—শুভেন্দু তাকে তাদের ওই বাড়ীর ফটকটার কাছে আড়ালে ডেকে বলেছিল—চিঠিখানা সীমাকে দিস তো! বুঝলি?

সে শঙ্কিত এবং বিস্মিত দৃষ্টিতে দাদার দিকে তাকিয়েছিল।

শুভেন্দু বলেছিল, কিছু নেই চিঠিতে। কোনও অন্যায় কথাও লিখি নি।

—তুমি ভালবাস তাকে, না কি?

—ভালবাসার কথা নয়। পাঁচ লোকে পাঁচ কথা রটাচ্ছে। আমাকেই জড়াচ্ছে। কিন্তু আমি তো কিছু জানি না। তাই তার মনের কথাটা আমি জানতে চেয়েছি। দেখ না তুই, পড়ে দেখ!

মা সেটা কেমন করে উপর থেকে দেখে ফেলেছিল। তাই ইস্কুল থেকে ফেরা মাত্রই তাকে ডেকেছিল—শোন।

বাবা তখন মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে নিথর হয়ে ঘুমুচ্ছিল। তারা অন্তত তাই ভেবেছিল। ডাক্তার ঘুমের ওষুধ দিচ্ছেন—দিনের বেলা খাবার পর একটা ঘুমের পিলও খেয়েছিল বাবা ঘুমুবার কথাই ছিল সাড়ে পাঁচটা ছটা পর্যন্ত। সেই বিশ্বাসে বাবার বিছানার পাশেই মা জিজ্ঞাস করেছিল—ওই চিঠির কথা। কঠোর কণ্ঠে বলেছিল—মিথ্যে বলবি না। তোর হাতে চিঠি দিয়েছে শুভো আমি নিজে দেখেছি। বল, কাকে দিয়েছে চিঠি?

— তাকেই বটে।

—সীমাকে ?

—হ্যাঁ।

—কি লিখেছে তাতে জানিস ?

—হ্যাঁ। জানি। আমি না পড়ে দিতে চাই নি আমাকে সেইজন্য পড়তে বলেছিল। আমি পড়েছি।

—কি ?

—লিখেছিল—। থেমে ঢোক গিলে নিল নেলি। তারপর বললে—খারাপ কথা কিছু লেখে নি।

—সেটা কি ? খারাপ নয় তো মুখে আটকাচ্ছে কেন ?

—লিখেছিল—। লোকে বলছে—অনেক কথা। তুমিও শুনেছ—আমিও শুনেছি! এর মধ্যে কি কোন সত্য কিছু আছে ? যদি থাকে তবে তুমি যখন দেবযানীর মত —কচকে ভালবাসার কথা ভুলে বৃদ্ধ যযাতি রাজাকে বিয়ে করে সাম্রাজ্ঞী হতে চাও নি – তখন আমিও কচের মত দেবতার দাস বা আমার বংশমর্যাদার দাস হব না এটা নিশ্চয় জেনো।

মা বলেছিল—মেয়েতে ছেলেতে থিয়েটার! যা ঘেন্না করি তাই। আমি তখুনি জানতাম। ইংরেজ রাজত্বকে লোকে বলত ম্লেচ্ছের রাজত্ব; কিন্তু তখন কটা এমন কাণ্ড ঘটেছে ? আজ স্বাধীন হয়ে দেশের পাখা বেরিয়েছে। এ যে ম্লেচ্ছের অধম। ছি—ছি—ছি!

অন্য সময় হলে নেলি প্রতিবাদ করত। রুগ্ণ বাবার পাশে দাঁড়িয়ে বাদপ্রতিবাদ করতে সাহস পায় নি।

সেকাল। সেকাল। সেকাল। সেকালের গল্প সে কিছু কিছু শুনেছে। যা চলে আসছে গোপন ধারায়। এখানকার ঝর্ণার মত। এখানে ঝর্ণা ঝরঝর করে ঝরে না। এখানে ঝর্ণা নিঃশব্দে বের হয় বড় বড় টিলার প্রান্তে সবুজ একটি কর্দমাক্ত স্থানের মাঝখানে—একটি

বা কয়েকটি টলটলে জলভরা গর্তের আকারে। জল বের হয় কুয়োর তলায় জল যেমন বের হয় তেমনি ভাবে। ছোট ছোট গর্তগুলি ছাপিয়ে ক্ষীণ কিন্তু অহরহ প্রবহমাণ ধারাটি বেয়ে চলে নদীর দিকে বা কোন বড় নালার দিকে। এর জল ব্যবহার কেউ করে না, কিন্তু কৌতূহলবশে এর ধারে সবাই যায়—সকলে এর জল আস্বাদন করে দেখে। শ্যাওলার একটি স্বাদ আছে। গন্ধও আছে। এই গল্পগুলিও তাই তেমনি ধারায় বেয়ে চলে—এর আস্বাদন এখানকার পুরনো বাসিন্দাদের, নতুন মানুষেরা একটু বড় হলেই জানতে পারে! গল্পগুলি এখানকার কুলীন কন্যা—যাঁরা চিরদিন পিতৃগৃহে কাটিয়েছে তাদের চরিত্র নিয়ে। অপবাদের কথা। তাদেব গোপন প্রেমের গোপন কথা। কোন কোন ক্ষেত্রে এ নিয়ে ঝড় বয়েছে। বিবাহিত শ্বশুর ঘরবাসিনী কন্যারাও বাদ যায় নি। এ ঝড় গ্রাম থেকে চিঠির মারফৎ সেখানে গিয়ে সে কন্যার আশ্রয়ের মাথার চাল উড়িয়ে নিয়েছে। কন্যা গ্রামে ফিরে এসে মুখ লুকিয়েছে তার পিতৃগৃহে। কিন্তু শেষ জীবনে সেও হয়েছে সমাজের শাসনকর্ত্রী।

কারণ তখন তার গলায় উঠেছে তুলসীকাঠের মালা এবং কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনে তার চেহারা হয়েছে বাজের আগুনে পোড়া তাল গাছের মত।

এসব কথা নিয়ে সে কতদিন তর্ক করেছে মায়ের সঙ্গে। সে নিজে ওপথের ধার দিয়েও হাঁটে না, ইস্কুলে বান্ধবীরা তাকে সেকেলেই বলে;—সীমা তাকে বলে শুচি ঠাকরুণ। সাক্ষাৎ শুচিতা—বা শুচিবাইগ্রস্তা। বলবার ভঙ্গিমায়, পার্থক্যে অর্থেরও তারতম্য হয়। যখন শুচিবাইগ্রস্তা বোঝাতে চায়—তার চেহারাটা হয় ডিঙ্গী মেরে পা ফেলে চলা শুচিবাইগ্রস্তা বিধবার মতন।

মাকে এ তর্কে হার মানতে হয়েছে তখন! শেষে মা বলেছে—তবে যাও মা—তুমিও যাও—ওই সব করগে যাও।

—আমার কথা তো আমি বলি নি।

—বল নি। কিন্তু বলবে নাই বা কেন? যখন দোষ নেই—ভাল পথ। তখন হাঁটবে নাই বা কেন?

মায়ের কথায় কাল সে চুপ করেই ছিল। সাহস পায় নি। বলতে পারে নি—অন্যায় দোষ ধ'র না মা। দাদা অন্যায় করে নি। সে ন্যায় কাজই করেছে। তবে বলেছিল—তোমায় ভাবতে হবে না। সীমা পত্র পেয়ে পড়ে আমাকেই পড়তে দিয়েছিল। এবং বলেছিল, তোর দাদাকে বলিস ভাই—সে যেন এসব কথা কানে না তোলে। কেন বেচারা দুঃখ পাচ্ছে। সে সব কিছু নয়। আমি পড়ব রে। পাশ করব। চাকরী করব। বিয়ে আমি করব না। তোর দাদাকে ধন্যবাদ দিস। সে যে লিখেছে এ কথা এর জন্যে অনেক ধন্যবাদ দিলাম আমি তাকে। চিঠি লিখে উত্তর আমি দেব না। মুখেই তুই বলিস, এই আমার জবাব। তারপর নেলি বলেছিল —মা, তোমার পায়ে হাত দিয়ে বলছি। একটি কথাও বাড়িয়ে বলি নি ঢাকি নি।

মা বলেছিল—আশ্চর্য মা! কি যে হয়েছে, ফেরতা দিয়ে কাপড় পরে ঝোলা কাঁধে চটি ফটফটিয়ে বেড়ানো আর চাকরী করার শখ—আর ঢঙ!

তারপর ব্যঙ্গ করেই ভেঙিয়ে সীমাকে বলেছিল—'সে সব কিছু নয়। আমি পড়ব রে। পাশ করব। চাকরী করব!' হাঁ তা করবি—হাকিম হবি। এজলাসে বসে বিচার করবি! মরণ, শুভেন্দুর মত পাত্তর—আমাদের মত ঘর তোর সাতজন্মে কখনো হবে?

অবাক হয়ে গিয়েছিল নেলি। এ আবার মা কি বলে? হাসিও পেয়েছিল। বেচারী মা! গায়ে লেগেছে—তাঁর ছেলের মত ছেলের প্রেমে সীমা পড়ে নি— তার জন্যে!

বাবা তন্দ্রার মধ্যে কথাগুলি শুনেছে। কিন্তু তার উত্তর আজ সে কি দেবে?

বাবাকে কি এসব কথা বলা যায়? তার উপর মানুষটি যে

একটি সকরুণ বিয়োগান্ত বেদনায় একান্ত আর্ত বিভ্রান্ত মানুষ হয়ে পড়েছে! তাকে বেশি বকিয়ে কি করবে। সংসার-যুদ্ধে ঘা খেয়ে মেরুদণ্ড ভেঙেও পুরনো কালের সংস্কারের বোঝাকে জীবন সম্বল ভেবে পিঠে বেঁধে কুঁজো হয়ে ঠাকুর দেবতা ভগবানরূপী অনেক-কালের পাকা লাঠিখানির উপর ভর দিয়ে হেঁটে চলেছে—বৈতরণীর ঘাটের দিকে। একমাত্র বিশ্বাস—ঘাটে তরী আছে এবং তার পারানি আছে এই সংস্কারের বোঝার বহনের পারিশ্রমিক। তার সঙ্গে কথা বাড়িয়ে কি হবে।

কথাটা নেলির নয়। নেলি শুনেছে। কথাটা বড় মানুষের।

ভবানীকিঙ্করবাবুর বড় দাদা শ্যামাকিঙ্করবাবুর। একথা তাঁর। তাঁর এখন মস্ত খ্যাতি। মস্ত বড় মানুষ। আজ আর তিনি শুধু এখানকার মানুষ নন গোটা দেশের দাবী তার উপর। গোটা দেশ তাঁকে দাবি করে। মস্ত বড় লেখক। বাবার চেয়ে এক বছরের বড়। শিবনাথ দেব বয়সী। তাঁরই সহপাঠী। গ্রামে তিনি থাকেন না। কখনও কদাচিৎ আসেন। যখন আসেন তখন তাঁর ওখানে লোকেরা যায় দলে দলে। এখানকার লোক, পাঁচখানা গ্রামের লোক ইস্কুলের মেয়েরা দিদিমণিরা ছেলেরা মাস্টাররা। সকলে ছুটে যায়। যায় না কেবল বাবা। অথচ এক সময় নাকি এমন ছিল যে—বাবা আর শ্যামাকিঙ্করবাবু চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দশ ঘণ্টা একসঙ্গে কাটাতেন। ভোরবেলা বেড়ানো থেকে সুরু করে রাত্রি দশটায় তাস খেলার পালা শেষ করে তবে ছাড়াছাড়ি হত।

শ্যামাকিঙ্করবাবু কয়েকবার দেশে এসে নিজে তাদের বাড়ী এসে বাবাকে ডেকে নিয়ে গেছেন। বাবা গিয়েছে কিছুক্ষণ থেকেই সকলের অলক্ষ্যে উঠে চলে এসেছে। সেই নিয়ে একদিন কথা হচ্ছিল শ্যামাকিঙ্করবাবুর ওখানে। তাঁরা বসেছিলেন বাগানের মধ্যে। ঘরের মধ্যে ব্যাটারী সেট রেডিও বাজছিল, সে শুনতে গিয়েছিল শ্যামাকিঙ্করবাবুর ভাইঝির সঙ্গে। কথাটা তার কানে এসেছিল

[illegible]বাবু বলেছিলেন—গোপালকে তোমরা দোষ দিয়ো না। ওকে তোমরা বুঝতে পার না। আমি পারি। বড় দুঃখ হয়। বলে ওই কথাকটি বলেছিলেন। সেদিন তার খুব ভাল লাগে নি। হয়তো বুঝতে তারও ভুল হয়েছিল। মনে হয়েছিল সত্য বলবার ভান করে নিন্দেই তিনি করলেন। তার সঙ্গে খানিকটা করুণাও করলেন বোধ হয়। আজ সে বুঝছে। তার বাবা সম্পর্কে। এমন সুন্দর করে সত্যটি প্রকাশ করা আর যায় না।

পুরনোকালের সংস্কারের বোঝা কুঁজো পিঠের ওপর বেঁধে ভগবান বিশ্বাসের পাকা লাঠির ওপর ভর দিয়ে বৈতরণী ঘাটের দিকেই বাবা হেঁটে চলেছে বটে। যদি ঘাটে তরী বাঁধা থাকে তবেই বাবা পার হবে। নইলে কোথায় ভেসে চলে যাবে কে জানে! বাবা সাঁতার জানে না।

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললে নেলি।

আজ গোপাল চৌধুরী তার মুখের দিকে স্থির কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে। —লুকিয়ে ওদের বিয়ে হয়ে গেছে? ওই মেয়েটির সঙ্গে তোর দাদার?

যেন লুকানো সত্যের স্বীকৃতি খুঁজছে তার মুখ চোখের মধ্যে। সে অস্বস্তি বোধ করলে। তবু সংযত এবং শক্ত হয়ে বললে—না বাবা ও—স—ব মিছে কথা। আমি তো সেদিন মাকে একথা বলি নি। বরং বলেছি ও—স—ব কথা মিথ্যে। দাদার সঙ্গে সে মেয়ের কোন সম্পর্ক নেই।

—সত্যি কথা বল। আমি তোকে দুটো টাকা দেব।

—না—না—না। তোমার পায়ে হাত দিয়ে দিব্যি করে বলতে পারি।

—হুঁ। বলে চুপ করে গেল, কিছুক্ষণ পরে বলল,—তোর দাদা কোথায়?

—সে তো সিউড়ি গেছে—কম্‌পেনশেসনের টাকার জন্য। কত টাকা দেবে বলে যে নোটিস এসেছে। তুমিই তো পাঠালে!

—হ্যাঁ—। ঘাড় নাড়লে চৌধুরী।—হ্যাঁ হ্যাঁ! কত টাকা বল তো?

—আড়াই শো না কত। আমি তো দেখি নি।

—হ্যাঁ। টাকাটা পেলেই—। হ্যাঁ—। ওটা পেলেই কলকাতা যাব। শ্যামাকিঙ্করকে ধরব—রেভেন্যু মিনিস্টার—ওই যে—কি নাম -তাকে পাকড়াবার জন্যে। টাকা দিতেই হবে। তিরিশ হাজার তো পাব তার দশ হাজার দিতে হবে। তোর বিয়ে দোব। আর ব্যবসা। দ্যাখ্, একটা ব্যবসা করব। হ্যাঁ।

নেলি আর সইতে পারলে না। ছুটে বেরিয়ে ঘর থেকে নীচে নেমে এল।—মা—তুমি যাও। আমি এ সব করছি মা—। আমি ও ঘরে থাকতে পারব না।

চৌধুরীগিন্নী তখন উঠোনে দাঁড়িয়ে ভিক্ষে দিচ্ছেন—নসুবালাকে। নসুবালা এসেছে। দুটি পাকা আতা ফল দাওয়ার উপর রেখেছে।

ফল দুটি সংগ্রহ করে এনেছে অসুস্থ বাবুর জন্যে।—খেতে দিয়ো মা! রসনায় স্বাদ হবে।

—আঃ, সব বিত্তান্ত শুনে থেকে আর আপসে (আপশোষ করে) বাঁচি না মা। তিনদিন বাইরে থেকে খবর নিয়েছি। আজ আস্তা থেকে দেখলাম—জানালার কাছে বাবু উঠে বসেছেন। তাই ঘরকে এলাম। আতা দুটি কাল থেকে নিয়ে ফিরছি মা। ভিখ দিচ্ছ দাও। ভিখ করেই তো খাই। তা ভিখ নয় মা, বাবুর খবরের লেগে—এয়েছিলাম। তা ভিখ নিয়েই যাচ্ছি।

চৌধুরীগিন্নী কথা বাড়ালেন না। ভিক্ষে দিয়ে চলে গেলেন।

নসু বললে—বাবুদিদি, তুমি ভাল আছ?

বাবুদিদি সম্বোধন শুনে হেসে ফেললে নেলি—আছি।

—বেশ! বেশ! তা দাদাবাবু—? সে কই গো?

—সিউড়ি গেছে।

—বেশ! বেশ! লোকের করণ দেখ দিকি নি। কি সব যে বলে! তারপর গলা নামিয়ে বলে, সে সব কি সত্যি কথা নাকি? সীমার সঙ্গে—?

—না, সে সব মিথ্যা কথা।

—মিথ্যে কথা! বেশ বলেছ। ঠিক বলেছ। সত্যি বলেছ। তা' আজ যাই। বাবুর অসুখ—তা নইলে ভাদু শোনাতাম। ভাদু আমার বিয়ে করবে না! তাই নিয়ে গান বেঁধেছি। তোমাদের মত ফেরতা দিয়ে কাপড় পরবে, স্কুলে যাবে, চাকরি করবে। তাই নিয়ে গান বেঁধেছি। তা', পরে শোনাব। হোক!

নেলি হাসলে। এই এক অদ্ভুত!

১০

নসুবালা অদ্ভুত। অদ্ভুত তার জীবন ধারণের প্রণালী।

সে নতুন ভাদু গান গেয়ে গ্রামে গ্রামে ভিক্ষে করে বেড়াবে। নসুবালার 'মাগুন' মাগ্‌না মাগুন নয়—ওই গান শুনিয়ে মাগুন। বেয়াই বসেছে আজ বি. ডি. ও. আপিসের চৌমাথায়। আজ ছুদিন ধরে বেয়াইয়ের খাটুনি গিয়েছে বিষম। সেদিন--; কদিন হল? সোমবার হাট ছিল—তার ফেরা দিন মঙ্গলবার—সেদিন —তারপরে বুধ বেরস্পতি শুক্কু শনি রবি'—চারদিন হল তা হলে। কদিন আগে পাঁচ দিনের দিন—সেই হাঙ্গামার দিন সেটেলমেণ্ট আপিসে আকুটির বাবুরা এয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে অনেক লোক। ওই অঞ্চলের পাঁচ-সাতখানা গাঁয়ের লোক। সেদিন বেয়াইয়ের মাল সব ঝেঁটিয়ে নিয়ে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বেয়াইয়ের মালের কদর বেড়েছে। বেরাকেট পিছু ছু আনা দাম চড়েছে। তারাই চোটাচুটি করে বাড়িয়ে দিয়েছে। তারপরেতে সেইদিন থেকেই বেয়াই মাটি ঠাসছে

—মাখছে আর ছাঁচে ফেলছে। আর শুকুতে দিচ্ছে। তুদিন আগে থেকে বেয়াই বুদ্ধির জোরে ফন্দি খাটিয়েছে ভাল। মণ তুই কয়লা এনে মজার চুলো করেছে। চারপাশে চারটে ইটের পায়া তৈরী করে তার উপরে চাপিয়ে দিয়েছে লোহার একখানা ভারী পাত তুহাত চওড়া—চার হাত লম্বা, চার হাত 'ক্যানো'—বেশী হবে পাঁচ হাত। পাতখানা ধার করে এনেছে দে মশায়ের ধানকল থেকে। রাজ্যের লোহালক্কড় সেখানে জমা হয়ে আছে। লোকে কোথা থেকে পায় এত লোহা—কে জানে? সব লোহা -সব লোহা হয়ে গেল মা! সেই যোগীন্দ মূলগায়েন মশায় গাইত—'যে দিকে ফিরাই আঁখি—কেষ্টময় ভুবন দেখি;'—সেই বৃত্তান্ত গো। বাড়ীতে কড়া হাতা খুন্তি-কোদাল টামনা-কুড়ুল কাস্তে দা' কাটারী গজাল পেরেক হাতুড়ী ই-সব ছাড়ান দাও, ওসব চিরকাল আছে। মাটির বাঁধ বেঁধে লোহার লাইন পেতেছে ভুবনের ই মাথা থেকে উ মাথা পর্যন্ত তার উপরে রেলগাড়ী— ; ইঞ্জিনটা গোটাই লোহার, গাড়ীগুলোর চাকা স্লিগে-তলাটা সব লোহার, মালগাড়ীগুলো তো সব লোহা। সিনগাল না সিগনাল—তা আবার লোহার তারের টানায় ওঠে নামে। লোহার খুঁটি পুতে টেলিগেরাপ -, তারে তারে খবর মনিটে মিনিটে—তাও সেই লোহার তার দিয়ে মোড়া। বাবুরা বলেন, ওর ভেতরে তামার তার আছে। সাবধানে পথ চল নইলে লোহার গজাল পেরেক পায়ে ঢুকবে। ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে কোথায় যে পড়ে আছে। কে জানে চালে টিন পড়ল সেও একরকম লোহা। লোহা না-হলে তুপুরে এমন 'তাতে'—গরম হয়? ইস্টিশানে তো উপর দিকে চেয়েছ তো মুখ থুবড়ে পড়ে নাক ভেঙেছ। 'সিনগালের' তারে পা আটকে দড়াম করে পড়বে। আবার গাঁয়ের তিন কোণে তিনটে রাইস মিল। চন্ননপুর তিন কোণা গা—পূব কোণ পশ্চিম কোণ দক্ষিণ কোণ আছে উত্তর কোণ নাই। এ মিল তিনটের তিনটে চিমনী লোহার চোঙা কালো আলকাতরা মাখা ভূইফোঁড়ের মত ঠেলে উঠেছে আকাশ

বাগে আর লোহার ধোঁয়া ওগরাচ্ছে। মিলের লোহা ডাঁই হয়ে 'পর্বত পেমান' হয়েছে। এখানা রাস্তার ধারে নালার উপরে পাতা ছিল—উপর দিয়ে লরী ঢুকত। এই দেখ, এই দেখ, ভুল দেখ হায় ভোলা মনের ; লরীর কথা মটরের কথা জিপগাড়ীর কথা বলতে ভুল হয়েছে বাসের কথা ভুলে গিয়েছি, লোহারশিক-চাকাওলা সাইকেল রিস্কা—সাইকেলের কথা মনে হয় নি। হায় মন রসনা! 'কেমন করে ভুলে গেলি তোর পেছনে যম রাজারই ভেঁপু বাজায় ; মোষের মতন উড়োয় ধুলো বাগ মানে না— কি গরজায়। হায় হায় হায়!'

তা' দে মশায়ের একখানা লোহার পাত খুঁতো হয়েছিল বলে সেখানা বাতিল হয়ে পড়েছিল। বেহাই ফটিক দাস গিয়ে সেখানা চেয়ে এনেছে। তারপর ইঁটের পায়ার উপর সেখানাকে চাপিয়ে তার তলায় একটা গর্ততে কয়লার আঁচ করে তাতিয়ে তার উপর বেরাকেট পুতুল শুকিয়ে নিয়েছে। আর রঙ করেছে সেও প্রায় দিন রাত। ক'দিন সে বেরুতে পারে নাই। আজ বেরিয়েছে। আজ হাট বটে, সোমবার। কিন্তু আজ পাঁচ সাত দশখানা গাঁয়ের লোক আসছে বি. ডি. ও. আপিসে ; সরকার চাষের ঋণ দেবে সেই ঋণ নেবে। দলে দলে ভাগ হয়ে 'গুরুপ' না কি বলে বেঁধে বসবে। দরখাস্ত লিখবে। ঝগড়া করবে, সময়ে সময়ে হাতাহাতি করবে। এ বলবে—দোব ফাঁস করে তোমার গুপ্ত কথা? সেবার লোন নিয়েছ—আজও শোধ কর নাই। আর টাকা নিয়ে চাষ করেছ না কচু করেছ, তুমি সাইকেল কিনেছ। আবার রোখ দেখ!

—আর তুমি? হা শালো—তুমি যে টাকা নিয়ে এখান থেকেই মালদ'র আম শ দরুনে কিনে নিয়ে গেলে। লুপ্ লুপ্ করে খেলে?

—অম্বল শূলে হবে খেয়ে থাকলে। জামাই রাগ করছিল—তার মা আমার মেয়ের ওপর খাপ্পা। জামাইষষ্ঠীতে তত্ত্ব করতে পারি নাই। তাই পঁচিশটা আম—বারো টাকায় কিনে তারসঙ্গে কাপড় কিনে পাঠিয়েছি। বলুক দশটা লোকে এতে আর সাইকেল কেনাতে সমান?

বেহাই এগুলি মনের খাতায় টুকবে আর পুতুল বেরাকেট বেচবে। বাতাস থাকলে বুড়ো পুতুলের মাথাগুলি আপনি দুলবে। না থাকলে বেহাই নিজেই বিড়ি খেয়ে ধোঁয়ার ফুঁ দিয়ে বাতাসে দুলিয়ে দেবে। সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে হাসবে --বলবে—যত রস ধানেরই ভিতর।

তা আজ সকালে লোকজন কম ছিল তখন—তখন নসুবালা এক নাচন নেচে এসেছে। লোকটা গেয়ে এসেছে। ভিক্ষে কিছু মিলেছে। লোকে হেসেছে খুব। তাতেই নসুবালা বেশী খুসী। তারপর হাটে যাবার কথা, কিন্তু একবার চৌধুরী মশায়ের খবর না নিয়ে যেতে পারে নি। খবর নেওয়া হল। চলো এবার হাট। গুন গুন করে ভাঁজতে ভাঁজতেই চলল নসু।

সে থমকে দাঁড়াল। বাবুপাড়ার ভেতর হয়ে গলিগলি সোজা পথে হাটে যাবে বলে রাজরাজেশ্বরের দোলপিঁড়ে ডাইনে রেখে কুলি সড়কটি ছেড়ে দু পা এগিয়েছে সবে—এমন সময় কে ডাকলে উত্তর দিক হতে ওই কুলীনপাড়ার মোড় থেকে—এই—এই নসুবালা এই!

—কে গ—অ! এ্যা? আঃ পেছাডাকা দেখ দিকি?

—এই নসু, শোন! নসু!

অ! দুটি ছেলে ছুটতে ছুটতে আসছে।

অ বাবা, কুলীন পাড়ার চাটুজ্জে মাশায়ের ছেলে আর দত্ত পাড়ার একজনা।

—কি বলছ বাবুদাদারা?

—আয় আমাদের সঙ্গে।

—কোথায় যাব? আমি যে হাট যাচ্ছি!

—যাবি পরে। এখন আমাদের সঙ্গে আসতে হবে। কি গান গেয়েছিস সকালে পাঁচ মাথার মোড়ে?

পুলকিত হল নসু! তা হলে লোকের মন ভিজেছে মজেছে। সেই কথা সকাল থেকে ঘোঁট হয়েছে—গান শুনে লোকে মেতেছে —আবার শুনবে বলে; ডাক পড়েছে।—চল—চল—চল!

চলতে চলতেই সে বললে—সে ভাতু ভাল ভাতু, দাদাবাবু ভাতু আমার বিয়ে করবে না। শুনবেন চলুন না!

ওঃ—গোলমাল উঠছে খুব। অনেক লোক তা হলে। জয় ভাতুমণি। মান রেখো মা দশের সামনে!

তা রাখবে। নিশ্চয় রাখবে। শেষকালে সেই দু কলি—

নাকের বদলে নরুণ
ফুলের বদলে রাঙা বিলিতী বেগুন—
সীমার বদলে ক্ষমা—।
ওঃ। শুনে বাবুরো সবে হেসে হবে খুন।
তাই ঘুনা ঘুনঘুন।

পাঁচ মাথায় অনেক লোক। গ্রামের লোক বেশী।

জনতার মাঝখানে কেউ উচ্চ কণ্ঠে বক্তৃতার ভঙ্গিতে কথা বলছে।

নসুবালা থমকে গেল।—ও বাবা, এ যে সতীশ ঘোষালের গলা। সে যে ভীষণ লোক! দুনিয়ার শাসনকর্তা! তেজী লোক! আগুন! হাকিম হুকিম কাউকে ভয় করে না। ভগবান মানুষটিকে খোঁড়া করেছে—নইলে যে কি করত—! বাবাঃ গোটা দেশকে 'টটরস্ত' করে দিত! হাঁটতে পারে না, মাথা ঘোরে। তবু দিনান্তে একবার পাঁচ মাথার মোড়ে এসে হক কথা উঁচু গলায় হেঁকে বলে যায়। এই সব লোক--যদি মন্ত্রী হয়, তাহলে দেশের চোর ডাকাত বদমাশ জোচ্চোর হাকিম-হুকিম সব ঠা—ণ্ডা হয়ে যায়! লোকটিকে নসুবালা ভয় করে। তবে ভালোও বাসে। লোকটি গান বাজনা বোঝে। তা বোঝে। আবার নাকি কি খেতাব পেয়েছে!

ওঃ গলার জোর দেখ দিকি!

ও বাবা! এ কি বলছে গো? এঁ্যা!—দেওয়া উচিত! নসুর পিঠে চাবুক মেরে চামড়া তুলে দেওয়া উচিত তার সঙ্গে এই এ কালের মূর্খ যুবকদের'!

ও বাবা! দাদাবাবু—আমি যাব না।

-- না চল। তোকে যেতে হবে! শুনব তোর গান। দশজনের কাছে বিচার হবে। চল্!

কাতর দৃষ্টিতে নস্থু তাদের দিকে চাইল!

* * *

সতীশ ঘোষালের সত্যিই গলার জোর আছে। নস্থুর চিন্তার মধ্যে গ্রাম্যতার ছোঁয়াচ থাকাতে হয়তো কিছুটা রঙচড়া হতে পারে, তবে—মোটামুটি লোকটির ওই রূপ। বিনত মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। বাল্যকালে পিতৃহীন মায়ের পরম আদরে লালিত। ভাই বোন নেই। ম্যাট্রিক পাশ। বয়স এখন বাহান্ন তিপ্পান্ন। প্রথম বয়সে ম্যাট্রিক পাশ করে চন্দনপুরের অচলা কয়লাখনি ও ব্যবসায়ের লক্ষ্মীর প্রসাদ কামনায় কয়লাকুঠিতে কোল মার্চেন্টের আপিসে চাকরীতে ঢুকেছিল। চাকরীতে সে কৃতিত্ব সর্বত্রই দেখিয়েছে—কিন্তু কোনখানেই সে উপরের কর্মচারীদের সঙ্গে বনিয়ে চলতে পারে নি। জীবনে কোথায় কবে কিভাবে একটি প্রশ্ন তার মনে জাগ্রত হয়েছিল—সেটি হল ও আমার থেকে বড় কিসে? এবং এ প্রশ্ন এখানেই শেষ নয়—এর শাখার প্রান্তে যে ফুলটি ফুটল তার বর্ণে গন্ধে এইটে প্রচারিত হল—ওরা জানে কি? সুতরাং কিসে আমার চেয়ে বড়?

এই অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিটি চাকরীতেই সে, লড়াই করেছে, কিন্তু সতীশের মতে এ দুনিয়া অবিচারের দুনিয়া। অবিচারের দুনিয়ায় সে অবিচারই পেয়েছে। যেখানে চাকরী পেয়েছে সেখানেই মাস কয়েকের মধ্যে তার চাকরী গেছে বা সে নিজেই কোন এক মুহূর্তে 'সেলাম সাব, বহুৎ হুয়া খুব হুয়া—আউর নেহি' বলে চলে এসেছে। রাগলে সে হয় হিন্দী বলে নয় ইংরিজী। বাংলা বলে না। তারপর আজ বৎসর পনের ঘরেই বসে আছে। বাড়ীতে বসে কিছু ছেলেকে প্রাইভেট পড়ায়; আর দুটি কাজ, একটি সঙ্গীতশাস্ত্র সম্পর্কে পড়াশোনা প্রায় রিসার্চ বলা যায়। মস্ত বই সে লিখেছে। বড় সঙ্গীতাচার্য দু একজনের কাছে পাণ্ডুলিপি পাঠিয়েছিল—তাঁরা

সুখ্যাতি তো করেছেনই, একজন আবার সঙ্গীত রত্নাকর উপাধিও দিয়েছেন। অপর কাজটি দুনিয়ার অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। নিত্য সকালে বা বিকালে পাঁচ মাথার মোড়ে এসে এই সম্পর্কে একটি বক্তৃতা সে দেয়। মাসে তার ডাকটিকিট খরচই দশ পনের টাকা। 'কোপাই' কাগজে তার ছড়ায় লেখা অনেক প্রতিবাদ বের হয়। দরখাস্ত করে এস-ডি-ও, ডি-এম এর কাছে—সেও ছড়াতে। মধ্যে মধ্যে পণ্ডিত নেহেরুকেও চিঠি লেখে—অন্তত তাই শোনা যায়। সেটা বোধ হয় ছড়ায় হবে না, কারণ পণ্ডিত নেহেরু তো বাংলা জানেন না। এবং ইংরিজীতে ছড়া সে লেখে না।

আজ সকালে নসুবালা এই পাঁচ মাথার মোড়ে—'ভাদু আমার বিয়ে করবে মা' ভাদু গেয়ে গেছে, তখন সতীশ তার কোঠার উপরে বসে—চশমা চোখে—তার বইখানা উল্টে-পাল্টে দেখছিল। প্রথমটা সে কানে করে শোনেও নি। তারপরই তার মন আকৃষ্ট হয়েছিল, মন দিয়ে শুনেছিল। গানের সে বোদ্ধা; নসুর গলা ভাল, গানে তার দখল আছে। কতবার তার পিঠ চাপড়ে সে বলেছে—বাহবা বাহবা! বা বেটি! নসু তার পায়ের ধুলো নিয়েছে। আজও তার ভাল লেগেছিল। এবং বেশ একটি কৌতুক অনুভব করেছিল! হারামজাদীর রসজ্ঞান আছে। সন্ধ্যেবেলা বাড়ীতে থেকে আর একবার শুনবারও সংকল্প করেছিল। দু-একটা কলি দু এক জায়গায় সুরের খোঁজখাঁজ দেখিয়ে দেবে তাও ভেবেছিল। অকস্মাৎ সব উল্টে গেল। হঠাৎ কানে গেল—পাষণ্ড অধার্মিক রক্তচোষা মহাজন ওই —শিবু দে নাকি খুব ধার্মিক লোক—ভাল লোক। সচকিত হয়ে ঘোষাল মাথা তুলল, পাঁচমাথার দিকে তাকাল। কি শিবু দে, ধার্মিক লোক, ভাল লোক! দাঁড়াও আমি যাচ্ছি। যখন সে পাঁচ মাথায় এল, তখন নসুবালা চলে গেছে। এবং ঠিক সেই সময় অমর চক্কোত্তি এসে পাঁচমাথার মোড়ের মাথায় সাইকেল থেকে নামল।

মেয়ের বিয়ের পর আজ প্রথম চন্দনপুর ঢুকছে অমর চক্কোত্তি। খারাপ মেজাজ নিয়ে ঢুকছে। তবে সে শক্ত লোক। মোটামুটি খুব চঞ্চল সে হয় নি। অন্তত গোড়ার দিকে তো নয়ই। সীমা ভোররাত্রে পালিয়ে আসার পর সকালেই সে তাকে খুঁজতে চন্দনপুরেই আসছিল। পথে নেমে ঢুকেছিল চণ্ডীতলা। ভেবেছিল থুথু ফেলে আসবে। ওখানেই সব সংবাদ পেয়ে হঠাৎ সে খুশী হয়ে উঠেছিল। সীমা কোন ছোঁড়াটোঁড়ার সঙ্গে ভাগে নি। কোন কুজাতের সঙ্গেও না। এবং সীমা এখন তার সীমানার বাইরে। বহুৎ আচ্ছা। ঠিক হ্যায়! পাঁচশো টাকা সে অগ্রিম নিয়েছে। তাই—তাই সই। এবং সঙ্গে সঙ্গে থুথু না ফেলে চণ্ডীকে একটি প্রণাম করে—সেইখান থেকে সাইকেল ঘুরিয়ে এসে উঠেছিল বনচাতরা। ভাঙ্গুক বিয়ে! উপায় কি? সে হ্যাণ্ডনোট লিখে দিতে রাজী আছে। অভিনয় চাতুর্যে চরম শোক এবং ক্ষোভোন্মাদ প্রদর্শন করে বলেছিল—আমাকে জেলে দাও। আমার কাছে হ্যাণ্ডনোট লিখে নাও। যা—ইচ্ছে! ভালো ভালো কথা বলেছিল নাটক থেকে। 'আমি অপরাধী কিন্তু সে অপরাধ স্বেচ্ছাকৃত নয়। বিশ্বাস কর। আমি তোমার করুণার দুর্গে আশ্রয় চাচ্ছি। আমাকে যা করবে কর।' কিন্তু রমেন্দ্র ভোলে নি। হ্যাণ্ডনোট নয়—পুলিস নয় জেল নয় মশায়, আমার কুটুম্ব সজ্জন এসেছে। বিয়ে হতেই হবে। আপনার আর একটি মেয়ে আছে। ক্ষমা রয়েছে। ওর সঙ্গে বিয়ে হতে হবে। বাস, আপনারও ক্ষমা—আমারও ক্ষমা।

সুতরাং ক্ষমার সঙ্গেই রমেন্দ্রর বিয়ে হয়ে গেছে।

সেই বিয়ের পর আজ সে প্রথম চন্দনপুরে ঢুকল। যথানিয়মে এসে প্রথম উঠল চণ্ডীতলায়। সেদিন থুথু ফেলা হয় নি আজ

ফেলবে। বিয়ের পর ঘটনাগুলো এমনই ভাবে ঘটে গেল যে মন মেজাজ ভাল নেই। প্রথম, ক্ষমাকে সে রমেনের হাতে দিতে চায় নি, বাধ্য হয়ে দিয়ে সুখীও হয় নি। ক্ষমার বর ও নয়। এই ছোট মেয়েটাকে সে বড় ভালবাসত। দ্বিতীয়, বৌভাতের পরদিন রমেন তাকে অপমান করেছে। কঠিন অপমান। বউভাতের দিন সে মদ খেয়েছিল জামাই বাড়ীতে। শুরু করেছিল রমেনের বাপের সঙ্গে। তারপর কতজনের সঙ্গে যে খেয়েছে ঠিক নেই। থিয়েটারের সময় যাদের সঙ্গে খেয়েছে তাদের কারও একজনের সঙ্গে বাদ দেয় নি। তারপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়ে বমি করেছিল। পরের দিন সকালে তখনও খোঁয়াড়ি মরে নি মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে—সেই সময় রমেন তাকে ডেকে বলেছিল—একটা কথা বলছি মন দিয়ে শুনুন।

কি ?

—দেখুন—আগে আগে এসেছেন—পাছা ঘোরাতে মানে থিয়েটার করতে। তখন মদ খেয়েছেন বমি করেছেন বেলেল্লাগিরি করেছেন কুকুরে মুখ চেটেছে কথা উঠলে বলেছি—এই আমার বাবাকেই বলেছি আমাদের স্বজাত স্বজ্ঞাত ধরছ কেন ? থিয়েটার-বাতিক এ্যাক্টর এদের জাত আলাদা। আনন্দ করে একটু আধটু খেতে খেতে ঢলাঢলি করে ফেলে। কিন্তু কাল কাণ্ডটা করলেন কি হিসেবে ? থিয়েটার তো ছিল না। এসেছিলেন তো আমার শ্বশুর হিসেবে। ওই রকম করে বেলেল্লাগিরি করলেন কি বলে ? কি ভেবে ছিলেন ? এবার আর একটা হুঁকো নয় দুটো হুকো ? রমেনের শ্বশুর আর থিয়েটারের মোশন মাস্টার একসঙ্গে ? লোকে কি বললে, বলছে, শুনেছেন ?

চক্কোত্তি সহজে দমে না। সে বলেছিল—আমি তোমার শ্বশুর নই তোমাদের থিয়েটারের মোশন মাস্টারও নই। আমি অমর—অমর চক্কোত্তি—! কোন গুণ নাই যার কপালে আগুন। আমি চণ্ডীমায়ের পেটে ঘুষি মেরেছি মদ খেয়ে। এতে লুকোছাপা নেই

বাবা! তুমি তো জেনেই আমাকে শ্বশুর করেছ! হ্যাঁ—যদি নিজের চরিত্র গোপন করে তোমার শ্বশুর সাজতাম তো বলতে পারতে।

রমেন কিছুক্ষণ চুপ করে বসেছিল। তারপর বলেছিল—হ্যাঁ এ কথা স্বীকার করতে হবে আমাকে। তা'—গরুর গাড়ী করে দেব—না ।

—না—না—না! তোমার সাইকেলটা দাও। তা হলেই হবে।

—ভাল—তাই নিয়ে যান। আমারখানাই নিয়ে যান। গদীর তিনখানার অনেক কাজ। যান ওখানাই নিয়ে যান। ক্ষমার সঙ্গে দেখা হবে না। তবে শুনে যান—ক্ষমা খুব চটেছে। বলেছে—এমন বাপের মুখ দেখতে নেই।

—বহুৎ আচ্ছা বাবা। মেয়ের বাপের কাছে, বিশেষ করে আমার মত বাপের কাছে এর চেয়ে সুসংবাদ আর কি হতে পারে! তা চললাম আমি। তোমার বাবার সঙ্গেও দেখাশুনো থাক।

চলে এসেছে সে রমেন্দ্রের সাইকেলখানায় সওয়ার হয়ে। এসেই বাড়ীতে মনোরমার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। তুমুল ঝগড়া। কিন্তু মনোরমা পরম সহিষ্ণু মেয়ে—সে তুমল ঝগড়াটার শব্দ বাড়ীর বাইরে যেতে দেয় নি। প্রহার করেছে চক্কোত্তি। তাও সে নীরবে সহ্য করেছে। এবং বারবার বলেছে—চীৎকার করো না। মারছ মার, গাল দিচ্ছ দাও কিন্তু আস্তে করে দাও। বলে চক্কোত্তির মদ্যভাণ্ডার থেকে মদ বের করে দিয়ে বলেছে—খাও। খোঁয়াড়ি ভাঙো। খুব আকণ্ঠ খাও। আমি কিছু ভাজাভুজি করে দিচ্ছি। তারপর ঘুমোও! যা করেছ কুটুম্ববাড়ীতে তা আজকেই আসবে গাঁয়ে। নিজে চীৎকার করে সেটা জানিয়ে কি ফল হবে? নাও মদ খাও। সেটা পরশুদিনের কথা।

গতকাল একজন লোক এসেছিল সাইকেল নিতে। ক্ষমার লেখা চিঠিও সে নিয়ে এসেছিল! ক্ষমা লিখেছে—অষ্টমঙ্গলায় আমার যাওয়া হইবে না। সাইকেলখানি ফিরাইয়া দিয়ো।' কিন্তু অমর চক্কোত্তি

সাইকেল ফেরৎ দেয় নি লোকটাকে বাইরে থেকেই ভাগিয়ে দিয়েছে।

—ভাগ্ ! যা বাড়ী যা।

—সাইকেল—

— সে আমি গিয়ে দিয়ে আসব।

—বাবুর খুব—

—হোক রে বাবা হোক অসুবিধে। বেশী হয় তো একখানা কিনতে বলগে। বেশী ত্যাঁদড়ামি করবি তো চড় খাবি। যা।

সেই সাইকেল চেপেই সে এসেছে আজ। মায়ের থানে ঢুকে সাইকেলে তালাচাবি দিচ্ছে, সেই সময়েই শিবনাথ দে মা চণ্ডীর স্থানে তার নৈমিত্তিক প্রণামটি সেরে বেরিয়ে এসেছিল। দে তার সেই নিজস্ব শান্ত ভঙ্গিমায় বলেছিল —আরে বাপরে! চক্কোত্তি! মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল।

—হ্যাঁ। ব্যজনা শুনতে পাও নি ? তোমার মিল থেকে তো এক দৌড়ের পথ আমার গ্রাম। রাস্তাটাতে দেখা যায় গো। আলো দেখ নি ?

প্রথমেই যেন খোঁচা বিঁধে ছিল চক্কোত্তির ক্ষতস্থানে।

—দে মিষ্ট মৃদুস্বরে সহাস্যে বলেছিল - চোখও আছে, কানও আছে, মিলে থাকলে দেখতে শুনতে পেতাম। কিন্তু গ্রামের ভিতরে যে-বিয়ের বাড়া কাণ্ড আমাদের—

—তা হলে তো বৃষোৎসর্গ।

—না। দানসাগর। তা তোমার ওই মেয়েটি ভাল মেয়ে। প্রশংসার মেয়ে। আমরা সকলে মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করেছি। বেশ তো শিখুক লেখাপড়া! তোমার দায় খালাস হয়ে গেল তাকে নিয়ে। ছোট মেয়েরও বিয়ে হয়ে গেল। সাইকেলটি দেখছি রমেনের। চিনি সাইকেলখানা। ভালো সাইকেল। দামী জিনিস। তা ওটি দক্ষিণে পেলে বুঝি ?

আর সহ্য হয় নি অমর চক্কোত্তির—সে চীৎকার করে উঠেছিল, শাট্আপ—ইউ বদমাশ পাষণ্ড কোথাকার।

হেসে ফেলেছিল দে।—আরে—হঠাৎ শাট্‌আপ-টাটাআপ কেন হে! —কি হল কি অন্যায় বললাম?

—আই সে—ইউ শাট্ আপ! বেরিয়ে যাও। তুমি পাষণ্ড—তুমি ভণ্ড—তুমি ঠগ—তুমি—তুমি রক্তচোষা মহাজন এক্সপ্লয়টাব বেরিয়ে যাও তুমি।

দে'র মুখের উপর থেকে একটি অদৃশ্য আবরণ যেন নিঃশব্দে উঠে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। চোয়াল দুটি শিবনাথের চওড়া—সে দুটো শক্ত হয়ে উঠল, চোখের তারা দুটি বারেকের জন্য স্থির হল। সে দাঁড়িয়েছিল. এবার দাওয়ার উপর চেপে বসল—বসে ধীর শান্তকণ্ঠে বললে—চেঁচিও না। কথাটি শুনো। দেখো, চণ্ডীমায়ের স্থান এখানকার জনসাধারণের, জনসাধারণ ম্যানেজিং কমিটি করে তার উপর সব ভার দিয়েছেন। আমি সেই কমিটির একজন সভ্য। তোমরা পাণ্ডা—সেটেলমেণ্ট রেকর্ড অনুযায়ী তোমরা দেবতার সেবক। সেবক মানে চাকর। সেবার ত্রুটি হলে সেবককে সাস্‌পেণ্ড করতে পারি, বরখাস্ত করতে পারি। তুমি দেবতায় বিশ্বাস কর না। মা চণ্ডীর পিঠে তুমি একবার চড়েছিলে, পেটে কিল মেরেছিলে। তখন তোমাকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল। আজ আবার তুমি এসেছ—উচ্ছিষ্ট অশুচি কাপড় জামা পরে। তোমার কাপড়ে জামায় ওই দেখ—এঁটোর দাগ লেগে রয়েছে। মুখে মদের গন্ধও উঠছে মনে হচ্ছে। তোমাকে আমি সাধারণের দেবস্থান—এখান থেকে বেরিয়ে যেতে বলছি না, বলছি তুমি মন্দিরে ঢুকবে না। আর তারপর উঠে দাঁড়িয়ে হেঁকে বললে—রাজ-পুরোহিত মশায়।—কোথায় গো। শুনুন একবার। দেখুন—ম্যানেজিং কমিটির সভ্য হিসেবে অমর চক্কোত্তিকে আমি সাস্‌পেণ্ড করে গেলাম। আমদানীর ভাগ উনি পাবেন না আজ থেকে। ওর ভাগের টাকা পয়সা মায়ের ভাগের সঙ্গে জমা থাকবে। কমিটিতে প্লেস করে যা হয় স্থির হবে। কমিটি আমার প্রস্তাব বাতিল করেন,

উনি সব ফেরৎ পাবেন। আমার প্রস্তাব মঞ্জুর হয়—উনি সেবকপদ থেকে বরখাস্ত হবেন। তারপর-মামলা মকদ্দমা যা করবার করবেন। আমরা লড়ব। বলে রাখলাম খরচ আমি দোব।

কথা শেষ করে ধীর পদক্ষেপ শিবনাথ দে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হল। সকলে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। চক্কোত্তি পর্যন্ত। শিবনাথ দে কথা বললে বিশেষ করে আইন দেখিয়ে এমনি সুরে কথা বললে—লোকে থমকে যায়। কারণ তার ধ্বনির গাম্ভীর্য আছে যা নিরেট ভারী বস্তুর ধ্বনির মত। উচ্চ নয় কিন্তু নিষ্ঠুর এবং দৃঢ়।

কয়েক মুহূর্ত পরেই চক্কোত্তি সম্বিৎ ফিরে পেয়েছিল। তার মোহ কেটেছিল। সে বলেছিল—দেখা যাবে। জনসাধারণের মন্দির—জনসাধারণ দখল করে নেবে। সে খেল্ অমর চক্কোত্তি খেলতে জানে।

—হ্যাঁ! ইনকিলাব জিন্দাবাদ। তা বেশ! দেখা যাবে।

আবার একটু হেসেছিল শিবনাথ দে। তারপর আরও দুপা গিয়ে দে ঘুরে দাঁড়িয়ে সহাস্য মুখে বলেছিল—নস্যুবালার নতুন ভাদু গান শুনেছ চক্কোত্তি? 'ভাদু আমায় বিয়ে করবে না?' শুনো—কাল শুনো। একটু খুঁত আছে আজ পর্যন্ত। ওকে ওই চমৎকার সাইকেলখানার কথা বলে দেব। গেঁথে নেবে। ওটা সে জানে না।

* * *

অমর চক্কোত্তি এতেও দমে নি সে জোর করেই সেই কাপড়ে—সেই অবস্থাতেই মন্দিরে ঢুকে মায়ের মাটির স্তূপের দেহ থেকে সিন্দুর নিয়ে কপালে পরেছিল, জঙ্গলের ভিতর থেকে বুনো বেল ফুল অপরাজিতা ফুল এনে চেপে বসে—পূজোর অভিনয় করে চোখ বুজে বিড়বিড় করে মন্ত্রপড়ার ভঙ্গিতে ঠোঁট নেড়েছে—;

—মাট্যাঃ ঢিপয়ে নমঃ মাট্যাঃ ঢিপয়ে নমঃ। মিথ্যায় নমঃ। বোগাসায় নমঃ।

এ মন্ত্র মনে মনে উচ্চারণ করতে তার পেটের ভিতর হাসির একটা আবর্ত ঘুরপাক খাচ্ছিল; কিন্তু সে তা সম্বরণ করলে; এ

ক্ষমতা তার আছে। ইলেকশনের সময় সে যখন রামদাস মহাবীরকে রুদ্র দেবতা বলে অভিহিত করে বক্তৃতা করে তখন তাদের গ্রামের মুখ-পোড়া-বীর হনুমানটার কথা মনে পড়লে এমনি হাসি বুক পেট তোলপাড় করে আবর্ত তোলে। কিন্তু তাতে তার বক্তৃতা ব্যাহত হয় না। থিয়েটারে যাত্রায় সে অভিনয় করে এ শক্তিটা আয়ত্ত করেছে। —গম্ভীর মুখে গাঢ় ভক্তি গদগদ কণ্ঠে 'জয় মা । নে মা!' বলে ফুলের অঞ্জলি ছিটিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল সে। এবং সাইকেলের চাবি খুলে সবরেজেস্ট্রী আপিস যাবার পথে—চৌমাথায় একটা সাঁকোর প্যারাপেটের উপর পা-রেখে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে বলেছিল—পাষণ্ড রক্তচোষা মহাজন শিবনাথ দে—যে ম্যানেজিং কমিটির মেম্বার—সে কমিটি দেবস্থানের কমিটি হতে পারে না। আমরা যতকাল চণ্ডীতলার সৃষ্টি, ততকাল চণ্ডীর সেবায়েৎ পাণ্ডা। ওই শিবনাথ দে বলে কিনা আমাকে সাসপেণ্ড করবে? আমার মেয়ের বিয়ে নিয়ে ঠাট্টা করবে? বলে কিনা—সেই নস্টাকে দিয়ে গান বাঁধিয়ে গাওয়াবে!

সতীশ ঘোষাল ঠিক সেই সময়েই পাঁচ মাথার মোড়ে এসে দাঁড়াল এবং সাঁকোর প্যারাপিটের ওপর দাঁড়িয়েই শুরু করলে—একটা ছোট জাত একটা ব্রাত্য একটা নপুংসক—তার এ সাহস কোথা থেকে হয়? কি করে হয়? ব্রাহ্মণ ভদ্র রাজনৈতিক কর্মী—তার কন্যা—হয়তো সে ভুল করেছে, সে ভুল অবশ্যই শোধরাবে। কিন্তু তার নামে গান বেঁধে এমনভাবে নেচে বেড়াবে এই অন্যায়ের প্রতিকার হবে না? এসব দেখবে না সমাজ? না দেখলে সবারই এই দশা হবে। এই এক দৃশ্য। এর মূলে আছে ধনীর চক্রান্ত। উস্কানি। হায় দেশ। হায় স্বাধীনতা! ভেকে পদাঘাত করছে গোক্ষুর সর্পের মাথায়।

বি.ডি.ও. সাহেব—দেখুন, স্বাধীন রাজ্যে এ অঞ্চলের উন্নতি করতে এসেছেন আপনি—আপনি দেখুন, কেমন উন্নতি হচ্ছে।

আপনি বসে আছেন মাটির পুতুলের মত। ধনী—ধনী আছে যে পিছনে। চমৎকার স্বাধীনতা। আর এই সব যুবক। স্বাধীন দেশের যুবক। নিবীর্য মূর্খ সব। শুনছে। হাসছে! হেসো না। হেসো না! আসছে, তোমাদের মাথায় পদাঘাতের দিনও আসছে। একটা ছোটলোককে শাস্তি দিতে পারে না এরা।

একটি ছেলে এগিয়ে এসে বললে—সে দিন আপনি কি বলেছিলেন? আজ উল্টো বলছেন কেন?

—কি? কি উল্টো বললাম?

—সেদিন গোপাল চৌধুরীকে ন্যাড়া মেরেছিল—আমরা বলছিলাম ন্যাড়াকে ধরে এনে শাসন করা উচিত—করব আমরা। আপনি আজকের মতই জানালা থেকে নেমে এসে ঝগড়া করেন নি আমাদের সঙ্গে? বলেন নি—ঠিক করেছে ন্যাড়া। নতুনকালের অগ্রদূত সে। শোধ—শোধ—প্রতিশোধ নেবার সময় এসেছে। অনেক মার তারা পুরুষানুক্রমে খেয়েছে—আজ শোধ নেবে না? ছোটলোক! কে ছোটলোক? মানুষ! বলেন নি আপনি? আজ নস্কুকে বলছেন—ছোটলোক! কেন বলছেন?

—তুমি মূর্খ, তুমি মূর্খ, তুমি মূর্খ! তুমি শুনেছ সে ছড়া গান? সে প্রহারের চেয়েও মর্মান্তিক! লজ্জার কথা! ঘৃণার কথা! —না। সে গান আমরা শুনেছি। কোন অপমান সে করে নি। মেয়েটির সে প্রশংসা করেছে। রমেন আচার্যিকে শুধু খানিকটা ঠাট্টা করেছে। আর ওই চক্কোত্তিকে—।

কই চক্কোত্তি? চক্কোত্তি এই অবসরে সরে পড়েছে। চলে গিয়েছে, সে বুদ্ধি রাখে। সতীশ ঘোষালকে সে জানে। জানে—ঘোষালের হাঙ্গামা বাধাবার পারঙ্গমতা যথেষ্ট। এবং কোন হাঙ্গামায় সে লাভবান হয় না। সুতরাং সে সরে পড়েছে। হয়তো বা এতক্ষণে তার মনও শান্ত হচ্ছে ক্রমশ। সে বুঝতে পারছে সকালবেলা চণ্ডীতলায় সে উত্তেজিত না হলেই ভাল করত।

সতীশ ঘোষাল চারিদিকে তাকাচ্ছিল চক্কোত্তির খোঁজে। কই চক্কোত্তি?

কে একজন বললে—চক্কোত্তি কি আর আছে। সে পালিয়েছে। এখন যে-যার বাড়ী যাও। ঘোষাল তুমিও আর বকে শরীর খারাপ করো না!

—করব না? হোয়াট ডু ইউ মীন? ডু ইউ মীন টু সে দ্যাট আই কেয়ারড টু সাইড উইথ দ্যাট বাগার চক্কোত্তি? আমি অন্যায়ের প্রতিবাদ করছি। আমার ক্ষমতা থাকলে চাবুকে এই ধরনের অন্যায়কারী ওই নস্টটার পিঠের চামড়া তুলে দিতাম।

—কই দিন। দিন চামড়া তুলে। এই নস্টকে নিয়ে এসেছি আমরা। কই চাবুক আনুন।

এবার ঘোষালের চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে উঠল। সে এটা ভাবে নি। সত্য বলতে কি সে ভেবে চিন্তে কিছু করে না বা বলে না। জীবনের ব্যর্থতায় তার দুরন্ত ক্ষোভ মনের কন্দরে অবরুদ্ধ বাষ্পের মত ঘুরপাক খায়, যে কোন অজুহাতে যে কোন ছিদ্র দিয়ে সে ক্ষোভ বেরিয়ে আসে। কিন্তু তার অধিক কিছু না।

—নিন! মারুন!

ছেলে কয়েকটা নাছোড়বান্দা যেন। তার কারণ আছে। সতীশ ঘোষাল ওদের সুযোগ পেলেই তিরস্কার করে। সুযোগ পেতে হয় না—সুযোগ খুঁজে নেয়। তাদের কথায়-বার্তায় অকস্মাৎ এসে যোগ দিয়ে তাদের তিরস্কার করতে শুরু করে।

ক'দিন আগে গোয়ালা দুধে জল দেয় এই নিয়ে আলোচনার মধ্যে হঠাৎ ঘোষাল এসে গোয়ালার পক্ষ নিয়েছিল। এবং দুধের জলের জন্য দায়ী বড় ব্যবসায়ী শিবনাথ দে, এইটেই প্রমাণ করতে চেয়েছিল সে। শিবনাথ দে চালে কাঁকর মেশায়,—ডালে ভেজাল দেয় তেলে ভেজাল দেয়, ঘিয়ে চর্বি দেয়—তাতে দোষ হল না—দোষ হল গোয়ালার? আই—আই স্ট্যাণ্ড ফর হিম, দি গোয়ালা!

ব্যাপারটার ওখানেই শেষ হয় নি, সতীশ ঘোষাল তার জের টেনেছে 'কোপাই' পত্রিকা পর্যন্ত। তার নিজস্ব ধারায় সে একটি প্রতিবাদপত্র ছড়ায় রচনা করে প্রকাশের জন্য পাঠিয়েছিল। চিঠি-পত্রের (মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন) কলমে সেটি বেরিয়ে গেছে। দু তিন দিন আগেই পত্রিকাখানি নিয়ে এই পাঁচ মাথার মোড়ে এই প্যারাপেটে বসেই সতীশ ঘোষাল উচ্চকণ্ঠে পড়ে সকলকে শুনিয়েছে। এ সব ক্ষেত্রে তার এক রসিকতা-পটু (রসিক নয়) রূপ বের হয়। সে বসেই উচ্চকণ্ঠে বলে—অব ধা-ন। অব ধা-ন! নাগরিকগণ শ্রবণ করুন।

"চালে কাঁকর—ডালে কাঁকর
গব্য ঘৃতে চর্বি
যা—যা—যা—যা ছোঁড়ারা যা,
যা পারিস তা করবি
কালো বাজার আলো করে
আসছে টাকা দেদার
এতে ওতে চাঁদা বলে
ভাগা কিছু নে-তার।
ধমকে মারেন ছোকরা দিগে—
সব বাজারের সব্ নাগ—
চাঁদা ভাগা না-নিবি তো
জ্বালাস নেকো জলদি ভাগ।
সাহেব গেল সুবো গেল
যত কালকের ছোক্‌রা—
ভেজাল বলে চ্যাঁচাস নেকো
করিস নেকো ন্যাকরা।
লেখায় ভেজাল পড়ায় ভেজাল
পাশ করা সব মুখ্যু।

গরুরা সব গুরু হল
এই তো বড় দুঃখু।
হাকিম দিগে হুজুর বলে
চাকরী বরং করগে যা
নেহাৎ লড়াই করবি যদি
গয়লা সাথে লড় গে যা।
গয়লারা সব ঘরে থাকে
দুগ্ধ বেচে গয়লানী
ব্রজলীলা জমবে ভাল
ভাণ্ড ভেঙে খা ননী
হায়রে কপাল ছোঁড়া রাখাল
ফাটিয়ে টেরী লম্বা—
মাতব্বরী করে বেড়ায়
আমরা হলাম খাম্বা।

নিচে ফুটনোট খাম্বা মানে থাম অর্থাৎ আমরা থাম হয়ে গিয়েছি। বোবা—জড়। দেখে শুনে এবং লজ্জায়।"

সবু নাগ হল শিবু দে। মানহানির দায় এড়াবার জন্যে শিবুকে সবু করেছে। তার সঙ্গে সতীশের ঝগড়া অনেক দিনের। শুধু শিবু দে নয়—গন্ধ বণিকদের ভুলু দত্তের সঙ্গেও তার দীর্ঘকালের বিবাদ। এবং সব বিবাদের পিছনে কি আছে সে নতুন কালের ছেলেরা জানে না। কিন্তু ঝগড়াগুলির উপলক্ষ্য সতীশ ঘোষালের পথের ঝগড়া। পথ নিয়ে ঝগড়া। ভুলু দে তার একটা পথ বন্ধ করেছিল। সে অনেক দিন আগে। তখন শিবু দে তাকে সাহায্য করেছিল। সে পথ ঘোষাল পেয়েছে। এখন আবার একটা নতুন ভিটে কিনেছে শিবু দে, তার ফলে সতীশের বাজারের দিকে আসবার একটা সহজ গলিপথ বন্ধ হয়েছে। তা নিয়ে মামলা চলছে।

শিবু দে-র সম্পর্কে কোন মোহ কোন কারণেই এ গ্রামের লোকের

নেই। শিবু দে মশায়ের নিজেরও নেই। তাকে ভালো লোক—অর্থাৎ মহৎ লোক কোন লোকেই ভাবে না এবং দে নিজেও চায় না লোকে তা ভাবুক। ও নিয়ে তার কোন মাথা ব্যথা নেই। পথের মূল ঝগড়াটা পথ নিয়ে নয়, একটা নালা নিয়ে। ঘরের জল নিকাশী নালা। আগের কালে শুধু বর্ষার জল বের হত। স্নান ছিল পুকুরে, এমন কি চব্বিশ ঘণ্টার জল আচরণ তাও চলত খিড়কীর পুকুরে! সেটা একেবারে বাড়ীর দোরে নাও হতে পারত! তবু লোকে খেয়ে হাত ধুতে যেত সেই পুকুরঘাটে। এখন বাথরুমের রেওয়াজ হয়েছে—বাড়ীতে ইন্দারা হয়েছে, সুতরাং বাড়ীর ভিতর জল অহরহ পড়ে। উঠোন সিমেন্ট বাঁধানো। জল চব্বিশ ঘণ্টা নিষ্কাশন পথ খুঁজছে, বের হচ্ছে। এই নালা বন্ধ করবার জন্য লাগল সতীশ। দরখাস্ত। সত্যাগ্রহ।শেষ কাগজপত্র ঘেঁটে শিবু দে গোটা পথটাকেই বন্ধ করে দিলে। গ্রামের কেউ খুশী হল না। তবে সতীশ ঘোষালকে সহানুভূতি দেখিয়ে তার কাছে বা পাশে দাঁড়াতেও কেউ এল না। সেও ঘোষালের প্রয়োজন নেই। সে তাই বলে। এবং কাঁটা গাছে যে ফুল ফুটুক, তাতে কোল দিতে কেউ আসে না। এই কারণেই, সতীশ ঘোষাল আজ অমর চক্কোত্তির পক্ষ নিয়েছে। শিবু দে-র সংশ্রব ছিল, সুতরাং নেমে এসেছে তৎক্ষণাৎ। এবং শিবু দে যেহেতু বলেছে যে নসুকে দিয়ে ভাদু বানিয়ে গাওয়াবে সেই হেতু সে নসুর এই ভাদুর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করতে এসেছে। অন্যথায়, সে হয়তো নসুকে বাহবাই দিত। প্রথম শুনে তো সে মনে মনে হেসেছিল।

নসুকে যখন সামনে ধরে ছেলেরা বললে —কই মারুন। বের করুন চাবুক ; তখন বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সতীশ তাকিয়ে রইল সকলের দিকে। তার একবার ইচ্ছে হল সে এমন একটা হুঙ্কার ছাড়ে—যে হুঙ্কারে এখানকার সমস্ত লোক মুহূর্তে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে যায়। কিন্তু সে হুঙ্কার করবার শক্তি তার নেই। হয়তো বা কারুরই নেই? এবং মুহূর্তে মুহূর্তে তার উলটো একটা জিনিস—একটা ভয়—তার

সঙ্গে একটা লজ্জা—দারুণ লজ্জা, তাকে যেন নাগপাশের মত জড়িয়ে ধরছে। এবার মুহূর্তে মুহূর্তে তার বাঁধনটা শক্ত থেকে শক্ততর হচ্ছে। তার ফলে একটা মর্মান্তিক যন্ত্রণা তার মনের সর্বাঙ্গে সঞ্চারিত হচ্ছে। তার সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে এক সময়ে সে তা অনুভব করলে। তার হাত পা কাঁপতে শুরু করেছে বুকের মধ্যে হৃৎস্পন্দন ঘন থেকে ঘনতর হয়ে উঠছে। হঠাৎ তার ইচ্ছে হল—সে হা হা শব্দে হাহাকার করে কেঁদে ওঠে। সে কান্নায় সব গাছ পাথর বেদনায় গলে যায়। কিন্তু তাও সে পারলে না। লজ্জার নাগটা তার কণ্ঠরোধ করে চোখের সামনে ফণা তুলে দুলছে—না—না—না বলে দুলছে। পৃথিবী দুলছে।

পৃথিবীর কেউ তাকে বোঝে না। নিষ্ঠুর পৃথিবী! নিষ্ঠুর!

সে পড়েই যেত। সত্যিই সে কাঁপছিল। সেই অবস্থায় তাকে কেউ ধরলে। ধরলে দেবব্রত চক্রবর্তী। দেবব্রত চক্রবর্তীর কণ্ঠস্বরটা চিনতে পারলে সতীশ। চক্রবর্তী বললে—

—করছেন কি আপনারা! দেখছেন না পড়ে যাবেন! সরুন সরুন। দয়া করে রাস্তা ছাড়ুন।

সামনেই আশু সিংহীর ডাক্তারখানা। গোলমাল শুনে আশু সিংহী প্রথমেই একবার এসেছিল। তখন পালার সবে শুরু, সদ্য গালাগালি শুরু করেছে অমর চক্কোত্তি। তাতে শুনবার কিছু ছিল না। বরং কৌতুক বোধই করেছিল অকস্মাৎ শিবনাথ দেকে নিয়ে পড়ায়। হঠাৎ শিবনাথ দেকে কেন গালাগাল পাড়ছে বুঝতে পারে নি, কম্পাউণ্ডারকে বলেছিল, এস—এস ভেতরে এস। ও আর কি শুনবে?

তারপর সতীশ ঘোষালের কণ্ঠস্বর পেয়েও বিস্মিত হয় নি। হেসে কম্পাউণ্ডারকে বলেছিল—ঘোষাল এল।

সেও হেসে বলেছিল—হ্যাঁ।

—আগুন জ্বললে—উনপঞ্চাশ বায়ু আসবেই। কথাটা বলসে

দেবব্রত চক্রবর্তী। সে এখানকার বাসিন্দা বটে কিন্তু চন্দনপুরের অধিবাসী নয়। শ্যামবর্ণ বলিষ্ঠ দেহ লম্বা মানুষ। সে কাজেই এসেছিল আশু সিংহীর ডাক্তারখানায়।

আশু বলেছিল—খুব বলেছেন, সাক্ষাৎ ঊনপঞ্চাশ বায়ু। একে সতীশ ঘোষাল তার উপর শিবনাথ দে'র নাম। আর রক্ষা আছে!

যাক। কে আছে বাইরে। এস—এস। আমাকে আবার দেবব্রতবাবুর সঙ্গে যেতে হবে। এস এস।

একে একে রোগী দেখছিল আশু। হঠাৎ কোলাহল প্রবল হল। হঠাৎ সতীশ ঘোষালের কণ্ঠস্বর নীরব হল। বাইরে থেকে কে বললে —গেল—গেল বোধ হয়! বেচারা রোগা মানুষ। থরথর করে কাঁপছে যে!

সত্যই হুঙ্কার দিতে পারে নি, কাঁদতে পারে নি ঘোষাল, কিন্তু মর্মান্তিক ক্ষোভে দুঃখে অসম্মানে থর থর করে কেঁপেছিল—কেঁপেছিল আপন অজ্ঞাতসারেই। চেয়েছিল সে পাথর হয়ে যেতে কিন্তু মানুষ পাথর হয় না।

দেবব্রত এবং আশু দুজনেই বাইরে এসে এই অবস্থা দেখে এক সঙ্গেই লাফ দিয়ে পড়েছিল বারান্দা থেকে। দুজনেই তরুণ। ছুটে গিয়েছিল এগিয়ে। আরও একজন এসেছিল ওপাশ থেকে, সুরেশ্বর মুখুজ্জে—সতীশের আত্মীয় ও প্রতিবেশী। প্রৌঢ়ত্ব পার হয়েছে কিন্তু এখনও সক্ষম এবং স্বাস্থ্যবান। মানুষটির রঙটি কটা। দূর থেকে রঙ দেখে চেনা যায়। সে বলেছিল—করছ কি? তোমরা করছ কি?—না—না।

বলতে বলতে দেবব্রত এসে পতনোন্মুখ সতীশকে ধরে ফেলল।

ওপাশে থেকে সুরেশ্বরও ঠিক সেই সময়ে এসে উপস্থিত হল—সতীশ! সতীশ!

সতীশের ঠোঁট দু'টি কাঁপল। চোখ থেকে দু'টি ধারায় জল গড়িয়ে পড়ল একটিবার। দুবার নয়।

কিছুক্ষণ পর সুস্থ হলে—সুরেশ্বর সতীশকে বাড়ী নিয়ে গেল। আশু বললে ভয় নেই। তবে এখন তিনচার দিন ওঠা হাঁটা বকাঝকা করবেন না।

সুরেশ্বর বললে—শুনীল তো।

গম্ভীরভাবে সতীশ বললে—শুনলাম।

—হ্যাঁ। চল তা হলে বাড়ী চল। ডাক্তারের কথা শুনে ঘরে শুয়ে থাকবি। কি দরকার এই সব গাঁয়ের লোক শাসনে বল্ তো।

—তুমি বুঝবে না। গোলামী ক'রে ক'রে মনটা তোমার গোলাম হয়ে গিয়েছে।

সুরেশ্বর বললে—মারে গালে ঠাস করে এক চড় !

সতীশ বললে—তা তুমি মারতে পার, তুমি গুরুজন। কিন্তু সত্য বলেছি আমি।

—বেশ। তাই হল। চোরা না-শোনে ধর্মের কাহিনী! চল বাড়ী চল—মা শুয়ে শুয়ে চেঁচাচ্ছে—ওগো সতীশকে আমার বাঁচাও গো। পরিবার বেচারা গলির মুখে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। আমি মাঠ থেকে এসে শুনে ছুটে আসছি।

সুরেশ্বর একটি নির্বিরোধী মানুষ। যা এ সংসারে বিরল। একান্ত-ভাবে নিঃস্বপ্রায়—এক মধ্যবিত্তের ঘরে জন্ম। লেখাপড়া সে আমলে সেকেণ্ড ক্লাস পর্যন্ত; কিন্তু দুটি জিনিস তার সম্বল ছিল—অটুট সবল স্বাস্থ্য। সে স্বাস্থ্য হিংসা করার মত স্বাস্থ্য। একাল হলে সে অলিম্পিকে যেতে পারত। সে যোগ্যতা তার ছিল। দৌড়ে, হাই-জাম্প—লঙ-জাম্পে ফুটবলে আশ্চর্য কৃতিত্ব ছিল। আর ছিল—কর্মে নিষ্ঠা এবং এই নির্বিরোধী চরিত্রমাধুর্য। এই দুটি মূলধনেই সে এখানকার এই চন্দনপুরের সামন্ততন্ত্রের শেষ ব্যাঘ্র বাঁড়ুজ্জে বাড়ীর বড়বাবুর অধীনে কাজ করেছে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর। ঢুকেছিল সামান্য বেতন পাঁচ টাকায়। শেষ সে হয়েছিল হিসাববিভাগের কর্তা। শুধু জমিদারী নয়, তার সঙ্গে ব্যবসা। বিরাট ব্যবসা। বেতন হয়েছিল

দেড়শো টাকা। দেশ স্বাধীন হল—তার সঙ্গে একটি আশ্চর্য সামঞ্জস্য রেখে এই সামন্ততন্ত্রী ও ব্যবসায়ী পরিবারটি মুখ থুবড়ে পড়ল। তখনও সুরেশ্বর তাদের ছাড়ে নি। তারপর ছেড়েছে। এমন এই নির্বিরোধী মানুষটি শুধু এই একটি গুণেই গ্রামের মধ্যে সকলের কাছে ভালবাসার পাত্র হয়ে বেঁচে আছে। শ্রদ্ধাও আছে সে ভালো-বাসার মধ্যে কিন্তু সে তা চায় না। শ্রদ্ধার প্রতি বা প্রতিষ্ঠা-সম্মানের প্রতি তার সত্যই মোহ নেই। সেই কারণেই সে অনায়াসে সতীশ ঘোষালের মত লোককেও বলতে পারে—মারে গালে ঠাস করে এক চড়। এবং ওই কথার মিষ্টতার জন্যই সতীশের মত লোকও বলে—তা তুমি মারতে পার। তুমি গুরুজন।

পথে সুরেশ্বর বললে—দেখ্ তো কি কাণ্ড করলি।

—কি করলাম?

—কি করলি? মরতিস্ যে!

—মরতাম যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের মত।

—কথায় বলে—নড়তে নারে বন্দুক ঘাড়ে। তোর সেই বৃত্তান্ত। এদিকে তো ঠেঙা ভিন্ন হাঁটতে পারিস না। মরদ আমার লড়ুয়ে সেপাই। আর যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিক—কিসের জন্যে যুদ্ধ করতে গিয়ে-ছিলি? কার পক্ষ নিয়ে? অমর চক্কোত্তির?

—তা বলে ছোট লোক—

—কে ছোট লোক? তুই নিজে কি বলিস? বলিস নি হাজার দিন—এই তো কালই বলেছিলি—ওই গোপাল চৌধুরীর কথায়—ছোটলোক কেন বলবে ন্যাড়াকে? ছোটলোক কিসের? গরীব বলতে পার। বলিস নি?

চুপ করে রইল সতীশ এবার। সুরেশ্বর বললে—তোর তো আসল কথা—দে'কে নিয়ে। শিবু দে'র নাম।

সতীশ ফোঁস করে উঠছিল—কিন্তু সুরেশ্বর বললে—চুপ কর—এত লোকের সামনে আর—থাক।

বি. ডি. ও'র সামনে তখন লোকারণ্য। দূরে একটা প্রবল সমবেত কণ্ঠের চীৎকার শোনা যাচ্ছে। মিছিল আসছে। কম্যুনিস্ট এম.এল.এ. মিছিল নিয়ে আসছে—লোন আদায়—

—বন্ধ করো, বন্ধ করো।

—ইনকিলাব—

—জিন্দাবাদ।

সতীশ দাঁড়িয়ে গেল।

সুরেশ্বর বললে—দাঁড়ালি কেন?

সতীশ বললে—দেখেছ?

—কি?

—ওই আসছে—। সে আঙুল দিয়ে দেখালে দূরের মিছিলটাকে।

সুরেশ্বর বললে—মিছিল—। তা, ওর আর কি দেখবি?—

সতীশ বললে—দাঁড়াও না। দেখি।

আজ সে জনতার একটা অবশ্য আশ্চর্য রূপ দেখেছে।—সে রূপ—মানুষের মাথা গুনে বা মাথার সমাবেশে দেখা যায় না। দেখা যায় অকস্মাৎ।

নসু—ছুটেই প্রায় পালাচ্ছিল—ওই মিছিলটা দেখে।

॥ ১২ ॥

আশু সিংহী চলেছিল দেবব্রতের সঙ্গে। চন্দনপুরের দক্ষিণ প্রান্তে একেবারে কোপাই নদীর ধারে—ছোট একটি আশ্রম তার। উনিশ শো সাতচল্লিশ সালে এসে এখানে কিছুদিন ছিল—চণ্ডীতলায় তারপর নিয়েছিল চাকরী—চাকরী নিয়েছিল ওই বড়বাবুদের পড়ো এস্টেটে। তারপর ওদের কাছে জমি নিয়ে আশ্রম করেছে। একা মানুষ। ওখানে আছে ব্রাত্যপল্লী। তাদের মধ্যেই বাস করে। নাইট ইস্কুল করেছে, নিজের হাল গরু আছে—কিছু জমি আছে, চাষ করে, মুর্গী

হাঁস পোষে আর পড়ে। ব্রাত্যদের সুখ দুঃখের ভাগ নেয়। আগেকার কাল হলে লোকে বলত এনার্কিস্ট। এখন সহজ রটনা কম্যুনিস্ট। দেবব্রত নিজে বলে—না। তা আমি নই। হলে বলতাম ওতে লজ্জারও কিছু নেই ভয়েরও নেই। কারণ স্বদেশী রাজ্যে যদিই সরকার আটক আইনে ধরে তবে দশ পয়সা দশ আনা নয় অনেক বেশী খরচ করে আরামে জেলখানায় রাখবে এবং অসম্মান করবে না। এতেও প্রশ্ন অনেকে করে—তাহলে আপনি কি? কেন—এইভাবে রয়েছেন ব্রাত্যদের মধ্যে?

দেবব্রত বাঁকা জবাব দেয় না, সোজা জবাব দেয়। দেখুন, আমি গোড়া থেকে রামকৃষ্ণ মিশনে মানুষ। এসব আমার ভাল লাগে।

তবু সন্দেহ মেটে না—সন্দেহ এও অনেকে করে যে, এইভাবে ওদের মধ্যে থেকে—হয়তো একদা ওদের ভূ-সম্পত্তি গ্রাস করবে। কেউ সন্দেহ করে হয়তো ব্রাত্যনারীবিলাস অন্যতম কারণ। কেউ অনেক দূর পর্যন্ত দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখতে পায়, একদিন ওই লোকটি এখানকার এম. এল. এ. হয়ে দাঁড়িয়ে ধ্বনি তুলেছে—ইনকিলাব—

লোকে বলছে—জিন্দাবাদ।

এখানকার কংগ্রেসী প্রধান ভবানীকিঙ্করের সঙ্গে যথেষ্ট প্রীতি কিন্তু দেবব্রতের। বিশেষ করে একটি জায়গা আছে, যেখানে উভয়ে এক নেশায় আসক্ত দুই নেশাখোরের মত বন্ধু। সেটি হল ফুলের চাষ। ভবানীকিঙ্করের পৈত্রিক বাড়ীর ঘর যত ভাঙছে, তত জায়গা বাড়ছে এবং তত সে ফুলগাছ লাগাচ্ছে। দেবব্রতের জায়গা অনেক। পড়ো প্রান্তর। তার মধ্যে ফুলের বাগান সেও করে। এ ওকে চারা দেয়। ও একে চারা দেয়। বিশেষ করে ডালিয়া।

আজ একটি ব্রাত্য চাষীর অসুখ কঠিন হয়েছে। তাই সে আশু সিংহীকে নিয়ে যাচ্ছে। প্রৌঢ়েরা বয়স্কেরা বিষয়ীরা যে সন্দেহই করুক দেবব্রতকে—গ্রামের তরুণেরা দেবব্রতকে ভালবাসে। ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব তার অনেকের সঙ্গে।

দুজনেই সাইকেলে চলছিল। সকালের এই ঘটনাটির সঙ্গে দুজনেই খানিকটা জড়িয়ে গিয়েছে। কথা ওই নিয়েই হচ্ছিল। পথে আজ ভিড় অনেক। বি. ডি. ও. অপিসের ভিড়—হাটের ভিড়—মিছিলের ভিড়। এখানে এম. এল. এ.'র যেখানে যত কর্মী আছে সকলেই কিছু লোক এবং লাল ঝাণ্ডা নিয়ে আসছে। ধ্বনি দেবে—তারপর মিটিং হবে।

দেবব্রত বললে—আর বেশী একটু হলেই ভদ্রলোক বোধহয় মারা যেতেন—না?

আশু বললে—ব্লাড্-প্রেসার আছে। বলা তো যায় না! তবে প্রেসারের চেয়ে মনের ব্যাপারটাই ওঁর বেশী। কমপ্লেক্সেই খেলে ওঁকে। কমপ্লেক্স, ফ্রাস্ট্রেশন দুই মিলে—উনি এমন হয়েছেন। হাঁটতে সম্ভবত উনি বেশ পারেন—তবে মনের ধারণা হয়ে গেছে—পারেন না। না ধারণা করে উপায় নেই। কারণ উনি তো সবই পারেন বা পারতেন—কেবল রোগের জন্যেই পারছেন না।

দেবব্রত বললে—অমর চক্রবর্তী কিন্তু চালাক, সে কখন সরে পড়েছে।

—নিশ্চয়! পলিটিক্স করে। সে উদো- তার পিণ্ডি যখন বুদো খেতে বসেছে, তখন তো বেঁচে গেছে। আবার থাকে! অ্যাণ্ড হি সেণ্টেড ইট। সে তো জানে যতই সে শিবু দে'র নাম করে গাল দিক—মেয়ে যখন তার এখানে—তার জোর ক'রে বিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে--পেয়েছে, তখন সে এখানে কোন সিম্প্যাথি পাবে না!

—জাঁদরেল মেয়ে।

—মেয়ে ভাল। পড়ায় ভাল; দু বছর ফেল করলে তার কারণ বাপ। মেয়েটি সাইকেল চেপে ইস্কুলে আসত। এই চন্দনপুরে। তা থেকেই বুঝছেন—দুঃসাহসিকা! হেসে বললে—কে জানে ঠিক হল কিনা! -তা বাপ পড়তে সময় না দিলে কি করবে? বই না পেলে কি করবে? মেয়েটি গান গায় ভাল। বাপও কৃতী লোক।

অনেক পার্টস ছিল। তিরিশ সালে জেল হয়েছিল। দেশপ্রেম ছিল। থিয়েটার করত ভাল। গান জানে। তারপর ছেতরে গেল। বেয়াল্লিশ থেকে হল কম্যুনিস্ট। তারপর বাহান্ন সালে কংগ্রেস। মেয়েটিকে গান শিখিয়েছিল। মিটিংয়ে নিয়ে যেত— গাইত। মিটিংএ মিটিংএ ঘুরেছে মেয়ে। ও তো বাপের বিত্তের গোড়া পর্যন্ত যায় নি। সে আদর্শবাদে মশগুল। ও মশাই আগুন হবে দেখবেন। মেয়ে থিয়েটার ক'রে ভাল। আরে—আরে—। গরু জোড়াটা সামলাও ভাই গাড়োয়ান।

সামনে কয়েকখানা গাড়ী যাচ্ছে। তরকারী বোঝাই গাড়ী। একজন গাড়োয়ান কিছুতে তার গরুকে বাগাতে পারছে না। গরু দুটো চকিত হয়ে উঠেছে। আশু নেমে পড়ে বললে—নামুন। নেমে পার হওয়াই ভাল। একবার পোস্টাপিসটাও দেখে নিই। দাঁড়ান।

দেবব্রত বললে—চলুন। আমারও পোস্টকার্ড কিনতে হবে।

পোস্টাপিসে এখন অনেক চিঠি, অনেক কাজ। প্রায় সত্তর আশী বছরের পুরনো পোস্ট আপিস। আগে অধীনে দুটি ব্র্যাঞ্চ আপিস ছিল; এখন দশ-বারোটা। তার সঙ্গে টেলিগ্রাফ হয়েছে আজ কয়েক বছর। এখন নতুন টেলিফোন লাইন বসছে। আজ হাটবার —অনেক লোক আজ ডাকটিকিট পোস্টকার্ড কিনবে। ডাক্তার গিয়ে দাঁড়াল। এবং বললে—নাও বিপদ!

জানালার ধারে পোস্টমাস্টারের সামনে দাঁড়িয়ে আর্যকুমার রায় যথারীতি বক্তৃতা করছে। ইংরিজীতে বক্তৃতা—অর্থহীন বলেই মনে হয়। কিন্তু অর্থ একটা আছে— আই বেগ টু সে স্যার—ইউ পোস্টমাস্টার—দ্যাট— এ্যাজ ইন দি পোস্টাল ল— এ্যাণ্ড এ্যাজ ইন দি পেনাল কোড—অল লেটারস—রেজিস্টার্ড লেটারস—মনি অর্ডারস ইনসিওরস এ্যাড্রেসড এ্যাজ ইন দি নেম অব নিউজিল্যাণ্ড কোল কোম্পানী—এ্যাজ ইন দি নেম অব ইস্ট রায় ডি কলিয়ারী—এ্যাজ ইন দি নেম অব পিওর রায় ডি কোল কোম্পানী—এ্যাজ ইন দি রেজলুশন অব দিজ কোম্পানীজ শুড বি গিভন টু শ্রীআর্যকুমার রায়।

এই 'অ্যাজ ইন দি'র সুতোয় গাঁথা একটি বক্তৃতা। এটি আর্যকুমার নিত্য পোস্ট আপিসে এসে একবার আউড়ে যাবে। এবং শেষে চাইবে —কি আছে দাও। থাকে না কিছুই। তখন এখান থেকে থানায় গিয়ে একবার এই বক্তৃতাই করবে। তার সঙ্গে থাকবে—এখানে পোস্ট আপিসে একটি ষড়যন্ত্র রয়েছে। যার জন্য তার প্রাপ্য চিঠিপত্র সব এরা দিচ্ছে ব্যানার্জি বাবুদের। নিশ্চয় ভাগাভাগি আছে। অবিলম্বে পোস্ট আপিসের পোস্টমাস্টার পিওন এমন কি রানারদের পর্যন্ত অ্যারেস্ট করা হোক।

তারপর গিয়ে বসবে নিজের বৈঠকখানায়। বিড়বিড় ক'রে বকবে এবং রাস্তায় ভদ্রজন যাকে দেখবে--ডেকে বলবে—একবার থিয়েটার করুন। আমার বইটা খুব ভালো হয়েছে। আপনার একটা পার্ট আছে।

অবস্থান্তরের জন্য ভদ্রলোকের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তার জন্যও দায়ী এই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা!

আশু ডাক্তার ডাকবিলির দরজায় দাঁড়ালে এবং বললে—রোজ কি ভাল লাগে! কতক্ষণ আরম্ভ করেছে? শেষ হ'তে দেরী কত?

ডাক্তারের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দরজায় ঝুঁকে প্রায় ঠেলে এসে দাঁড়াল একটি মেয়ে।

—একটু সরুন।

ডাক্তার ঠেলা বা ধাক্কা খেয়ে মুহূর্তের জন্য আধুনিকা মেয়েদের উপর বিরক্ত হল—নাঃ এরা বড়ই বাড়াবাড়ি সুরু করেছে। কিন্তু তার ভাবনাটা শেষ হওয়ার আগেই মেয়েটি জিজ্ঞাসা করলে—টেলিগ্রাফ কখন থেকে হবে? কাউন্টার কটার সময় থেকে খুলবে?

ডাক্তার কণ্ঠস্বর শুনে ঝুঁকে তার মুখের পাশটা দেখে সবিস্ময়ে বললে—নেলী?

গোপাল চৌধুরীর মেয়ে নেলী। নেলী নিজে পোস্ট আপিসে,—

টেলিগ্রাম করতে এসেছে !—মুহূর্তে প্রশ্ন বেরিয়ে এল মুখ থেকে—টেলিগ্রাম ! বাবা কেমন আছে ?

—ভালো। তারপরই বললে—সেই রকমই বিড়বিড় করে বকছে।

—ও ক্রমে ভাল হবে। কিন্তু তুমি নিজে এসেছ পোস্ট আপিস। টেলিগ্রাফের সময় জানতে চাচ্ছ ! ব্যাপার কি ?

—কিছু নয়। ছুটো টেলিগ্রাম করব।

—আরজেণ্ট না অর্ডিনারী ? আরজেণ্ট হলে এখনি হবে।

—ছুটোতে কত লাগবে ?

—যা লাগুক, ভাবতে হবে না তোকে, দে আমাকে দে ! নতুন কণ্ঠস্বর। পিছন থেকে বললে কেউ।

আর কেউ নয়—নেলীর জ্ঞাতি কাকা। নিত্য চৌধুরী।

—আয় আমার সঙ্গে বাইরে আয়। ডাক্তার একটু এস তো ভাই। একটা টেলিগ্রাম ছকতে হবে। আমাদের তো বিদ্যে সেই সে আমলের ফার্স্ট ক্লাস পর্যন্ত। তাও বসে বসে—না-পড়ে সব ভুলে মেরে দিয়েছি। এস।

বাইরে এসে নিরিবিলি একটা কল্কেফুল গাছতলায় দাঁড়িয়ে—নিত্যবাবু টেলিগ্রামের খসড়াখানা নিয়ে ডাক্তারের হাতে দিলে।

'শুভেন্দু ফ্লেড ফ্রম হোম—ক্যাচ হিম—ইফ হি গোজ টু ইউ। প্লিজ ! এ্যাণ্ড ওয়্যার। গোপাল চৌধুরী।'

আশু সবিস্ময়ে নিত্য চৌধুরীর মুখের দিকে তাকালে। সে দৃষ্টি তার সপ্রশ্ন। প্রশ্নটি মুখে বলতে সঙ্কোচ বোধ করছে। কোথায় যেন একটা কিছু রয়েছে। যাকে যুক্ত করা যায় ওই অমর চক্কোত্তির পালিয়ে আসা কন্যাটির সঙ্গে। ফ্লেড কথার মানে কি তা নইলে ?

নেলী মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে পায়ের নখ দিয়ে মাটিতে গর্ত করতে চাইছিল। সেকাল হ'লে স্বচ্ছন্দে ব্যাখ্যা করে বলা যেতে পারত—মনে মনে বলছে—মা ধরিত্রী গহ্বর বিস্তার ক'রে আমাকে গ্রাস কর, আমি লুকিয়ে বাঁচি। কিন্তু সে যখন ঘরের দেওয়ালের

আত্মগোপনের আশ্রয় পরিত্যাগ করে এই সংবাদ 'তারে-তারে' দিগ্‌দিগন্তে ছড়াতে এসেছে—তখন ওকথা অচল।

নিত্য চৌধুরী বললে—দেখো না, বিপদের ওপর বিপদ! দাদার ওই অবস্থা আর শুভেন্দু পালিয়েছে। কাল সিউড়ি গিয়েছিল—জমিদারের কম্‌-পেনসেসনের আড়াইশো টাকা পাবার দিন ছিল। আজ সকালে ফিরবার কথা আমার কর্মচারী মিশ্রও গিয়েছিল সিউড়ী। তার হাতে দেড়শো টাকা আর এক চিঠি খামে ভ'রে দিয়ে বলেছে -আমি একবার কলকাতা যাচ্ছি। বলবেন বাড়ীতে। চিঠিতে লেখা—ভাগ্যের সন্ধানে আমি বাহির হইতেছি—আমার জন্যে ভাবিবেন না। ভাগ্য ফিরাইতে পারিলে ফিরিব। নইলে মৃত্যুকালে শক্তি থাকিলে সংবাদ দিব। সুখেন্দুকে ভাল করিয়া পড়িতে বলিবেন। ইতি শুভেন্দু!

অবাক হবার কিছু নেই। শুভেন্দু থিয়েটার পাগলা—ওই পাগলামীতেই পাশ করতে পারে নি। কিন্তু এদিকে কোন বদখেয়াল অভদ্রপনা তার ছিল না। ডাক্তার থেকে পাঁচ বছরের জুনিয়ার ছিল ইস্কুলে। বয়সে বছর তিনেকের ছোট। ডাক্তারদের সময়ে ইস্কুলের অভিনয় টিমে ওই ছিল হিরো। সে তাকে ভাল ক'রেই জানে। তার স্বপ্ন ছিল—সে সিনেমায় নামবে—কলকাতার থিয়েটারের অভিনেতা হবে। চেষ্টাও এর মধ্যে কম করে নি। ডাক্তার যখন মেডিকেল কলেজের ছাত্র, তখন সে কলকাতায় গেলে তার হোস্টেলে যেত এবং গল্প করত—কোন্ কোন্ স্টুডিয়োতে গিয়েছিল—কার কার সঙ্গে দেখা হ'ল। কে কি বললে--সেইসব কথা। শেষ একবার বলেছিল—নাঃ; ও আর হল না। বুঝলি আশু!

সে জিজ্ঞাসা করেছিল—কেন রে?

—কাল যা দেখলাম ভাই! আর শুনলাম! নাঃ—।

—কি দেখলি রে—কি শুনলি!

শুভেন্দু, বলেছিল—সে কাল গিয়েছিল ইউনিভারসিটি ইনস্টিস্টুটে

বড় একজন অভিনেতা ডিরেক্টার সিনেমার গল্পকারের স্মৃতিসভায়। সভাপতি ছিল—তাদেরই শ্যামাকিংকরবাবু। আর বড় বড় ডিরেক্টার সিনেমাস্টাররা ছিল প্রধান অতিথি বক্তা—উদ্বোধক এইসব। সভার শেষে সে শ্যামাকিংকরবাবুর সঙ্গে দেখা করবে এই মতলবে গেটের কাছে দাঁড়িয়েছিল। সভায় সিনেমাস্টার ডিরেক্টাররা শ্যামাকিংকরবাবুকে যে খাতির দেখিয়েছিল, তাতে তার ভক্তি বেড়েছিল শ্যামাকিংকরবাবুর উপর। এবং বুঝতেও পেরেছিল যে শ্যামাকিংকরবাবু যদি ভাল ক'রে বলে টলে দেন—তবে নিশ্চয় সে পার্ট পাবে। ফিল্মেও পাবে—থিয়েটারেও পাবে। গেটের পাশে ভিতরে বাইরে লোকে জ্যাম করে দাঁড়িয়ে গেছে। ফিল্ম ডিরেক্টারেরা বের হয়ে গেল—যেতে দিন—যেতে দিন। তাদের যেতে দিল—তবুও কাউকে বললে—ওরে—'রাধা'র বাবা যাচ্ছে রে। মানে রাধা ছবির ডিরেক্টার। কাউকে বললে—'বড় বউ'য়ের শ্বশুর যাচ্ছে। তারপর এক এক ফিল্ম অ্যাক্টর বেরোয় আর হৈ—হৈ ওঠে।—হা—! অমুক! ও দাদা! দাদামনি হে! এই যে—প্রেমের ঠাকুর! ও—কালাচাঁদ! শেষকালে এল—সব থেকে বড় অ্যাক্টর। সে যেন ফুটবল ম্যাচে গোলে বল ঢুকে গেল!—এ—ই! তারপর সে যেন আমাদের দেশে নন্দোৎসবের নৃত্য। তিনি প্রথমটা হাসিমুখে হাত জোড় করে দাঁড়ালেন। নমস্কার করলেন। বললেন—যেতে দিন দয়া ক'রে। কে কার কথা শোনে—? কেউ বলে—দাদা। কেউ বলে—ভাই ও ভাই। কেউ বলে—ও মানিক—কেউ কোন বইয়ের নায়কের নাম ক'রে ডাকে। কেউ গান ধরে দেয়—যে গান ছবিতে তার মুখে শুনেছে। তিনি এবার একটু কড়া সুরেই বললেন—এ কি? যেতে দিন! রাস্তা দিন।—পথ ছাড়ুন। বাস· আর একখানা বল ঢুকল গোলে।—রেগেছে। একজন এগিয়ে গিয়ে তার জামার হাত ধ'রে, টানে সঙ্গে সঙ্গে কেউ টাই ধ'রে, কেউ কোটের পিছন চেপে ধরল। এরপর কি হ'ত বলা যায় না। কিন্তু

এই সময় বেরিয়ে এলেন শ্যামাকিংকরবাবু। সঙ্গে আরও কয়েকজন নাম করা লোক। তাঁরা এসে হাত জোড় করে বললেন—পথ দিন। যেতে দিন। তারা শান্ত হল—পথ দিলে। যারা নাচছিল তারা আর একরকম হয়ে গেল। ওঁরা বেরিয়ে গেলেন। তার সঙ্গে পথ পেয়ে অ্যাক্টর ভদ্রলোকও বেরিয়ে গেলেন। এঁরা গাড়ীতে গিয়ে চড়লেন। চলে গেলেন। কিন্তু অ্যাক্টর ভদ্রলোকের পিছনে লোকে ধাওয়া করলে তাঁর গাড়ী পর্যন্ত। ইনি শ্যামাকিংকরবাবুর থেকে অনেক জনপ্রিয়। অনেক। অনেক। কিন্তু—।

ঘাড় নেড়ে শুভেন্দু বলেছিল—ভালোবাসা প্রেম হলে রাহুর প্রেম। গিলে খায়। রবীন্দ্রনাথের একটি গান আছে—তোমার প্রেমে আঘাত আছে নেইকো অবহেলা। এদের ভাগ্যে দেখলাম প্রেমের সবটাই যেন অবহেলা না হোক, ব্যঙ্গ-কৌতুকে ভরা। শুধু চারজন বাদ। দেখেছি ভাদুড়ী মশাইকে। বাপ রে—কি চাউনি!

একটু থেমে প্রসঙ্গটার অন্য পর্যায়ে এসে বলেছিল—শ্যামা-কিংকরবাবুর বাড়ীও গিয়েছিলাম। খুব আদর করলেন। বললেন—কি খবর বল? আমি বললাম—সিনেমায় নামার কথা। তিনি বললেন—দেখ তুমি ভাল পার্ট কর আমি শুনেছি। কিন্তু সেখানকার ভালো এখানকার ভালো তো এক নয়, এটা তো মানবে। তা ছাড়া একটা গোড়ার কথা বলি। বল তো পৃথিবীতে নাচে কে—গায় কে? আমি হতভম্ব হলাম। কি বলছে?—তারপর বললাম—মানুষ? তিনি বললেন—না। নাচে রূপ—গায় স্বর—সুস্বর। কুস্বর যার তার গান কেউ শোনে না। আর যার রূপ নেই কুরূপ সে যতই ভাল নাচুক কেউ দেখে না! রূপের দুটো দিক—একটা স্বাস্থ্য—অন্যটা শ্রীসুষমা। তোমার শরীর এমন রোগা, তাতে কোন্ পার্ট করবে। আগে শরীর ভাল কর। আরও কথা আছে। পড়তে হবে। না পড়ে বড় অভিনেতা হওয়া যায় না। তোমাকে তো চরিত্রটিকে বুঝতে হবে—ক্যারেক্টার অ্যানালিসিস করে। পড়,

শরীর ভাল কর। তা ছাড়া আরও একটা কথা বলি—।

ছবির নায়কের ছবির জীবন আর অভিনেতার বাস্তব জীবন এক নয়। মোট কথা—খুব সুখের ক্ষেত্র নয়। ছবিটা হয়তো স্বর্গ—কিন্তু অভিনেতারা মাটির মানুষ।

উত্তর কিছু দিতে পারে নি। ফিরে এসে পথে তার কাছে ওই কথাগুলি বলে বলেছিল।—নাঃ, ও আর হল না। বুঝলি আশু।

পরের বছর শুভেন্দু প্রাইভেটে ম্যাট্রিক দিয়ে পাশ করেছিল। কিন্তু বাড়ীর সামর্থ্যের অভাবে আর কলেজে পড়তে পায় নি। নানান চেষ্টা করেছে। অর্থোপার্জনের চেষ্টা। ব্যবসার যুগ। ব্যবসা করতে চেষ্টা করেছিল। এটা ওটা সেটা।—কিন্তু সবেতেই ব্যর্থ হয়েছে। কিছুদিন চাষী হবার চেষ্টা করেছিল নতুন মতে। নদীর ধারে চৌধুরীদের অনেক জমি—সেই জমিটা কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে নদী থেকে জল তুলবার জন্যে মোটর পাম্প কিনে চাষ করেছিল। ছোট একখানা ঘরও করেছিল। সেখানে সারাদিন থাকত। বই রাখত, পড়ত। চাষে ফসলও ফলল। কুমড়ো কপি হল বড় বড়। এখানকার চণ্ডীতলার মেলায় এখন এক্‌জিবিশন হয়—সেখানে শুভেন্দুর কপি কুমড়ো ফার্স্ট হয়ে সার্টিফিকেটও পেয়েছিল। কিন্তু হিসেবনিকেশে দেখা গেল—টাকার অঙ্কে লোকসান ঠিক না হলেও—পাম্পের দাম যা ইনস্টলমেণ্টে দেবার কথা, সে সব বাকী পড়েছে। সুতরাং—কোম্পানী আদালত মারফৎ নোটিশ করে পাম্প কেড়ে নিয়ে গেল, সময় তিনমাস রইল, যার মধ্যে টাকাটা শোধ করলে, পাম্পটা ফিরে পাওয়া যাবে। বারোমাসের বারশো টাকা তার উপর সুদ আদালত খরচা নিয়ে আঠার শো টাকা। কিন্তু সে টাকা যোগাড় হল না। হয়তো চেষ্টা করলে হ'তে পারতো, কিন্তু গোপাল চৌধুরী সে হতে দিলে না। চাষ করার বিরোধী সে গোড়া থেকেই। গোড়ায় বলত—ওতে কি হবে? চাষা হবি শেষে চৌধুরী বাড়ীর ছেলে।

এখন বললে—যা দিয়েছি যথেষ্ট দিয়েছি। আর এক ছটাক জমি

কি গহনা আর আমি দেব না। বারো-চৌদ্দ বছর লেখাপড়া শিখে শেষে চাষ। চাষা হবি তো লেখাপড়ার কি দরকার ছিল ?

ইদানীং মোক্তারী পরীক্ষার জন্যে তৈরী হচ্ছিল শুভেন্দু। গোপাল চৌধুরী তাতেও খুশী হয় নি। বলত—ওতে কি হবে! চামচিকে পক্ষী হয়? দূর!

তবে?

তবের উত্তর গোপাল চৌধুরী দিতে পারে নি। সে উত্তর জানে না। তবে একটি কথা জানত, বলত—ভগবানকে ডাক। তিনি পথ দেখাবেন। আমি কি করে বলব?

এই ঘটনার পর কিন্তু চৌধুরীর ও কথাগুলোও পালটে গেল। সে স্ত্রীর মুখের সামনে হাত নেড়ে বলেছে—কচু—কচু কচু। ধর্ম—দেবতা ভগবান—বাজে—মিছে—কচু।

শুভেন্দু সেই কারণেই ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়েছে। —হয়তো ভগবানই পথ দেখিয়েছেন! বিচিত্র!

নিত্য চৌধুরী আশু ডাক্তারকে বললে—এইটেই গুছিয়ে লেখো টেলিগ্রাম। নেলা ইতিমধ্যে একটা খসড়া এগিয়ে দিলে। নিত্য চৌধুরী জিজ্ঞেস করল—এটা কে লিখলে রে নেলী? তুই?

নেলী তেমনি মাটির দিকে মুখ করেই পায়ের নখে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে বললে—আমি আর সীমা।

—সীমা? অমর চক্কোত্তির মেয়ে?

—হ্যাঁ।

—সে কিছু জানে নাকি কোথায় গিয়েছে? জানেটানে কিছু। তাকে চিঠিটিঠি দিয়েছে নাকি?

—না। সে কিছু জানে না। আমি জানি সে জানে না। ওর সঙ্গে আমার খুব ভাব।

—কোথা কোথা টেলিগ্রাম করবি?

—মামার বাড়ী—কলকাতায় মেজদার কাছে।

- মানে রঞ্জনের কাছে? হ্যাঁ তা যেতে পারে।

রঞ্জন নিত্য চৌধুরীর ছেলে—ডাক্তারী পড়ে।

নেলী বললে—আর—

নিত্য জিজ্ঞেস করল—কে?

-- শ্যামাকিংকরবাবুর কাছেও যেতে পারে।

—পারে।' ঠিক ঠিক! তা লেখো ডাক্তার। ফর্ম আনি তিনটে।

লিখতে লাগল ডাক্তার।—বল, ঠিকানা বল নেলী। আমি শ্যামকিংকরবাবুরটা লিখে নিচ্ছি। ক্যালকাটা টু। শুভেন্দু মিসিং। ডিটেন ইফ গোজ টু ইউ। ওয়্যার—কার নাম দেব? গোপালবাবুর?

—না কাকার নাম দাও।

—তাই ভাল। টেলিগ্রামের উত্তর এলে তোমার বাবার মাথা খারাপ হবে।

ডাক্তার দ্বিতীয় ফর্ম টেনে নিলে। কি বললে—ঠিকানা বলুন -

—রঞ্জন চৌধুরী—মেডিকেল কলেজ হোস্টেল—লেখো।

ডাক্তার তখন থেমে গেছে। সামনের দিকে তাকিয়ে আছে—যেন সাধারণ যা দেখতে পায় না তেমন কিছু সে দেখতে পেয়েছে। একটি স্মৃতির টুক্‌রো ছবি হয়ে সামনে ভেসে উঠেছে। মনে পড়ে গেছে একটা কথা। এই তো আটমাস আগে। সবে তখন পাম্পটা কেড়ে নিয়ে গেছে কোম্পানী; শুভেন্দু বেকার হয়েছে, সেই সময় একদিন তার ডাক্তারখানায় বসে খুব হাসতে হাসতে বলেছিল—বলেছিল—বল্‌তো আশু, সত্যিই পটাসিয়াম সাইনাইডে যন্ত্রণা হয় না? আর ধর অন্য বিষে যখন অজ্ঞান হয়ে স্পাজ্‌ম্ হয় তখন যন্ত্রণা-বোধ থাকে?

শঙ্কিত হয়ে আশু বলেছিল—কেন? এ খোঁজ কেন? খাবি-টাবি নাকি?

—তুই বল্ না।

—না। কিন্তু হল কি বল? প্রেম?

—দূর! প্রেম-ট্রেম দূর অস্ত। ভাবছি বেঁচে কি করব।

—ভাবিস নে। অবস্থা ভাল হবে-- বিয়ে হবে—

—দূর। ওইটুকুতে কি হবে?

—তবে পলিটিক্স কর, মন্ত্রী হবি।

—ভাগ—পুরনো আমলের পলিটিক্স করে সুখ ছিল, ফাঁসী গিয়ে আত্মহত্যা করে শহীদ হওয়া যেত। এ আমলে যে সে সব গোলমাল হয়ে গেল। পলিটিক্সে মরা বড় কথা নয়, মারা বড় কথা। নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই—এ কথাটাই বাজে হয়ে গেল। লক্ষপতি কোটিপতি হলেও লোকে গাল দেয় বড়লোক বলে। টাকা পয়সায় রোমান্স নেই। একমাত্র প্রেম করে মরা যায়। তাই বা তেমন প্রেমিকা কই? আমি এতদিনে আত্মহত্যা করতাম। করি না কেন জানিস?

—কি করে জানব—তুই না বললে।

—ওই যে কাগজে লিখবে—শুভেন্দু চৌধুরী দুঃসহ বেকার জীবনের দুর্বিষহ যন্ত্রণা সহ্য করতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন ঐ জন্যে। মরবার মত একটা রোমান্স নেই যে একালে প্রেম আর বেকার যন্ত্রণা বাদ দিয়ে। যদি মরি আমি তবে ওই জন্যেই মরব। লিখে যাব—মরিবার মত রোমান্স নাই বলিয়াই আমি মরিতেছি। বুঝলি?

সেদিন সবটাই পরিহাস বলে মনে হয়েছিল। আশু বলেছিল—একসেলেণ্ট হবে। খুব সেনশেসন হবে। এবং সত্যিই তোকে শহীদ বলবে লোকে।

কথাটা পরিহাসের তাতে সন্দেহ ছিল না সেদিন।

তারপর মনে পড়ল—শুভেন্দুর মুখ; যেদিন সে তার বাবাকে নিয়ে ডাক্তারখানায় এসেছিল গাড়ী করে।

সে তাকে তিরস্কার করেছিল—নিয়ে এলি কেন তুই? আমাকে ডাকলি নে কেন?

শুভেন্দু ম্লান হেসে বলেছিল—আনলাম। একটু হেসে আবার বলেছিল, কথাটা তো চাপা থাকবে না।

—সে থাক আর না থাক তুই আমাকে খবর দিয়ে দেখলি নে কেন ? দেখ তো ভিড়।

—সে ঝগড়া পরে করবি। এখন দেখ।

তারপরই সে বেরিয়ে এসে দরজার বাজুতে ঠেস দিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গোপাল চৌধুরীর মাথায় কয়েকটা চেলা কাঠির কুচি পাওয়া গিয়েছিল। বেঁধে দিয়ে সে শুভেন্দুকে বলেছিল—না-রে, এনে ভালই করেছিলি। এখানে আনায় অনেক সুবিধে হল।

শুভেন্দু উত্তর দেয় নি। কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল।

সেই কথা মনে পড়ে ডাক্তারের কলম থেমে গেল।

নিত্য চৌধুরী বললে—কি হল ডাক্তার ? লেখ।

—লিখছি। সে খস খস করে লিখে গেল। রঞ্জনের ঠিকানা সে জানে। সে ডাক্তার, রঞ্জন মেডিকেল স্টুডেন্ট। সেখানে শুভেন্দু যাবে না। জীবনের প্রতিযোগিতা তার খুড়োদের সঙ্গে বটে—কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী তার রঞ্জন! থাক, সে কথা বলে কাজ নেই।

—বলুন এবার মামার বাড়ীর ঠিকানা।

—বল নেলি।

॥ ১৩ ॥

শুভেন্দুর খোঁজ কোথাও পাওয়া গেল না। সকল জায়গা থেকেই জবাব এল—দুখানা টেলিগ্রামে একখানা পত্রে। পত্রখানা মামার বাড়ীর। সব জায়গার এক খবর—না—শুভেন্দু আসে নি। গোপাল চৌধুরী শুনে খুব বেশী চেঁচামেচি করলে না। কপাল ভাল, ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে আসছে। অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। তবে ভুল হয়ে যায়। নাম ভুল হয়, দশটা কথা বলতে গেলে দুটো তিনটে কথা অসংলগ্ন হয়ে যায়। আশু বলেছে এবং যোগপুরের ধ্রুব ডাক্তার বলেছে ও একটু-আধটু থাকবে। তবে সাবধানে থাকতে হবে।

চৌধুরী চটে উঠল কথাটা শুনে—। জেনেশুনে মরবার জন্যে কেউ অসাবধান হয় নাকি। ডাক্তারগুলোর কি বুদ্ধিশুদ্ধি নেই ?

—না। কোন বুদ্ধি নেই ওদের। ওরা ঘোড়ার ঘাস কাটার উপযুক্ত। তা ভগবানের অবিচার। ওদেরই দালান-কোঠা হয়! আর বুদ্ধিমানেরা ওদেরই ডেকে দুটাকা ষোল টাকা ফি দেয়।

চৌধুরী বৃশ্চিক দংশনের জ্বালায় যেন লাফ দিয়ে উঠতে চাইলে। কিন্তু খচ্ করে কোমরে একটা নিষ্ঠুর যন্ত্রণা অনুভব করে—কাতরে উঠল—ওরে বাবারে। ওরে বাবাঃ রে।

নেলি ছুটে গেল—কি হল বাবা? মাথায়—

—না—না—না। কোমরে! কোমরে! কোমরে রে!

—কি হল?

—শিরা—শিরা ছিঁড়ে গিয়েছে রে।

—টিপে দি।

—দে। দে।

কিছুক্ষণ পর যন্ত্রণা কমে এলে চৌধুরী কাতর আক্ষেপে বললে—এ কি বিপদ হল বল দেখি! আশ্বিন মাস, সামনে পুজো, ধান উঠবে। আখ কাটা আছে। মাড়াই করতে হবে, শাল বসেছে। ও দিকে মাঠ থেকে ধান চুরি যাবে। এখন আমি যদি উঠতে না পারি—। ওঃ—এমন শত্রু পুত্র মানুষের হয়? কখনও—কখনও তোমার দুর্ভাগ্য ঘুচবে না—ঘুচবে না—ঘুচবে না।

—কি বলছ? আর্তস্বরে তিরস্কার করলে চৌধুরীগিন্নী।

—কি বলব বল? ভুলটা সঙ্গে সঙ্গে বুঝেছে চৌধুরী। ভাঙা গলায় পরমুহূর্তে বললে—অনেক দুঃখে বলছি। তার জন্যে তো নেহাৎ কম করি নি। ছেলেবেলায় কত ভেবেছি—আমি পারলাম না—আমার শুভেন্দু পারবে—বংশের মুখ উজ্জ্বল করতে। ওই ছোটটা—সুখেন্দুটার জন্য কতটুক করেছি? নেলির বিয়ে দিতে পারছি নে। তার তুলনায় শুভেন্দুর কত করেছি তুমি বল। আজ সে পালাল।

কি ? না ভাগ্যের সন্ধানে। আমার ভাগ্য ? আমাকে এই শরীরে যেতে হবে এবং কোনদিন মাঠের উপর উপুড় হয়ে মরে পড়ে থাকতে হবে।

নেলি বললে—ভেবো না বাবা, আমি যাব মাঠে গিয়ে পাঁজা গুণে আসব। পাঁজা গোণা আমি জানি। আর মা খামারে ধান ভাগ বুঝে নেবে।

এবার আর চৌধুরীর সহ্য হল না। হাত নেড়ে ক্ষিপ্তের মত বলে উঠল—হ্যাঁ—হ্যাঁ—তা হলেই ষোল কলা পূর্ণ হয়—চৌদ্দপুরুষ ওপার থেকে ধন্য ধন্য করে। আর ওই বৃহন্নলাটা ভাদুগান বেঁধে গেয়ে বেড়াক মুল্লুকময়—

ভাদু আমার মাঠে মাঠে পাঁজা গুণে
বেড়াইতেছে—
গোপাল চৌধুরীর হায় মন রসনা—
সৌভাগ্যটা একবার দেখে যাওগো।।

চৌধুরীগিন্নী যে চৌধুরীগিন্নী বিরস বিষণ্ণ বদনা বলে প্রসিদ্ধা তিনিও গান শুনে হেসে ফেললেন স্বামীর কবিত্বশক্তি এবং সঙ্গীত পারঙ্গমতা দেখে। নেলিও মুখ ঘুরিয়ে হাসছিল। চৌধুরী চটে গিয়েই বললে—হাসছ যে ?

চৌধুরীগিন্নী বললে—তোমার ছড়ার বাহারে আর সুরের মাধুরীতে।

এবার নেলি খিল খিল করে হেসে উঠল—আর আত্মসম্বরণ করতে পারল না।

চৌধুরীও হেসে ফেললে নিজে। বললে—হাস। তা হাসতে পার। তা—ও হারামজাদী ছড়া বানায় ভাল। ভয় তো সেখানে। কিছু পেলে হয়।

কথা সত্য। আজ মাসখানেক নতুন ছড়া বাঁধবার মত কোন খবরের সন্ধান পায় নি নসু। ওই যে একদিনে দুটি ঘটনা ঘটে গেছে—তারপর চন্দনপুর যেন ঝিমিয়ে গেছে। সেদিনের ঘটনার একটি নিয়েই

নসু ভাদু তৈরী করেছিল—তাও গাইতে গিয়ে সতীশ ঘোষালকে নিয়ে যে বিপদ ঘটেছে তা নসুর কল্পনাতীত। এমন কখনও হয় না। অমর চক্কোত্তি রাগতে পারে—কিন্তু সতীশ ঘোষাল এমন আগুন হল কেন?

নসু বলে—ক্যানো বলো দিকিনি বেয়াই।

ফটিকদাস বলে—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে

দিতে নারে সীমা—

কি করে বলিব বল তাহার মহিমা।

—তা বলেছ ঠিক। কিন্তু নোকটি তাই এমন নয়। বুয়েচ? গানে ভারী দখল। আমাকে মধ্যে মধ্যে দেখিয়েছেন। বুয়েচ! গলাটি সরেস নয়। একটু নীরস বিরস বটে, কিন্তু খোঁচখাঁচ যা দেখায় তা বলিহারি। ছড়াও লেখে। কি সব--তোমার ওই সব জজ-ম্যাজিস্টর—হাকিম হুকিম, ই কে করলে--উ কি করলে তাই নিয়ে। আমি ভাই রসের ভিয়েন জানি—গুড়ের ভিয়েন—লবণ লঙ্কা-মরিচ আদা ই নিয়ে কারবার বুঝি না। তা ভাই পারে তো। সে মানুষ এমন ক্ষেপে গেল। যা গেল। উ ভাদু আমি গাই না। লোকে জিরিবিরি করে ধরে তখন গাই।

—তা ভাল কর। নতুন ভাদু তৈরী কর।

—কি নিয়ে করব? ঘটল কি? সব যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। তা তুমি তো পট আঁকছ খুব। দেখাও না তো একদিন!

ফটিক দাস শুধু পুতুলই করে না। ও পটও আঁকে। পটুয়ারা কাপড়ের উপর কাগজ সেঁটে লম্বা গুটানো পট আঁকে—ফটিক দাস তা আঁকে না—তবে কাপড়ের উপর আটা দিয়ে সাঁটা কাগজে খাত বেঁধে তাতে তুলি দিয়েই ছবি আঁকে। ছড়াও বাঁধে। এক একটি ছবির তলায় এক-একটি ছড়া। সেও দেখায় না কাউকে। অবশ্য বেয়ান নসুবালা ছাড়া। তারও সময় আছে! রাত্রিকালে পুতুল গড়ার কাজ সেরে ঘরের ভিতর একটি কাঠের পিলসুজের উপর রেড়ির

তেলের প্রদীপ জ্বেলে—চশমা চোখে রঙ তুলি খাতা নিয়ে বসে। নস্থবালা সন্ধ্যায় গান-বাজনার মজলিস সেরে বাড়ী গিয়ে ভাতুমণিকে পৌঁছুতে আসে। বেয়াইয়ের রসিকলালের কাছে তখনই উঁকি মেরে দেখে যায়—তার ছবি আঁকা। সন্ধ্যেবেলা আসরে যে ছড়া বেয়াই বলে—তারই পট আঁকে। সবগুলোর নয়—দুটো চারটের।

সেই আকুটির বাবুর ফালে জমি সেলাইয়ের ছড়াটির পট লিখেছে। সে দেখেছে নস্থ। খাসা হয়েছে। সেই থলথলে ভুঁড়ি—সেই টাক—সেই ফোকলা মুখে সামনে একটি দাঁত—সেই শুকনো ভাইপোটি সব ঠিক। ছড়া শুনে কোট পেণ্টুল পরা সাহেবের সেই ছানাবড়া করা চোখ সব অবিকল!

ফটিক দাস বললে—রেয়ান, যে কাণ্ড তোমাকে নিয়ে হল তাতে ছবি আঁকাই ছাড়তে হয়। তাতো ভাই পারি না। উটি আমার নেশা। চণ্ডুর নেশার মতন। তা ভাই তোমাকেও দেখাই না—। চামড়ার মুখ তো—লোহার তো নয়। কোথা ফসকে কাকে বলবে—বিপদ হবে।

নস্থবালা বললে—উঠলাম ভাই।

—কেন? রাগ হল?

—রাগ? বাবারে—তুমি ছেলের বাপ—আমি মেয়ের মা। রাগ করতে পারি? পায়ে মাথায় সমান হয়?

—তবে অভিমান?

—অভিমান! রসের নাগর আমার আচ্ছা বেহায়া তুমি। বদ মতলবী মানুষ কোথাকার, এই বয়েসে আমার কপালে কলঙ্ক দেবা তুমি! আমার মান ভাঙাবে! তোমার বষ্টুমী খুঁজে আনোগা—এনে মানভঞ্জন কর।

—তবে কি করব বল!

—ক্ষমা চাও। বল এমন বাক্যি বলব না!

—বলব না।

—গোপন কিছু রাখব না।

—গোপন কিছু রাখব না।

—বেশ—তা হ'লে—দেখাও।

—দেখ। —এই দেখ আকুটির বাবু। ফাল দিয়ে জমি সেলাই।

—চমৎকার হয়েছে! মেডেল পাবা। উ দেখেছি।

—তা পরেতে—এই দেখ তোমার—সতীশ ঘোষালের বক্তিমে।

—হুঁ। ভাল! বেশ ডেলা পারা করেছ চোখ দুটো। ওঃ, হাতের আঙুলটা আকাশ বাগে তীরের খোঁচার মতন হয়েছে।

—এই তুমি।

—হ্যাঁ। তাই তো বটে। এই—আমি! তার পরেতে এটা কি হে? ই যে অনেক নোক। ও বাবা! কে গো। এই—হ্যাকো। গো বলে ফেললাম। গা—গা। হ্যাঁগা! এ কে?

—ই সব সেই ইনকিলাব জিন্দাবাদ! কৃষি ঋণ আদায় চলবে না—চলবে না—চলবে না—

ঋণ আদায় করিলে ধান—ফলবে না—

ফলবে না।

ইনি হলেন সেই ভোট পাওয়া বাবু।

—আচ্ছা। এই বুঝি ঝাণ্ডা! হ্যাঁ। তা পরেতে এটা? এও যে অনেক লোক গা? আবার কবে—লাল ঝাণ্ডা এয়েছিল?

—উহুঁ। এ তেরঙ্গা হে। দেখতে পাচ্ছ না?

— তেরঙ্গা? হ্যাঁ এই তো তিন রঙ। তা এ কোন্ রঙ্গ—তা বল? অ—হ—হ। ভবানীবাবুর বোরো ধানের মিটিং। হ্যাঁ—হ্যাঁ বটে তো। এই বুঝি ভবানীবাবু?

—হ্যাঁ—। শোন—

কৃষি ঋণের আদায় বন্ধ আনন্দে সব

লাগাও বোরো ধান—

তেরঙ্গা ঝাণ্ডার পাণ্ডার কথা কর অবধান।

লাল ঝাণ্ডা মেছোদের দিকে।

চাষীর বন্ধু তেরঙ্গা—

ভাত আগে না মাছ আগে—জিজ্ঞাসা করেঙ্গা।

—ভাল ভাল রে বেয়াই আমার রসিকলালের বাবা।

—নন্দুবালা হেসে গড়িয়ে পড়ল।

॥ ১৪ ॥

শুভেন্দু বর্ধমান-স্টেশনের থার্ডক্লাস ওয়েটিং রুমে বসেছিল। রাত্রি তখন প্রায় তিনটে। তিনটে বাজতে কয়েক মিনিট বাকী। সে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে ভাগ্য অন্বেষণের পথে। ভাগ্যকে ফেরাতে পারলে ফিরবে। না পারলে এই বৃহৎ পৃথিবীর জনতার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে দেবে। বাড়ী আর সে ফিরবে না। হারিয়ে যাবার পথ অনেক! অনেক পথ। তার মধ্যে সে দুটো পথ বেছে রেখেছে। গেরুয়া পরে মাথায় জটা তৈরী করে দাড়ি গোঁফ রেখে হারিয়ে যাওয়া। অথবা পাপ করে পাপী হয়েও হারিয়ে যাওয়া। দুটোর একটা। হয় সন্ন্যাসী নয় ক্রিমিন্যাল। তবে প্রথমেই সে চেষ্টা করবে —তার বাবার জীবনে বাবার কর্মদোষে হারিয়ে ফেলা তাঁদের বংশের সেই পুরনো ভাগ্যের সাচ্ছল্য এবং গৌরবকে ফিরিয়ে আনতে।

সে বুঝতে পারছে তাদের বৈষয়িক অবস্থার অবস্থান্তরের মধ্যেই সে ভাগ্য তাদের হারিয়ে গেল! চোখের সামনে পুকুরের জলে একখানা রূপোর থালার মত পিছলে খানিকটা তেরছা ভঙ্গিতে তলার দিকে ভেসে গিয়ে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

লক্ষ্মী নাকি চঞ্চলা তার অনেক গল্প সে শুনেছে। গল্প শুনতে হবে কেন, তার অনেক প্রমাণ তো তার চোখের ওপর। তার পিতৃপিতামহের ভাঙা বাড়ীই তার প্রমাণ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে আছে তাদের গোটা বংশটার ওপর মৃত্যুদণ্ডের মত। মুঘল নবাবী আমলের

জমিদার তারা, খেতাবে চৌধুরী এককালে একটা পরগণা জায়গীর পেয়েছিল। গোটা গ্রাম জুড়ে চৌধুরীদের পাকা বাড়ী। কালক্রমে সবই ভাঙা আর ফাটা—ফাটা আর ভাঙাতে পরিণত হয়েছিল। পুরনো ভাঙা বাড়ীগুলোর প্রত্যেকটিরই এক একটা অংশ পরিত্যক্ত। তা বসবাসের অযোগ্য হয়ে গেছে। সাপ খোপের বাসা হয়েছে। নিত্যই দু-দশখানা ইট ভেঙে খসে পড়েছে। কোন কোন দিন অকস্মাৎ একটা হুড়মুড় শব্দ তুলে খানিকটা ছাদ বা একটা খিলেন বা একটা পাঁচীলের আধখানা কি গোটাটাই ভেঙে পড়ে। তার থেকেও ভয়ানক হয়ে আছে সকল চৌধুরী বাড়ীর সাজার চণ্ডীমণ্ডপের সামনে তিরিশ-পঁয়ত্রিশ ফুট উঁচু পঙ্কের কাজ করা তিন-খিলেনের ফটকটা। সেটা আজও দাঁড়িয়ে আছে, ফেটে চৌচির হয়ে গেছে তবুও আছে। শরীকরা আজও পর্যন্ত ওটাকে ভাঙবার জন্য একমত হতে পারলে না। সকলেই বলে—থাক থাক—যতদিন আছে—ততদিন থাক। চৌধুরীদের সবই তো গেছে—ফাটাফুটো হয়েও ওইটেই যা আছে। ওই দেখেই মানুষ অবাক হয়ে বর্তমানে ভিত্তিহীন চৌধুরীদের মুখের দিকে তাকায়। ওই ফটক দিয়ে একদা হাতীর পিঠে হাওদার উপর রঙীন ছত্রতলে বসে চৌধুরী বংশের কুলদেবতা শ্যামচাঁদ স-সমারোহে বনভোজনে যেতেন। ওই ফটক দিয়েই রথযাত্রার সময়ে শ্যামচাঁদের কাঠের রথ বের হ'ত— ; ওই ফটক দিয়ে চৌধুরী বাড়ীর ছেলে বউ, মেয়ে-জামাই চতুর্দল চড়ে বাড়ী ঢুকত। আজও যে চৌধুরী বাড়ীরই ছেলেমেয়ের বিয়ে হোক—সে বিয়ে হয় ওই শ্যামচাঁদের নাটমন্দিরে এবং আজও ওই খিলেনের তলা দিয়েই চতুর্দলের বদলে পায়ে হেঁটে বেরিয়ে গিয়ে হয় গরুর গাড়ীতে নয় পাল্কীতে নয় সাইকেল রিক্সায় গিয়ে চাপে। ওদের মধ্যে যে দু-এক ঘরের অবস্থা ভাল আছে তারা এখন রেলস্টেশন থেকে মোটর ট্যাক্সি ভাড়া করে আনে।

কোন্ দিন হয়তো কোন নতুন বর ক'নে এবং তার সঙ্গে কোন চৌধুরী বাড়ীর ছেলেমেয়েদের মিছিলের মাথায় হুড়মুড় করে

ভেঙে পড়বে খিলেনটা, হয়তো সকলেই শেষ হয়ে যাবে। সে-কথা সকলেই বোঝে—মুখে বলেও সকলে—কিন্তু ভাঙতে মত কেউ দেয় না। বলে, থাক। পড়বে, যেদিন পড়বার সেদিন আপনিই পড়বে। তাতে যদি কারুর চাপা পড়ে মরাই নিয়তিনির্দেশ হয়, তো—তারা তাই মরবে।

শুভেন্দুর ঝপ্ করে মনে পড়ে গেল—সেদিনের কথা। যেদিন তার পৈতৃক গ্রামের বর্তমান কালের উঠ্তি কুবের—রাইস মিলের মালিক দে মশাই তার বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন সে দিনের কথা। বাবা তাকে বলেছিলেন গুরুঠাকুর! ভ্রম হয়েছিল বাবার নিশ্চয় কিন্তু এমন ভ্রমেরও মানে আছে। কারণ বাবা তাকে বলেছিলেন—বিচার করুন। দেখুন কেমন করে আমাকে মেরেছে! প্রতিবিধান করুন। ঈশ্বরকে ভগবানকে বলুন।

দে মশাই অপ্রতিভ হয়েছিলেন মনে মনে—কিন্তু অসন্তুষ্ট হন নি। এবং বেশ গুছিয়ে সান্ত্বনাও দিয়েছিলেন। এসব ছাড়া আরও কিছু আছে। সেটা লক্ষ্য করেছিল শুভেন্দু। তাদের সেই পুরনো আমলের বাড়ীখানার দিকে দে মশাইয়ের তাকিয়ে তাকিয়ে দেখার কথা মনে পড়ছে শুভেন্দুর। চোখে বিস্ময়ের কথা মনে পড়ছে। সম্ভ্রমের কথা মনে পড়ছে।

বলেছিল—'কালস্য কুটীলা গতি।'

কালের গতি কুটীল এ সকলেই জানে। এক পড়ে, এক ওঠে—এক কূল ভাঙ্গে অন্য কূল গড়ে এ নিয়ম সনাতনই বটে। কিন্তু এ এক আশ্চর্য কাল।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হল। যখন হ'ল তখন সকলেই খুব খুশী হয়েছিল। ইংরেজের সাম্রাজ্য গেল। দেশের রাজা-মহারাজা—নিজাম নবাব সুলতানদের রাজ্য গেল—তাতে আশ্চর্য একটা আনন্দ উল্লাস অনুভব করেছিল শুভেন্দু। শুধু শুভেন্দু কেন—শুভেন্দুর বাবাও করেছিল।

তারপর জমিদারী উচ্ছেদ বিল পাশ হল। তখনও খুব খুশী হয়েছিল শুভেন্দু। তারাও জমিদার—তাদের জমিদারি গেল—কিন্তু তাতে খুব দুঃখিত হয় নি শুভেন্দু, যা হাঙ্গামার ব্যাপার হয়ে উঠেছিল --এই জমিদারির লাট বা রেভেন্যু চালানো এবং প্রজাদের কাছে খাজনা আদায় করা; তাতে জমিদারি গেছে বেশ হয়েছে। তাছাড়া তাদেরই জ্ঞাতি—ধনী জমিদার রায়চৌধুরীদের এই এলাকার পনেরআনা জায়গা জোড়া মালিকানার একাধিপত্য গেল— এই-টেই হয়েছিল বড় সান্ত্বনা।

তার বাবার অভ্যেস—উবু হয়ে বসে গড়গড়ায় কাঠের নল লাগিয়ে তামাক খায়। সেইভাবে বসে তামাক খেতে খেতে বাবা বলেছিল—উঁহু-উঁহু—ওরা ঠিক থাকবে! যেতে আমরাই গেলাম। ওদের যে টাকা আছে--কলকাতায় ব্যবসা আছে—ওরা যাবে না।

বাবার কথা মিথ্যে হয় নি। রায়চৌধুরীরা তাদের দশরাত্রির জ্ঞাতি --তাদের পুরনো কালের সম্পত্তির অংশীদারও বটে—তারা যায় নি। তারা নতুন করে ভিত গড়েছে। তাদের ব্যবসা আছে লোহার কারখানা আছে—কয়লার খনি আছে, অভ্রের খনি আছে, সে যেমন ছিল তেমনি আছে--তাতে কেউ হাত দেয় নি--তারই টাকা থেকে তারা নতুন করে দেশের কাজে নেমেছে। হেল্‌থ সেন্টারের জায়গা জমি দিয়ে—কিছু টাকা দিয়ে হেল্‌থ সেন্টার করাচ্ছে সরকারকে দিয়ে; বালিকা বিদ্যালয় করাচ্ছে। তারা নতুন করে নাম কিনছে। আগে ওরা ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অনুগত পোষা পাখী। তারা যা বলাতো তাই বল্‌তো,—যা করতে বল্‌তো তাই করত,—আজ ইংরেজ সরকার নেই,—তারা যাবার সময় পাখীদের পায়ের শিক্‌লি খুলে বা কেটে দিয়ে 'উড়ে যা' বলে ছেড়ে দিয়েছে—কিন্তু ওদের পাখা জমে গেছে—উড়বার শক্তি নেই—যাবে কোথায়—? অগত্যা পায়ের কাটা শিকল বাজাতে বাজাতে কংগ্রেস সরকারের দাঁড়ে এসে—শিস দিয়ে ডাকছে—বলছে—'মথুরারাজের জয় হোক।' 'মথুরাপতি কি জয়।'

সদর সহরে কমপেনসেশন আপিসে দেবোত্তরের জন্য একটা টাকা সরকার থেকে মঞ্জুর হয়েছিল—সেই টাকা আনতে বাড়ী থেকে বেরিয়ে শুভেন্দু—আর বাড়ী ফেরে নি। টাকাটার তিনভাগ লোক মারফৎ বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে, বাকী সিকি টাকা নিয়ে সে বেরিয়ে পড়েছে ভাগ্যের সন্ধানে। ভাগ্য তাকে ফেরাতেই হবে।

প্রথম প্রথম দেশের স্বাধীনতা—জমিদারী-উচ্ছেদ সমাজতন্ত্রবাদ শিল্প-বিপ্লব, কৃষি-বিপ্লব সমাজবিপ্লব নিয়ে খুব উৎসাহ পেয়েছিল। উচ্চ নীচ, ধনী নির্ধন, বড় জাত-ছোট জাত থাকবে না। বিদ্বান-মূর্খ —গুণী নির্গুণ পুরো ঘোচানো ঠিক যায় না, তবে তফাৎটা সংখ্যার দিক দিয়ে এবং মাত্রার দিক থেকে কমানো যায় বই কি। একটা নতুন দেশ সে কল্পনা করেছিল।

তার কিছুটা হয়েছে। হয় নি এ কথা বলবে না। তবে যা হয়েছে তাতে দেশের মুখ আরও কালো হল। তার বাবা লেখাপড়া শেখে নি, জমিদার বাপের ছেলে; এ অপবাদ দুটো সত্য, কিন্তু তা ছাড়া তার বাপের আর কোন্ অপরাধ ছিল? নিরীহ মানুষ নিজের লেখাপড়া না শেখা অপরাধের জন্য সঙ্কুচিত লজ্জিত মানুষটি বাড়ীর এলাকার মধ্যেই ঘোরাফেরা করেছে; নিজের ছেলেমেয়েদের উপরেই তম্বি জুলুম করেছে কিন্তু বাইরের কোন লোকের সঙ্গে কোন বিরোধই কোনদিন করে নি। একটা ব্রাত্য জাতের মানুষ, পেশায় চোর, কাঠ চুরি করার জন্য তার বাবা তাকে মারতে গিয়েছিল, ধরতে গিয়েছিল—সেটা কি তার অপরাধ! সেই অচ্ছুত জাতের চোরটা তার হাতের জুতো কেড়ে নিয়ে তাকেই মাথায় মেরে চলে গেল অথচ তার সাজা হ'ল না। এই স্বাধীনতা। এই সমাজতন্ত্র!

অন্য-সময় হলে বা অন্য কারুর বাপের এমন অবস্থা হলে—তার অভিমানাহত মনের এমন প্রশ্নের অনেক জবাব দিয়ে—শুভেন্দু তর্ক করত। কিন্তু সে-সব যুক্তি আজ তার মনেই পড়ল না।

আজ তার চোখের সম্মুখে একটা সত্য দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠল।

বড়লোক রায়চৌধুরীরা যেখানে ছিল সেখানেই আছে। জমিদারী নিয়েও তাদের কেউ স্পর্শ করতে পারে নি। নতুন বড়লোক হয়েছে মিলওনার দে। সে দিন-দিন তরাইজঙ্গলের সবল সতেজ শাল গাছের মত হু-হু ক'রে বাড়ছে।

আর নিচে থেকে কাঁটা গাছের ঝোপগুলি সতেজে বেড়ে উঠে তলার দিকটা ভরে তুলছে।

মরছে মাঝারি শাল-সেগুনের দুর্বলগুলি। শুকিয়ে শুকিয়ে মরছে। মরছে তারা। অর্থাৎ মরছে তাদের মত মধ্যবিত্তেরা।

না তা হবে না। সে মরবে না। সে বাঁচবে। তার নিজের সঙ্গে তার বাবাকেও সে বাঁচাবে। তাদের বাড়ীকেও সে বাঁচাবে। দেশ--জাতি জাতীয়তাবাদ দশের মঙ্গল সমাজের মঙ্গল এ-সব, ওই কর্তা যারা তারা করুক। যারা লীডার—তারা করুক। তাকে বাঁচতে হবে। শোধ নিতে হবে। টাকা রোজগার করে প্রচুর টাকা নিয়ে তাকে ফিরতে হবে। তার একটা পথও সে মনে মনে ঠিক ক'রে ফেলেছে। সহজ পথ। অত্যন্ত সহজ পথ। অনেক আগেই এই পথ ধরা তার উচিত ছিল। কিন্তু কোথা থেকে যে একটা কিন্তু এসে তার পথ আটকে দাঁড়িয়েছিল, তা সে বলতে পারে না। সে কিন্তুটাকে এতদিন কিছুতেই লঙ্ঘন করতে পারে নি। আজ আর তার বাধা নেই। দ্বিধা নেই। সব বাধা দ্বিধা ঘুচে গেছে।

সে ঠিক করেছে সে কলকাতায় গিয়ে সিনেমায় নামবে। স্কুল জীবনে পূজোর সময় থিয়েটার হতো তাতে সে ছিল হিরো। প্রাইজের সময় সে রেসিটেশন করেছে, সব থেকে ভাল করেছে। শুধু তাই বা কেন? যারা দেখেছে তারা সকলেই বলেছে এমন কি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত বলেছিল এমন রেসিটেশন তিনি শোনেন নি।

কচ ও দেবযানীতে সে কচ আর দেবযানী ছিল সীমা। চিত্রাঙ্গদাতে সে অর্জুন, চিত্রাঙ্গদা সীমা।

চিত্রাঙ্গদা দেখে তাদের গ্রামের শ্যামাকিঙ্করবাবু তাকে বলেছিলেন—তুমি তো দেখি চন্দনপুরের অগুরু চন্দন হে! করেছেও বড় ভাল। কিন্তু অর্জুন তোমাকে মানায় নি!

শ্যামাকিঙ্করবাবু শ্যামাকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশের খ্যাতিমান মানুষ। কবি নাট্যকার। তাঁর খ্যাতি এখন সারাদেশে অর্থাৎ ভারতবর্ষ জুড়ে ছড়ানো। কলকাতায় থাকেন। একদিন গ্রাম থেকে সব ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছিলেন ভাগ্যের সন্ধানে।

ওই বড়লোক রায়চৌধুরীদের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলেই চলে গিয়েছিলেন। রায়চৌধুরীদের তখন প্রবলতম প্রতাপ—সৌভাগ্যের চূড়া তখন আকাশগায়ে ঠেকেছে। ইংরেজের ঘরে তখন চরম অনুগ্রহের অধিকারী তারা। শ্যামাকিঙ্কর তখন ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের কর্মী এবং সাহিত্যিক। দুই পক্ষে একটা না একটা বিরোধ লেগেই থাকত। শেষ পর্যন্ত রায়চৌধুরীরা শ্যামাকিঙ্করের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে গ্রাম ছেড়ে সদরে চলে গেলেন—বলে গেলেন—শ্যামাকিঙ্করের জন্যে গ্রাম ছাড়লাম। কারণ গ্রামের লোক এ এলাকার লোক শ্যামাকিঙ্করকে চায় আমাদের চায় না। ফলে গ্রামের লোক বিরূপ হল ক্ষুব্ধ হল শ্যামাকিঙ্করের উপর। শ্যামাকিঙ্করও গ্রাম ছেড়ে চলে গেলেন। চলে গিয়ে কলকাতায় জীবনযুদ্ধ শুরু করলেন। দেখতে দেখতে পদাতিক থেকে হলেন রথী, রথী থেকে হলেন সেনাপতি, যশ সম্মান তার সঙ্গে অর্থও তিনি পেয়েছেন। আজ শ্যামাকিঙ্কর সর্বজন পরিচিত। এখন মধ্যে মধ্যে আসেন গ্রামে। শুভেন্দুদের প্রতিবেশীও বটেন এবং পিতৃবন্ধুও বটেন। তাছাড়া সম্পর্কে তিনি শুভেন্দুর ভগ্নীপতি। শ্যামাকিঙ্করবাবু ইচ্ছে করলে অনায়াসে তাকে ছবিতে সুযোগ করে দিতে পারেন। সেবার শুভেন্দু বলেছিল তাঁকে। বলেছিল আমার পার্ট সত্যি ভাল লাগল আপনার?

শ্যামাকিঙ্করবাবু বলেছিলেন—দেখ তোমার দিদির সঙ্গে আমার যখন বিয়ে হয়—তখন তোমার বাবারও বিয়ে হয় নি। এখন অকারণে তোমার প্রশংসা ক'রে তোমার দিদির মনোরঞ্জনের দরকার নেই আর তা করছি নে। কারণ আমাদের বয়স অনেক হল। পার্ট তোমার ভাল হয়েছে। তবে ভাই মানায় নি ঠিক।

—মানায় নি! বিস্ময়ের সীমা ছিল না তার। তার তো রূপ না-থাকা নয়!

শ্যামাকিঙ্কর হেসে বলেছিলেন—তোমার চেহারা খারাপ তা বলছি নে—বরং একটু বেশী ভাল। তবে ভাই ননীগোপাল ননীগোপাল লাগে। অর্জুন অর্জুন লাগে না! মানে অর্জুন হতে হলে বীরের মত চেহারা চাই তো। মেক্-আপে এক জোড়া গোঁফ নিলেও মোটমাট বনবাসী পরিব্রাজক অর্জুন বলে কোন রকমে সান্ত্বনা পাওয়া যেত। ভাবা যেত—ননী ছানা মাখন ঘৃত প্রভৃতি রাজভোগ তো এখন জোটে না তাই রোগা লাগছে। তবে গোঁফ জোড়াটা ঠিক আছে। চিড়িয়াখানার বাঘ সিংহীর মত। রোগা কিন্তু গোঁফের ঝড়তি পড়তি নেই। বরং ওই মেয়েটিকে আসল অর্থাৎ রূপবঞ্চিতা পুরুষালি চেহারা চিত্রাঙ্গদা হিসেবে বেশ মানিয়েছিল।

বলেছিলেন সীমার কথা। কিন্তু সীমার কথা থাক। সীমা তার পথ বেছে নিয়েছে। পড়বে—পাস করবে—কোন ইস্কুলে টীচার হবে—তাই তার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু তাকে ওই আলিবাবা গল্পের চল্লিশ ডাকাতের সেই চিচিংফাঁকের ধনরত্ন ভরা পাহাড় গুহা—সিনেমাতে ঢুকতেই হবে। সেদিনও কথাটা বলেছিল শুভেন্দু। বলেছিল—আপনি তো বলছেন পার্ট আমার ভাল হয়েছে। চেহারা অর্জুনের মত পালোয়ানি না হ'লেও একালের বাঙালীর ছেলে হিসেবে ভালো—তাও বললেন। তা আমাকে একটু ব্যাক-ট্যাক ক'রে সিনেমা লাইনে ঢুকিয়ে দিন না।

—সিনেমা লাইনে? অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন শ্যামাকিঙ্করবাবু।—সিনেমা লাইনে যাবে?

সে চুপ করে গিয়েছিল। জোর করে বলবার ভরসা পায় নি। শ্যামাকিঙ্কর বলেছিলেন—পড়া শেষ কর। পড়—

এবার কথা খুঁজে পেয়েছিল সে। বলেছিল—পড়া-শোনা আর আমার হবে না জামাইবাবু। এই তো পর পর তিনবার পরীক্ষা দিয়ে তবে পাশ করলাম। মিথ্যে কলেজে ভর্তি হই নি। চাকরি পাচ্ছি নে, ঘুরে বেড়াচ্ছি টো-টো ক'রে। আর চাকরিই মিলবে বা কি। পিওন আর্দালীর কাজ তো করতে পারব না। চেহারা আছে পাট করতে পারি—সিনেমায় যদি ভাল রোজগার করতে পারি—তাতে দোষ কি?

শ্যামাকিঙ্করবাবুর মুখের হাসিহাসি ভাবটুকু মিলিয়ে গিয়ে—যেন কঠিন হয়ে উঠেছিল—তিনি বলেছিলেন—আছে দোষ শুভেন্দু। দোষ আছে।

কি দোষ? সে কথা আর জিজ্ঞাসা করে নি শুভেন্দু। সাহস হয় নি। এবং কি দোষ প্রশ্ন করলে জবাবে তিনি কি বলবেন —তা তার জানা ছিল। সে-দিন তা নিয়ে তর্ক করার মত মনের জোর তার ছিল না। এবং সেদিন যে মন তার ছিল সে মন এগুলির মন্দত্ব বা দোষ অস্বীকারও করত না।

এ পথ পিছল পথ।

* * *

বেঞ্চের উপর অকারণেই নড়ে-চড়ে বসল শুভেন্দু। থার্ড ক্লাস ওয়েটিং রুমের শেডটার নীচে যাত্রীরা প্রায় সব ঘুমিয়ে গেছে। চিনেবাদামের খোলা, পোড়া বিড়ি সিগারেটের টুকরো, খাবারের ঠোঙা কাগজের টুকরো ধুলো বালির মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের ঘুমের খুব অসুবিধে হয় নি তারা দিব্যি ঘুমুচ্ছে। দু-চার জন যারা জেগে আছে তারা কেউ বিড়ি টানছে, কেউ গুনগুন করে গান গাইছে

মোট কথা মানুষেরা ক্লান্ত হয়ে নিরুপায় শান্ত হয়ে পড়েছে। শুধু শুভেন্দু শান্ত হয় নি। সে শান্ত হতে পারছে না।

তার পথ চাই। যে পথে অর্থ আছে সম্পদ আছে সেই পথেই সে হাঁটবে। সে পথ পিছল না বন্ধুর না। সে পথ পরিণতিতে মর্মান্তিক পূর্ণতায় পৌঁছে হারিয়ে গেছে এ সব সে বাছবে না বিচার করবে না। এ সব সেই চিরকেলে নীতিবাগীশদের কথা। শুচিবাইগ্রস্ত একদল বুড়োমানুষ এইভাবে এদেশের তরুণদের জীবন চিরকাল পঙ্গু করে দিয়ে আসছে।

"সদা সত্যকথা বলিবে। কদাচ কাহাকেও দুঃখ দিবে না। পিতামাতাকে ভক্তি করিবে। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান এবং সর্বত্র বিরাজিত. মদ্যপান করিবে না। পরনারীকে মাতৃবৎ দেখিবে। সতীত্বই নারীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। সতীত্ব-বলে একদা সাবিত্রী যমের সহিত যুদ্ধ করিয়া মৃত স্বামীকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন। মানুষের নিকট ভোগ অপেক্ষা ত্যাগই বরণীয় এবং গ্রহণীয়। কারণ মনুষ্যত্ব ত্যাগের ভিত্তির উপরেই গড়িয়া উঠিয়াছে।"

এর কোনটাই আজকের তরুণ জীবনকে, তাই বা কেন, গোটা মানুষের সমাজকে এতটুকু প্রেরণা দিতে পারছে না। চীৎকার করে মানুষেরা বলছে—বা বলতে চাচ্ছে—না—না—না। ও কথা আমরা শুনব না। ও কথা আমরা মানব না। ও-কথা পচে গেছে—ও-সত্য মিথ্যা হয়ে গেছে। ও-সত্যকে গুলি ক'রে একালের মানুষ হত্যা করেছে। মরে অমর হওয়ার সত্যকে রাজঘাটে সমাধি দেওয়া হয়েছে। আর নয়। ওর পালা শেষ। প্রাচীন প্রগল্‌ভতা স্তব্ধ হও।

নতুন-কালের নতুন সত্যকে খুঁজতে হবে না, কষ্ট ক'রে মাথা ঘামিয়ে বুঝতে হবে না, তাকিয়ে দেখলেই দেখতে পাবে—বুঝতে পারবে। গোটা দেশের দিকে তাকিয়ে দেখ!

বল, কে বিশ্বাস করে ঈশ্বরের অস্তিত্বে?

বল, কে মনে করে না ঈশ্বর-বিশ্বাসীরা প্রতারক ?

বল, কে প্রমাণ করতে পারে যে আইন বাঁচিয়ে বে-আইনী পথে নিজের স্বার্থসাধন বা কার্যোদ্ধারে কোন বাধা আছে ? বে-আইনীর সংজ্ঞা পেনাল কোডে আছে। তাকে প্রমাণ করে পুলিস এবং আদালত। কিন্তু পাপ কাকে বলে তার সংজ্ঞা কি—কে প্রমাণ প্রয়োগ দিয়ে প্রমাণিত করতে পারে ? কে পারে ?

পৃথিবীতে সাধারণ মানুষকে কোন এক অবস্থায় আপিং খাওয়ানো চলছে চিরকাল। কখনও এ ধর্মের কখনও সে ধর্মের, কখনও ঈশ্বরনির্দেশ-বিশ্বাসের কখনও নিরীশ্বরবাদের, কখনও এ তত্ত্বের কখনও ও তত্ত্বের—সবেরই মূল কথা হল তোমরা কষ্ট ক'রে যাও। নিজে কষ্ট কর, পরকে সুখী কর। ওর মধ্যেই নাকি অমৃত আছে। ঝাড়ু মার। ঝাঁট দিয়ে ফেলে দাও।

সংসারে যে শক্তিমান—যে রাষ্ট্রশক্তি দখল ক'রে ব'সে আছে সে চাণক্যের মত বলে—আমি মহারাজের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে কুটীরে বাস করি, এক মুঠো আতপ তণ্ডুল সিদ্ধ করে খাই। কুশাসনে বসি, পর্ণশয্যায় শয়ন করি।

হায় মহামাত্য চাণক্য—তুমি যে ভূতপূর্ব মহারাজ নন্দকে পশুর মত হাড়িকাঠে ফেলে কাত্যায়নকে দিয়ে হত্যা করিয়ে তার রক্তে তোমার শিখা বন্ধন করে সংসার রঙ্গমঞ্চ থেকে করতালি নিয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়েছ—তার মূল্য কি ওই কৃচ্ছ্রসাধনের দুঃখের বা কষ্টের অপেক্ষা অধিক নয় ?

সব মিথ্যে। সব মিথ্যে ভাঁওতা দিয়ে মানুষের জীবনকে জলস্রোতের মত বাঁধ দিয়ে দিয়ে যে পথে ঘুরিয়েছ এতদিন সেই পথেই ঘুরেছে। জলস্রোতকে উঁচু পথে চালিয়েছ ; জীবনকে দুঃখের পথে চালিয়েছ। আর তা হবে না। চলবে না। আজ বাঁধগুলো পুরনো হয়ে জীর্ণ হয়েছে, ফাট ধরেছে, জলস্রোতের চাপ বেড়েছে—পরিমাণ বেড়েছে। এবার সে সকল কৃত্রিম বাঁধ ভেঙে দিয়ে তার গতির

স্বাভাবিক পথে ছুটবে। জলের গতির স্বাভাবিক পথ উঁচু থেকে নীচুর দিকে। জীবনের স্বাভাবিক গতির পথ—দুঃখ থেকে সুখের দিকে। বিচিত্র কুটীল মানুষের সূক্ষ্ম আর্থিক বুদ্ধি। এখানেও সে ধাঁধার সৃষ্টি করতে চায়। বলে—সুখ? সুখ কোথায়। সুখ কি ভোগে? সুখ কি সম্পদে? টাকায়? সুখ মনে—মনের শান্তিতে! হ্যাঁ—নিত্য অভাবের মধ্যেই মনের শান্তি।

মিথ্যে কথা। এসব মিথ্যে কথা।

এবার সব চাতুরী ভেঙে গেছে মানুষের। সুখের পথ সে ভোগের মধ্যেই খুঁজে বের করেছে। তৈরী করে নিয়েছে। সেই পথে জীবনের মিছিল এবার চলবে।

গোটা ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে দেখ! দেখ যেখানে যত বাঁধ ছিল, জীবনের সহজ স্বভাবের গতিপথে সব ভেঙে পড়ে আছে, থৈ-থৈ করা জলপ্লাবনের মধ্যে সব কিছুকে ডুবিয়ে দিয়েছে।

এই তো মিলওয়ালা শিবনাথ দে সেদিন বাবাকে দেখতে এসে তাকে বলে গেল—এক কাজ কর শুভেন্দু। ব্যবসা কর। কিছুদিন যদি মান-মর্যাদার কথা ভুলে গিয়ে খাটতে পার, আর আইন বাঁচিয়ে ধান-চাল বাধাইএর কারবার করতে পার—ধর তোমাদের এই প্রকাণ্ড দালানবাড়ী এই বাড়ীতে কোন ঘরে একটা গুপ্ত গুদাম করে কাজ করে যাও—তা হলে বছর দুয়ের মধ্যে দেখবে এই অবস্থার ভাঙন রোধ হয়ে নতুন গড়ন শুরু হয়েছে। কিছু রিস্ক্ অবশ্য আছে। তা লাভ করতে গেলেই রিস্ক নিতে হয়।

সে (অর্থাৎ শুভেন্দু) বলেছিল—ব্ল্যাক মার্কেটিং হবে তো!

হেসে দে বলেছিল—নামটা ব্ল্যাক মার্কেটিং দিয়ে বে-আইনী করেছে। কিন্তু এ তো বাপু চিরকাল আছে। একে আমরা আগে বাঁটাইয়ের কারবার বলতাম। সস্তার বাজারে কিনে চড়া বাজারে বেচা এই তো ব্যবসার মূল কথা গো। ব্যবসাতে একটা কথা আছে ডিফারেন্স। ডিফারেন্সের দাবীতে এই তো চল্লিশ সাল পর্যন্ত লাখ

লাখ টাকার নালিশ হয়েছে। ধর তোমার সঙ্গে কণ্ট্রাক্ট হল তোমাকে হাজার মণ ধান দোব পাঁচ টাকা দরে, ডেলিভারি শ্রাবণ মাস পর্যন্ত। এখন শ্রাবণে দর হয়ে গেল দশ টাকা তার মানে হাতে হাতে পাঁচ হাজার মারছ তুমি আর আমার পাঁচ হাজার যাচ্ছে। আমি দিলাম না ধান। দিলাম অন্য লোককে দশ টাকা দরে বেচে। তুমি নালিশ করলে—তোমার পাঁচ হাজার লোকসান গেছে—তার ক্ষতিপূরণের দাবীতে।

শুভেন্দু হেসে বলেছিল—না দে মশায়। ও পারব না!

দে বলেছিলেন—ওগো এতখানি ধর্মের মুখ তাকালে কষ্টই পাবে। পরকালে কি হবে কেউ জানে না। আর এটা অধর্ম তাই বা কে প্রমাণ করে দিতে পারে? অধর্ম পাপ হলে এতকাল চলে এল কি করে?

সে বলেছিল—যা চলে এসেছে, চলে এসেছে বলে তাই সত্য ও নয় ধর্মও নয়। ধরুন—

বাধা দিয়ে শিবনাথ বলেছিল—ধরতে হবে না। মেনেই নিলাম। যা চলে এসেছে,—চলে এসেছে বলে তাই যেমন পুণ্য কর্ম নয় সত্য কর্ম নয়—তেমনি নতুন বলে আজ যা চালাচ্ছ তাও পুণ্য কর্ম বা সত্য কর্ম নয়। ওগো—ওসব অনেক দেখলাম। বুঝেছ—শক্ত যে তারই সব দোর খোলা—সেই মুক্ত পুরুষ। ওসব ছাড়—ছেড়ে একটা কিছু কর। দেখ আমার নামে অনেকে অনেক কথা বলবে। এই রায়-চৌধুরীদের বড়বাবু—না করেছেন এমন ভাল কাজও নাই আবার না করেছেন এমন মন্দ কাজও নাই। জান তো সব। সবই করেছেন। যে পারে সেই করে। যে পারে সেই মরদ। সেই বেটাছেলে। বুঝেছ। কিছু কর। বুঝেছ, কিছু কর। পরমার্থে কি হয় তা জানি না তবে শুধু অর্থ না থাকলে লোকে তোমাকে পায়ে দলে দিয়ে চলে যাবে। যেমন ওই চোরটা আজ তোমার বাবাকে—। থাক। চোখে তো দেখলে। তার ঘা তোমাকেও লেগেছে গো। কিছু কর। কিছু

করে নিজের অবস্থাটার ভাঙনের মুখে বাঁধ দাও ; দেখবে তোমার অবস্থা পাল্টাবার সঙ্গে সঙ্গে গোটা দুনিয়ার অবস্থা পাল্টে গেছে।

ফেরার পথে ওই দিনই শুভেন্দু সঙ্কল্প করেছে—সিনেমা—সিনেমাই একমাত্র তার পথ। ওই পথেই সে তাদের অবস্থার ভাঙন বাঁধতে পারে।

এর পর তাকে অর্থ দিয়ে যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই সে যাবে।

স্বর্গে তার প্রয়োজন নেই। নূতন দুনিয়া গড়ার সাধ তার মিটেছে। আর নতুন দুনিয়ার কামনাটাই বা কি, কল্পনাটাই বা কি? কি আছে। তার মধ্যে? কোথায় আছে সেকালের পাপপুণ্যের পুঁথি সামনে ধরে পঙ্গু হয়ে বসে হরিনাম কর? কোথায় আছে গঙ্গাজল পান করে যাগযজ্ঞ করে জীবন ধারণ কর? কোথায় আছে রাত্রি জেগে পড়ে বি-এ এম-এ পাস করে সৎ একটি কেরানী হয়ে ঝুঁকে বসে দশটা-চারটে কলম পিষে কুঁজো হয়ে গিয়ে অকালে বুড়ো হয়ে কেশে কেশে মর? অথবা স্কুল-মাস্টার হয়ে মানুষের বাচ্চাদের রাখালী করে যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যে তুষ্ট থাক? ইস্কুল-মাস্টারী নাকি সম্মানের কাজ! কারণ মাস্টারদের চরিত্র সৎ এবং শুদ্ধ বলেই লোকেদের ধারণা। ধারণাটা ঠিক কি ঠিক নয় সে তকরার সে করবে না—তবে তাতে তার হয়টা কি?

ব্যবসা করতে বসে যে লাভ করবার সুযোগ পেয়েও করে না, তার ব্যবসার গদীঘরে গণেশ মুখ ফিরিয়ে বা কুলুঙ্গী থেকে ঝাঁপ খেয়ে আছড়ে পড়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়।

এই তো নতুন দুনিয়ার কল্পনা!

এ কল্পনার মধ্যে সত্যের একটি উদারপথ আছে--সেটি হল—যার যে যোগ্যতা আছে সে সেই যোগ্যতা বিকাশের পথেই চলে। তাতে কোন অমর্যাদাও নেই, পাপপুণ্যেরও কোন কথাই নেই। নতুন যুগের পরিকল্পনায় এইটেই নতুনত্ব। মুক্তি। সকল নিষেধ থেকে সকল বাধা থেকে মুক্তি।

হঠাৎ একটা কথা মাথার মধ্যে খেলে গেল। যেটা তার বাবার পক্ষে মর্মান্তিক এবং অপঘাত মৃত্যুতুল্য অপমানজনক—সেইটেই আজ তার কাছে উদার এবং মুক্ত জীবনের প্রসন্ন আহ্বান।

ঢং ঢং করে ঘণ্টা পড়ল। ডাউন ট্রেন আসছে শুভেন্দু উঠল।

॥ ১৩ ॥

"নানা রঙ্গের পুরী ; কেউ হাসছেন কেউ কাঁদছেন
কেউ করছেন চুরি।
রাম করেন সীতা সীতা—সীতায় ডাকেন রামে—
কেষ্ট করেন রাধা রাধা—রাধায় ডাকেন শ্যামে।
সীতা সতী পুণ্যশ্লোকা—রাধা কলঙ্কিনী—
সীতা রাধা দুয়েই মুক্তি—জপেন যে-নাম যিনি।"

ছড়াটার মাঝখানে ছেদ টেনে দিয়ে ফটিক দাস থামেন। নস্থ বললে—থামলে ক্যানে হে? বল।

হেসে ফটিক বললে—তুমি তো না-জানা লও হে। তা বলে করব কি?

—তবে বলা হলটা ক্যা—নো?

মধ্যে মধ্যে নস্থ এমনি ভাবে বেশ শহুরে উচ্চারণে 'ক্যানো' শব্দটি উচ্চারণ করে একটু রসিকতাও করে, আবার নিজের শহুরেত্ব-বোধেরও পরিচয় দিয়ে থাকে।

—বললাম—তুমি জেনেশুনে বুঝে-সুজে বোকার মত হাউ-মাউ করলে বলে। মনে পড়িয়ে দিলাম হে।

—কি মনে পড়িয়ে দিলে?

—মনে পড়ালাম—সংসারে মন্দটা আবার কোথা হে? গোপাল চৌধুরীর বেটা কলকাতাতে নাকি সিনেমাতে নামবে—। তা নামবে। তাতে দোষেরটা কি?

—মরণ দেখ আমার। দোষের তা বললাম কখন হে?

—দোষের বল নাই নাকি? তবে কথাটা বলারই বা কারণটা কি হল?

—হল এই যে এবার সীমের কি হবে?

—কি হবে? সীমে দুদিন বাদে বাড়ী যাবে, তা বাদে আর কাউকে বিয়ে-টিয়ে করবে।

—উঁ-হুঁ—উঁ-হুঁ। হল না। হল না।

—উঁ-হু লয়—হুঁ। তাই হল; তাই হল।

—না ঠাকুর। তা লয়। ই কালে মেয়েরা আর মানবে না, মানবে না, মানবে না। যে চৌকাঠ ডিঙিয়ে পালিয়ে এসেছে সীমে, সে চৌকাঠ পার হয়ে ঘরে আর ঢুকবে না। শেষকালে ওই দিদিমনি-টনি একটা কিছু হবে। দেখো। আর শুভেন্দু নাকি ওই ছবিতে নামা রাণী-সাজা লয় সখি-সাজা কোন রঙ্গিলা মেয়েকে বিয়ে করবে। লোকজনে এই কথা বলাবলি করছে বাপু। নিজ কন্নে আমি শুনে এসেছি। বন্নে বন্নে যা সত্যি তাই বলেছি, আর যার জন্যে এত চিন্তে, এত বাক্যি—সেই কন্যে, সীমেসুন্দরী—সে দিদিমনির বাড়ীতে থেকে বাড়ছে—চাকরি করছে, বলছে মরে যাব সেও ভাল—তবু বাড়ী যাব না। আর কন্যে হয়ে জন্মেছি বলে বিয়ে করতেই হবে তার মানে নেই, বিয়ে আমি করব না। শুভেন্দুর সঙ্গে কোন সম্পক্ক নেই আমার। সে যাক্ গে—যা মন তাই করুক গে! হোক গে সে বড়লোক।

অবাক বিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ফটিক বললে—মা ফুল্লরার দিব্যি? বন্নে বন্নে সত্যি বলছ?

—মা ফুল্লরার দিব্যি।

কথাটা খুব বাড়িয়ে বলা কথা নয়। সত্যি কথাই বলেছে নসুবালা। সীমা চাকরি করছে। সঙ্গে সঙ্গে বড় দিদিমনি—অর্থাৎ গার্লস

ইস্কুলের হেডমিস্ট্রেসের কাছে থেকে প্রাইভেটে পরীক্ষা দেবার জন্যেও তৈরী হচ্ছে।

এখানে রায়চৌধুরীদের হরিবিষ্ণুবাবু গার্লস ইস্কুল স্থাপন করেছেন। এবং সেই ইস্কুল নিয়েই আছেন। সেই ইস্কুলই এখন তাঁর জীবনের প্রধান অবলম্বন হয়ে উঠেছে। স্বাধীনতার আগে রায়চৌধুরারাই এখানকার সর্বাপেক্ষা ধনশালী রাজাতুল্য ব্যক্তি ছিলেন। ছিলেনই বা কেন, আজও তাই আছেন। তবে এককালে অর্থাৎ ইংরেজদের কালে, পরাধীনতার আমলে তাঁদের প্রতাপও ছিল রাজার মত। তারও আগে —অর্থাৎ দু পুরুষ আগে হরিবিষ্ণুবাবুর পিতামহ মাধববাবুর আমলে তাদের প্রতি শ্রদ্ধায় প্রেমে এখানকার মানুষেরা বিগলিত হয়ে যেত; মাধববাবুকে লোকে দেবতার মত ভক্তি করত। মাধববাবুই রাজ-সম্পদ উপার্জন করেছিলেন খনিজ বস্তুর ব্যবসায় করে। রাজ-সম্পদ অর্জন করেও মাধববাবু ছিলেন অসাধারণ, বিনয়ে ফলবান বৃক্ষের মত বিনত। হৃদয়ে ছিল মানুষের জন্য অগাধ ভালবাসা। এবং কীর্তির জন্য ছিল যত পিপাসা তত নেশা। এখানকার মাটিতে তিনিই নতুন কালকে এনে দিয়ে গিয়েছিলেন; হাই ইংলিশ ইস্কুল, চ্যারিটেবল ডিসপেনসারী, প্রাইমারী গার্লস ইস্কুল প্রভৃতি স্থাপন করেছিলেন তিনিই। দ্বিতীয় পুরুষে মাধববাবুর পুত্রেরা—সে কীর্তিকে রক্ষা করেছিলেন বটে কিন্তু দেশের লোকের প্রতি মাধববাবুর স্নেহ-প্রেম—তাঁদের ছিলও না এবং সেটা তাঁরা পছন্দও করতেন না। তখন তারা এখানে রাজসম্পদ দিয়ে জমিদারী কিনে রাজসম্মান অর্জন করে রাজার প্রতাপে প্রতাপান্বিত হয়ে মানুষকে শাসন এবং শোষণ দুইই করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাঁদের হুকুমে চাপরাসীরা থানার কাছাকাছি দোকান থেকেও দোকানদারকে বেঁধে ধরে তুলে নিয়ে এসেছে, মুসলমান প্রজা জলিল শেখকে থামে বেঁধে রাখতে হুকুম দিয়েছেন। এবং তা নিয়ে যতই দরখাস্ত এবং নালিশ হয়েছে সদরের আদালতে—সে নালিশকে অনায়াসে বাঁ হাত দিয়ে পাশে

সরিয়ে দিয়েছেন—সরকারের অনুগ্রহভাজন জমিদার ও ইংরেজের সমর্থক ধনশালী ব্যক্তি হিসেবে। তবে এ নিয়ে একটি বিরোধ নিত্য-ভূমিকম্প কম্পিত বিশেষ কোন পার্বত্য এলাকার মত গ্রামটিকে নিত্য চঞ্চল এবং কম্পিত করে রেখেছিল।

এতে রায়চৌধুরীদের বিরুদ্ধে যাঁরা বাদ-প্রতিবাদে প্রতিপক্ষ ছিলেন—তাদের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তি ছিলেন শ্যামাকিঙ্করবাবু। শেষ পর্যন্ত একদিন সে প্রায় বৎসর বিশেক আগে—১৯৩৮।৩৯ সালে তাঁরা গ্রামকে অন্ধকার করে দেবার জন্য এবং তাঁদের অভাবে গ্রামকে দরিদ্র করে দেবার জন্য গ্রাম ছেড়ে চলে গেলেন।

প্রথম গেলেন জেলার সদরে—তারপর গেলেন কলকাতায়—সেখানে ব্যবসায় সমারোহে ঐশ্বর্যের জুয়াখেলায় প্রমত্ত হলেন। প্রমত্ততার মধ্যে দানের পর দান হারতে-হারতে সম্বিৎ পেয়ে কলকাতা থেকে সরে গেলেন খনিঅঞ্চলে। এবং সেখানেই একদা লাগল পরস্পরের মধ্যে মতান্তর এবং মনান্তর। ফলে ঐশ্বর্য ভাগ হল।

তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে তাঁরা অকস্মাৎ অনুভব করলেন—তাঁদের নগদ টাকা এবং সোনা-দানার সম্পদ অনেক নষ্ট হলেও তাঁদের জমিদারী এবং ভূমি-সম্পত্তি কিছু যায় নি। তাঁদের রাজ্য আছে, কিন্তু রাজার প্রতাপ রাজার সম্মান, এবং মাধববাবু দেশের মানুষের কাছে যে প্রেম, যে শ্রদ্ধার কর গ্রহণের অধিকার অর্জন করে গিয়েছিলেন—তার আর কিছু অবশিষ্ট নেই।

অন্যদিকে তাঁদের অভাবেও গ্রামের মানুষ দিব্য বেঁচে রয়েছে—এবং তাঁদের উপর নির্ভর করবার সুযোগ নেই বলেই—তারা আজ স্বাধীনভাবে ছোট বড় মাঝারি রকমের ব্যবসা বাণিজ্য করে দিব্যি চালাচ্ছে। তাঁরাই করেছিলেন দুটো রাইস মিল—সে মিল দুটো আর তাঁদের নেই, মাড়োয়ারীরা দিব্যি চালাচ্ছে এবং একটা নতুন মিল করেছে গ্রামের গন্ধবণিকদের শিবু দে। শিবু দেও একসময় তাঁদের ঘরে চাকরি করেছে। ওদিকে ইংরেজ রাজত্ব যায় যায় হয়ে উঠেছে।

এবং কিছুদিন পর ১৯৪৭ সালে ইংরেজ রাজত্ব গেল। যেদিন গেল—সেদিন শ্যামাকিঙ্করবাবুকে দেশের লোক কলকাতা থেকে ডেকে আনলে। চন্দনপুরের স্বাধীনতার পতাকা তাঁকে তুলতে হবে।

এরপর গ্রামে ফেরা রায়চৌধুরীদের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু ১৯৪৭ সালের পর সমস্ত দেশটাই যখন স্বাধীন হয়ে আর এক রকম হয়ে গেল—তখন সেই সম্পূর্ণ অপরিচিত স্বাধীন ভারতবর্ষের মধ্যে—এই গ্রামটুকুকেই মনে হল অতি আপন অতি নিরাপদ। বাধ্য হয়ে তাঁরা দেশে ফিরলেন। এবং একান্তভাবে আপন গ্রামে পরের মত অনাত্মীয়ের মতই বাস শুরু করলেন। ওঁদের মধ্য থেকে একদা বেরিয়ে এলেন—হরিবিষ্ণুবাবু। মানুষটি বাড়ী থেকে বেরিয়ে খুঁজে খুঁজে নিজের পিতামহের পদচিহ্ন আঁকা পথটি ধরলেন। চন্দনপুরের শিক্ষা এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে এসে কাজ শুরু করলেন।

মাথায় খাটো মানুষ, বয়স পঞ্চাশ পার হয়েছে, সোনার মত দেহবর্ণ—মাথার চুলগুলি একেবারে সাদা হয়ে গেছে। এর খানিকটা বংশধর্ম খানিকটা যে এই বিপর্যয়ের ফল—তাতে কোন সন্দেহ নেই। হরিবিষ্ণু জন্ম থেকেই সম্মান ও অহংকারের সুখশয্যায় শায়িত, যখন হাঁটতে শিখলেন, তখন মাটির উপর পা ফেললেন মাটির মালিকানার অধিকার নিয়ে। যখন ছেলেদের সঙ্গে খেলার বয়স হল—তখন খুড়তুতো জাঠতুতো পিসতুতো মামাতো ভাইদের সঙ্গে খেলার গণ্ডি সীমাবদ্ধ রইল; যারা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকল সাধারণ ছেলেরা—তাদের সঙ্গে খেলতে নেই এই কথাটাই কেউ বলে দিলে তাঁকে। যখন ইস্কুলে ঢুকলেন তখন ইস্কুলের ফাউণ্ডারের পৌত্র এবং সেক্রেটারীর পুত্র পরিচয়টাই বড় হয়ে উঠল—ছাত্র পরিচয়ের চেয়েও। যখন কর্মজগতে ঢুকলেন তখন বয়স আঠারোর বেশী নয়—তখনই তাঁদের সাহেব ম্যানেজার থেকে জমিদারীর ম্যানেজার পর্যন্ত সসম্ভ্রমে নমস্কার করে বললেন—"আজ্ঞে না ওখানে না, এইখানে সই করুন। হ্যাঁ। সুতরাং আঠারো বছর

বয়স থেকে চুয়াল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত হরিবিষ্ণুবাবু মনের গড়নের ভিত গড়ে উঠেছিল এ অঞ্চলের মানুষের যেখানটায় তার পায়ের অনতিদূরে মাটিতে মাথা রেখে প্রণাম করেছিল সেইখানে এবং মনের দেউলের চূড়াটি উঠে তাকিয়েছিল ভাইসরয় এবং গভর্নরের লাট-প্যালেসের পাশে তার পার্শ্বচরের মত। সেখানে তার অপরিমেয় অহঙ্কারের কথা বলতে হবে না। কিন্তু এসবের সঙ্গে ছিল তাঁর একটি অসাধারণ ব্যক্তিসত্তা এবং আশ্চর্য এক তীক্ষ্ণবুদ্ধি মন। কর্মপারঙ্গমতা ও মেধার দিক দিয়ে তাঁর মত কৃতী কর্মী সকলকালেই দুর্লভ। এই দুর্লভ মনটিই তাঁকে শক্তি দিল প্রেরণা দিল—সকল সঙ্কোচকে সরিয়ে ফেলতে। সব সরিয়ে ফেলে তিনি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-ক্ষেত্রে আঞ্চলিক কর্মীর দায়িত্ব তুলে নিয়ে দেশের সেবক হয়ে বসলেন। এবং সত্যকারের কর্মীই হয়ে উঠলেন তিনি। দুধারি তলোয়ারের মত কর্মক্ষমতা হরিবিষ্ণুবাবুর। একদিকে তিনি ইঞ্জিনীয়ারের কাজে অর্থাৎ বাড়ী তৈরীর প্ল্যান এস্টিমেট থেকে সব পাবেন—আবার সরকারী দপ্তর থেকে ওয়ান-থার্ড দিয়ে টু-থার্ড টাকা বের করে আনার পথও জানেন। একসময় ডিস্ট্রিক্ট স্কুল বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি। এবং তাঁর সময় বোর্ডের কাজ যে গোটা প্রদেশের মধ্যে সব থেকে ভাল এবং কলঙ্কজীর্ণহীন গৌরবের সঙ্গে চলেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। অন্যদিকে ইস্কুল চালাতেও জানেন। এখানে শিক্ষকেরা কেউ কেউ তাঁর ব্যক্তিত্বকে অহঙ্কারদুষ্ট বলে অপবাদ দেন বটে, কিন্তু তাতে হরিবিষ্ণুবাবু বিচলিত নন। ওটুকু তিনি বজায় রাখতে চান।

ইস্কুলের ছাত্রী থেকে শিক্ষয়িত্রী পর্যন্ত সকলেই তাঁকে কাকাবাবু বলে।

এই হরিবিষ্ণুবাবুই সীমাকে বোর্ডিংয়ে একটা চাকরি দিয়েছেন।

সেদিন থানা থেকে সীমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন দিদিমনিরা।

নিয়ে গিয়েছিলেন আবেগের বশে। সীমা যা করেছিল—তা যেন খুব একটা মহৎ কাজ করেছে বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু স্কুলের এবং ছাত্রী নিবাসের হেডক্লার্ক—এবং অ্যাসিস্টান্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যখন বললেন—কাজটা তো ঠিক হয় নি বাবু! তারা প্রশ্ন করেছিল —কেন?

হেডক্লার্ক বলেছিলেন,—দেখ, সীমা তো রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ হবে না বা ডক্টরেট পেয়ে দিগগজও হবে না। সুতরাং বিয়ে করবে না এটা তো খুব সুস্থ কথা ভাল কথা নয়। বিয়ে করাটা তো একটা খারাপ কাজ এ কথা কেউ বলবে না। আর বিয়েই যদি করবে না —তবে গোড়াতেই বলে নি কেন?

তর্ক করেছিলেন শিক্ষয়িত্রীরা। তর্কে ঠিক হারেন নি তবে ক্রমশই যেন আপনা থেকেই দুর্বল হতে দুর্বলতর হয়ে পড়েছিলেন। ভেতর থেকে কেউ যেন বারবার বলতে শুরু করেছিল—তাই তো! তাই তো! তা হলে!

সীমার সৌভাগ্য বলতে হবে—। দিনকয়েক পরেই বিকেলে সদর থেকে কাকাবাবু অর্থাৎ হরিবিষ্ণুবাবু এসে উপস্থিত হয়েছিলেন।

হরিবিষ্ণুবাবুর কাছে সীমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন বড় দিদিমনি। হরিবিষ্ণু বড় দিদিমনির মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—এ সব কি কাণ্ড বাধিয়ে ফেলেছ তোমরা? ইস্কুলের দুর্ণাম রটে যাবে যে!

বড় দিদিমনি এম. এ. পাস করেও এখনও কুমারী রয়েছেন। তিনি বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন—আপনিও এই কথা বলছেন?

—তা বলছি বৈকি! এর মধ্যেই তো এই রকম কথা চার-পাঁচজন বললে আমাকে।

—কি বললে?

—বললে—কি হরিবিষ্ণুবাবু, আপনার গার্ল্‌স হাই ইস্কুলের না কি নামবদল হচ্ছে? হরিবিষ্ণু বালিকা বিদ্যালয় নাম পাল্টে 'চিরকুমারী ব্রতধারিণী শিক্ষায়তন' নাম রাখছেন!

বড় দিদিমনি মিস করুণা রায় চুপ করে অন্য দিকে তাকিয়ে যেন নিজের মধ্যেই মগ্ন হয়ে গেলেন।

হরিবিষ্ণুবাবু বললেন—কি, চুপ করে রইলে যে?

এবার তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে করুণা রায় বললেন—ভাবছিলাম কাকাবাবু।

—কি ভাবছিলে? রেজিগ্‌নেশন দিয়ে একটা নাটক করবে কিনা?

—না, ঠিক নাটক করবার অভিপ্রায় আমার নেই তবে রেজিগনেশন দেওয়াটাই ঠিক করে ফেলেছি—ওর মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করবার মত বাকী কিছু রাখি নি।

—হুঁ। সে জানি আমি। তার আগে এইটে নাও। দেখ। একখানা কাগজ তিনি তাঁর হাতে তুলে দিলেন। কাগজ নয় চিঠি। একখানা অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার। হরিবিষ্ণু গার্লস ইস্কুলের সেক্রেটারী সীমা আচার্যকে মেয়েদের বোর্ডিংয়ে সুপারভাইজার নিযুক্ত করছেন। মাইনে চল্লিশ টাকা আর ফ্রি বোর্ডিং।

পড়েও সঠিক বুঝতে পারলেন না করুণা রায়—কাকাবাবু কি বলতে চাচ্ছেন। করুণা বললেন—সীমা তো পরীক্ষার জন্যে তৈরী হচ্ছে। সে চাকরি করবে কি করে?

—চাকরির ডিউটি—বুঝে নেবে তুমি হোস্টেল সুপারইণ্টেণ্ডেণ্ট হিসেবে। সে তো তোমার হাতে। এবং সে ডিউটি তুমি নির্ধারিত করবে। আমার ইচ্ছে সকালবেলা মেয়েদের জলখাবার দেবার সময় একবার দাঁড়ানো। আর একবার তরকারী কোটার সময়। বুঝলে না! আবার বিকেলে জলখাবার দেবার সময় এবং রাত্রে খাবার সময়। বাস্।—কি? এখনও যে তাকিয়ে রয়েছ বোকার মত! মেয়েটা পরীক্ষা দেবে তা তো বুঝলাম। কিন্তু হাওয়া খেয়ে গাছতলায় থেকে তো পরীক্ষা দেওয়া যায় না এবং পরের পোষ্য হয়ে, সে তুমি বড় দিদিমনিই হও আর বড়দিদিই হও, তোমার পোষ্য হতে

হলে ও তো মনে খুব স্বস্তি পাবে না। তোমার মেজাজও সব সময় ঠিক না থাকতে পারে।

এবার দিদিমনির মুখ প্রসন্ন এবং প্রদীপ্ত হয়ে উঠল, একটা উচ্ছ্বাস তার অন্তরের মধ্যে ঝড়ো হাওয়া তুলেছে, তারই প্রেরণায় কিছু বলতে গেল সে। কিন্তু হরিবিষ্ণু বাধা দিয়ে বললেন—সবুর। যা বলবার পরে বলো। আগে শেষ করতে দাও আমাকে। পরীক্ষার পর ওর কি হবে? বাপের বাড়ী ফিরে যাবে? কিরে সীমা? তাই যাবি? যেতে পারবি? বাবা ঘরের দরজা খুলবে?

মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল সীমা।

হরিবিষ্ণু বললেন—ধর্, যদি পাশই করলি—তারপর?

এবারও চুপ করে রইল সীমা। উত্তর খুঁজে পেলে না।

হরিবিষ্ণু বললেন—তারই জন্যে এই ব্যাপারটা করে দিলাম। এই চাকরিটা নিয়ে আরম্ভ কর্। Start life—তারপর—।

এবার সীমা এগিয়ে এসে হরিবিষ্ণুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। সঙ্গে সঙ্গে গভীর কৃতজ্ঞতায় চোখ ফেটে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পায়ের উপর পড়ল।

একটু হাসলেন হরিবিষ্ণু এবং নিজের হাতখানি সীমার মাথার উপর রাখলেন। বললেন—কাঁদিস নে। পড়্ ভাল করে। বুঝলি। পাশ করতে হবে। এবং করা চাই। করুণা এর দায়-দায়িত্ব—মানে ও যাতে পাশ করতে পারে তার দায়িত্ব তোমার উপর অর্ধেকটা অন্তত রইল।

হেসে প্রসন্নকণ্ঠে সোৎসাহে করুণা বললে—সে ভার আমি নিলাম কাকাবাবু। 'আর আপনাকে যে কি বলব—

—তা বুঝতে পারছ না। আমি বলি কি—কিছু বলে কাজ নেই। কারণটা কি জান? কারণ মতামতে তোমরা যাকে প্রগ্রেসিভ বল বাপু তা আমি নই। আমি রি-অ্যাকশনারী। দেখ, আমি ছেলের বিয়ে দিয়েছি। বউমা আমার গ্রাজুয়েট, পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে

এম-এ পড়ছিল। বিয়ে দিয়ে এনে পড়া ছাড়িয়ে তাকে বাড়ীর ঠাকুর-দেবতার পূজো সেবার ইনচার্জ করে দিয়েছি এবং বলে দিয়েছি পুরনো আমল থেকে যা নিয়ম আছে তার পান থেকে চুন খসলে চলবে না। সেও তাতে অমত করে নি। তবে যদি তাকে একহাত ঘোমটা দিতে বলি—কি বলি ফেরতা দিয়ে কাপড় পরতে পাবে না, কিংবা স্বামী-স্ত্রীতে একসঙ্গে সিনেমা দেখতে যেতে পাবে না, তাহলে সে নিশ্চয় আমার হুকুম মানবে না। সীমা ওই একটা অসভ্য মন্তপ টাকাওলাকে বিয়ে না করে চলে এসেছে—সেটা এমনি রকমের বড় একটা কিছু—এবং লোকের মনে খুব চমকও লেগেছে এতে। আমি সত্যি বলতে ওর কাজ সমর্থন করি না—তবুও কিছুতেই অস্বীকারও করতে পারছি না। কিন্তু—

চুপ করে গেলেন হরিবিষ্ণুবাবু।

কথা শেষ হয় নি—কিন্তু বলে থেমেছেন—আবার বলবেন এই অপেক্ষা করে করুণা এবং সীমাও চুপ করেই দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু না, হরিবিষ্ণুবাবু আর কিছু বললেন না। এবার করুণা বললে—তা হলে এখন যাই কাকাবাবু!

হরিবিষ্ণুবাবু বললেন—যাবে? দাড়াও। আরও একটু চুপ করে থেকে হরিবিষ্ণু বললেন—সীমা!

—বলুন!

—একটা সত্যি কথা বলবি আমাকে?

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে সীমা মৃত্ব স্বরে বললে—বলুন!

—তুই কি? আবার একটু চুপ করে থেকে হরিবিষ্ণুবাবু বললেন—জিজ্ঞাসা করছি শুভেন্দুর সঙ্গে বারকয়েক রেসিটেশন করেছিস—হুবার তোদের ছাত্র ইউনিয়নে থিয়েটারও করেছিস—তোর কি—। বুঝতে পারছিস কি জিজ্ঞাসা করতে চাচ্ছি আমি?

মুখখানা রাঙা হয়ে উঠেছিল সীমার। সে মাটির দিকে চোখ

রেখে অনুচ্চ কিন্তু পরিষ্কার কণ্ঠে উত্তর দিল—না। আপনার পায়ে হাত দিয়ে বলতে পারি।

—পাশ করে কি করবি ?

—আরও পড়ব আমি।

—বেশ—বি-এ—এম-এ ; তারপর ?

—চাকরি-বাকরি করব।

—বিয়েই করবি নে ? না, শুভেন্দুকে বিয়ে করবি নে ?

উত্তর দিল না সীমা। হরিবিষ্ণু বললেন—তুই শুনেছিস—শুভেন্দু বাড়ী থেকে চলে গেছে ? অনেক টাকা 'রোজগার না করে ফিরবে না—প্রতিজ্ঞা করে গেছে। সিনেমায় নামবার সংকল্প করে গেছে। তা সম্ভবতঃ পারবেও।

সীমা একথার জবাব দিল না। করুণা বললে—মিথ্যে ওকে এসব কথা বলছেন কাকাবাবু। আমি জানি—শুভেন্দুর সঙ্গে ওর এই বিয়ে না করে পালিয়ে আসার কোন সম্পর্ক নেই। এবং বিয়ের উপরেও একালের মেয়েদের মানে আমাদের কোন বিতৃষ্ণা আছে তাও নেই। তবে যার-তার সঙ্গে বাপ-মায়েরা গলায় দড়ি বেঁধে আটকে দেবে—এ বিয়েতে আমাদের আপত্তি।

—হুঁ। আচ্ছা যাও তোমরা।

করুণা এবং সীমা আবার তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে চলে গেল। হরিবিষ্ণুবাবু চুপ করে বসে রইলেন। একটা সিগারেট ধরিয়ে অলস ভাবে টানতে টানতে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

শুভেন্দু একজনকে বলে গেছে সে সিনেমায় নেমে ভাগ্য পরীক্ষা করবে। সিনেমার নায়কেরা একালে নাকি লাখ লাখ টাকা উপার্জন করে। সবাই না অবশ্য। দু-একজন—।

হ্যাঁ। এ যুগে সিনেমা-নায়কেরা এবং নায়িকারা শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান এবং ভাগ্যবতী তাতে সন্দেহ নেই।

এরা ধনী বলে মানুষেরা এদের ঈর্ষা করে না। ধিক্কার দেয় না।

দুনিয়ায় যাই করুক—তার জন্য কোন কৈফিয়তই কেউ দাবা করে না।

সিগারেটটা ফেলে দিয়ে আবার সিগারেট ধরালেন। একটু হাসি খেলে গেল তাঁর মুখে। এককালে তিনি খুব ভাল অভিনয় করতেন। খুব ভাল। তিনকড়ি চক্রবর্তী নরেশ মিত্তির—এদের সঙ্গেও তিনি অ্যামেচারে অভিনয় করেছেন। তখন তাঁর রূপও ছিল। যৌবন এবং সেই রূপ তাঁর যদি আজ থাকত—তবে তিনিও নেমে দেখতেন সিনেমায়। এই ইস্কুল কলেজ হোস্টেল এই নিয়ে টাকা খরচ করে হাজার ঝঞ্ঝাট পুইয়ে এমন করে তাঁর বংশের হারানো মান-সম্মান ফিরে পাবার জন্য এইভাবে জীবন কাটাতে হত না।

বছর দুয়েক আগে মোটর অ্যাকসিডেণ্টে তাঁর স্ত্রী মারা গেছেন। তাঁর স্ত্রী থাকতে জীবন এমন হয়ে যায় নি। আজ জীবনে কোনখানে কোন মধু নেই মাধুর্য নেই—। অর্থ তাঁর আছে তাতেও নেই। সংসার-জীবনে নেই। ছেলে বউ এরা বেশ আছে, তিনি এই নেশায় পড়ে আছেন। শুধু জীবনে প্রতিষ্ঠা। তাঁর ইচ্ছে আছে পলিটিক্সে নামবেন—এম-এল-এ হবেন—, মিনিস্টার হবেন—জীবনটা সম্মানের সমারোহে ভরে যাবে। তিনি দেশের সেবায় নিজেকে নিঃশেষিত করবেন। হ্যাঁ শেষেরটুকুও আছে বই কি। আছে।

হ্যাঁ। একালে হয় সিনেমা নায়ক নয় পলিটিক্যাল হিরো। হয় ছবির হিরো—নয় রাজনীতি ক্ষেত্রের হিরো।

অকস্মাৎ সশব্দে হেসে উঠলেন হরিবিষ্ণুবাবু। অনেকক্ষণ হাসলেন।—ঠিক কথা, হয় ছবিতে বা স্বপ্নের রাজপুত্র—নয় গণতন্ত্র মতে রাষ্ট্রশক্তির অধিকারী রাজপুত্র বা রাজপুত্রের মেজ সেজ ছোট ভাই বা খুড়তুতো জাঠতুতো বা মাসতুতো পিসতুতো—কোন একটা তুতো ভাই।

শুভেন্দু স্বপ্নলোকের—ছবির লোকের রাজপুত্র হতে গেছে। তিনি—রাজনীতির ক্ষেত্রে ঘুরছেন।

সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার সিগারেট ধরালেন হরিবিষ্ণু।

নসুবালা সেদিন সিঁড়ির অন্ধকারের মধ্যে চুপচাপ বসে এই সমস্ত বিবরণ শুনেছিল। সে এসেছিল হরিবিষ্ণু দাদাবাবুর কাছে মাগনের তরে। অর্থাৎ ভিক্ষের জন্যে। দাদাবাবু সন্ধেয় এসে সকালে চলে যায়। থাকলেও ধরা যায় না। সারাটা দিনই ঘুরছে দাদাবাবু। এসেই কপালে হাত দিয়েছিল—হায় নেকন! কারণ তখন হরিবিষ্ণুবাবুর সঙ্গে করুণা দিদিমণির কথাবার্তা চলছিল। সীমা করুণাদির পাশে দাঁড়িয়েছিল; নসু একবার উঁকি মেরে দেখেই কপালে হাত দিয়ে পিচ কেটে—চুপচাপ ওই সিঁড়িতে বসে অপেক্ষা করছিল—কতক্ষণে করুণাদির সঙ্গে দাদাবাবুর কথাবার্তা শেষ হবে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই এই কথাবার্তার বৈচিত্র্যের মধ্যে ডুবে গিয়ে শুধু শুনেই গিয়েছিল। করুণাদি আর সীমা যখন ঘর থেকে বের হল তখন একপাশে একটা আড়াল জায়গা দেখে সরে বসেছিল। কারণ একটা ভয় হঠাৎ তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। দাদাবাবু যদি জানতে পেরে তাকে ধমক দিয়ে বলে—কেন—কেন এমন করে চুপি চুপি কথা শুনছিলি তুই! এরপর এইসব কথা ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে ছড়া বেঁধে—।

হেই মা রে!—কি হবে? যদি দাদাবাবু ডাকে—মহাবীর সিং—বাঁধো ইস্‌কো!—হেই মা গো!—

প্রাণপণে নিশ্বাস বন্ধ করে সে একটা অন্ধকার আড়ালে দেওয়ালের সঙ্গে সেঁটে দাঁড়িয়েছিল। করুণাদি এবং সীমা চলে যেতেই সে বেরিয়ে আসবে এমন সময় নিচে আবার কার সাড়া পাওয়া গেল। কে উপরে উঠছে! আবার সে দেওয়ালের সঙ্গে সেঁটে দাঁড়িয়ে রইল।

রক্ষা কর মা ফুল্লরা! রক্ষা কর! হেই মা রক্ষা কর

—বাবু!

—কে?

—আমি সনাতন মুহুরী।

—এস। কি ব্যাপার?

—কখানা পাট্টা সই করাবার আছে।

—পাট্টা? আবার এখন পাট্টা? জমিদারী তো অনেকদিন গিয়েছে!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। যে সব খাস পতিত এর ওর নামে বেনামী বন্দোবস্ত করে রাখা আছে—সেইগুলোর জন্যে—আনরেজিস্টারী পাট্টা-কবুলতি করে রাখা দরকার। শুনছি কংগ্রেসী বাবুরা সব খোঁচাখুচি করবে। আজ হুমকি কাল হুমকি—তাই ম্যানেজারবাবু এই ব্যবস্থা করেছেন। কবুলতি সই হয়ে গিয়েছে—পাট্টা সই করে দেবেন আপনি।

—আনো।

সনাতন মুহুরী, সে-প্রায় এক বোঝা দলিলের একটা মোট তাঁর সামনে টেবিলের উপর রাখলে।

হরিবিষ্ণুবাবু হেসে ফেললেন,—বললেন—এ যে গন্ধমাদন সনাতন!

—আজ্ঞে—আড়াই শো খানা এতে আছে—এ ছাড়া আরও তৈরী হচ্ছে।

—এ সবই কি বেনাম করা রয়েছে?

—আজ্ঞে না, সত্যি বন্দোবস্তও আছে—তা প্রায় অর্ধাঅর্ধি হবে।

—রেখে যাও—সই করব অবসর মত। আমি কাল দিন-রাত্রিটা আছি। ম্যানেজারবাবুকে বলো—কবুলতির বোঝাটা একবার দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। হ্যাঁ?

—আজ্ঞে বলব। আমি তা হলে যাই এখন?

—না, বসো। দরকার হলে দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি তো! বসো। এরপর আর বসে থাকে নি নম্বুবালা। সন্তর্পণে দেওয়াল

ধরে-ধরে গোল-সিঁড়ি নেমে বেরিয়ে এসেছে। মনে মনে একটা ভয় হয়েছে—সে সেই অনেকক্ষণ আগে থেকে লুকিয়ে বসে এইসব কথাবার্তা শুনেছে তার জন্য।

সেই কথাই সে বললে বেয়াই ফটিক দাসকে। বললে—সে তো বেয়াই অনেক কথা! সে সব কথার বাঁক কি পাক কি ধার কি! সব কি বুঝি, না বুঝতে পারি! তবে বুঝলাম এই যে সীমে শুভেন্দুকে বিয়ে করবে না। আর শুভেন্দু—সিনেমাতে রাজপুত্তুর সেজে অ্যানেক টাকা রোজগার করবে।

তারপরই বলে উঠল—হায় নেকন!

হেসে ফটিক বললে—ক্যানে, নেকন আবার কি করল?

—কি করলে? বলি বেয়াই এই কথা নাকি শুধোয়—না শুধাতে হয়?

—ক্যানে গো? দোষ কি হল?

—বলি তুমি তো কানা লও?

—না, কানাও লই—কালাও লই—

—তাই তো বলছি। শুভেন্দু কার লাতি গো? কার বেটার বেটা: আঃ যার ঠাকুরদাদার পেতাপে বাঘে-বলদে এক ঘাটে জল খেয়েছে। নোকে রাজা বলে—তা-ই ছিল—রাজা বাদশা! মেজাজ কি!

—হ্যাঁ। রাজত্ব গিয়েছে। এখন রাজপুত্তুর না সাজলে তো কেউ রাজপুত্তুর হবে না। আর গিয়ে, বুয়েছ. সে নাকি মজার রাজত্বি গো।

—আর মজার রাজত্বি। আঃ, সব গেল গো! সব গেল।

—কি গেল?

—কি গেল না বল? রাজাবাবুরা গেল, রাণীমারা গেল, রাজ-পুত্তুররা গেল, রাজকন্যেরা গেল। বামুনের পৈতে গেল, মেয়েদের ঘোমটা গেল, কোঁচানো কাপড় গেল, ছেলেগুলা চোঙা পেণ্টুলান পড়লে—মেয়েগুলা ফেরতা দিয়ে কাপড় পরলে—ঠোঁটে রঙ দিলে।

রান্নাশাল ভাঁড়ার ঘর ছেড়ে ইস্কুলে ছুটল। রব ধরলে—বিয়ে করবে না। আর কি করবে—বল? কি থাকল বল!

এবার ফটিক দাস হাসলে। বললে—তা ভাল; অনেক ভাল। এ অনেক ভাল হল বেয়ান।

—ভাল হল বলছ? সীমের কি ভাল হল?

—হল কি না তুমিই বল? বিয়ে করে তো দু'দিন প'রে ডাইভোর্স গো।—

—ডাইভোর্স? সেই ছাড়াছাড়ি—আইনের কথা বলছ নাকি?

—হ্যাঁ।

চুপ ক'রে গেল এবার নসুবালা। বিয়ে হলে সে বিয়ে সীমার টেঁকবে না? ফটিক বললে—ই ভাল বেয়ান। এই দেখ আমার বউটা পালিয়ে গেল। তাতে ভাই বুকে দাগা আমার লেগেছে। তার থেকে এমনি বিয়ে-টিয়ে না করা ভাল। সীমা তোমার বেশ করেছে। লেখাপড়া শিখে চাকরি-বাকরি করবে।

হঠাৎ একটা দমকা বাতাসে আলোটা নিভে গেল।

অন্ধকার যেন কোন্ আড়ালে আবডালে লুকিয়েছিল—মুহূর্তে ঝপ ক'রে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল তাদের উপর। তারা চুপ ক'রে বসে রইল।

নসু সেই অন্ধকারের মধ্যে বসে থাকতে থাকতে—হঠাৎ বললে—একখানা গান গাই,—না,—কি বল?

—বেশ ভাল দেখে বুঝেছ?

নসু ধরলে সেই পাগলের গান। অন্ধকারের গান।

"আহা ভাই রে! ও-তোর আলোর তরে ভাবনা কেন হায় রে!
অন্ধকারেই পরাণপাখী সেই দেশেতে যায় রে।
সেথা চন্দ্র সূর্য লম্ফ পিদীম তাইরে নাইরে নাইরে!"

—না! অন্ধকারের মধ্যেই হাত বাড়িয়ে তার হাতখানা চেপে ধরলে ফটিক দাস।—না! ও গান থাক বেয়ান।

—তা হ'লে? কি গান ধরব বল?

—রঙের গান গাও হে ! মরণ তো আছেই। রঙ আজ আছে কাল নাই। পলাশফুলের পালার মত। এল ডাল ভেঙে। পাতাঝরা মরার মত ডালের সর্বাঙ্গে ফুল। বাস, মাস খানেক মাস দেড়েক —তা বাদেই সব শেষ। গেয়ে লাও ভাই।

নসু ধরলে—অনেক দিনের পুরনো গান :—

গোপনে মনের কথা বলতে দে গো আঁধার গাছতলায়
ঠা-ণ্ডা শীতল সাঁঝ বেলায়।

শোন—পা-খীরা, গাছের ডালে ঝোটন নেড়ে জোটন বেঁধে কলকলায়।

ঝুঁঝকি আঁধার দিপি দিপি জোনাক মেলা
মনের কথা ফিসিফিসি বলার পালা
বিনি সূতোর মালা-বদল এক পহরের রঙের খেলা
আদ্যিকালের বংশী বাজা—কদমতলার গানের পালায়।
গোপনে মনের কথা বলতে দে—গো !

বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে যখন চন্দনপুরের মানুষ মাটি নদীনালা গোটা দেশ এবং দুনিয়ার সঙ্গে রকেটের বেগে ঘুরন্ত এক কুমোরের চাকে চেপেছে নূতন গড়নের জন্য, নানান বিচিত্র পাত্রের গড়নে গড়ে উঠছে এবং বিজ্ঞান-বুদ্ধির চুল্লীতে পুড়ে পাকা হচ্ছে—তখন এই দুটি মানুষ আদিম কালের দুটি মাটির ঢেলার মত এক পাশে পড়ে তাদের গায়ে ঘাসের রোমাঞ্চ জাগিয়ে ফুল ফোটাচ্ছে এবং শুনছে মৌমাছির গুঞ্জন গান এবং ভাবছে এই চিরকালের রঙের গান। আঁধার গাছতলায় সন্ধ্যাবেলা ছাড়া রঙের গান—প্রেমের পালা হয় না। ওরা জানে না এযুগে, ডাকে—তারে—চিঠিতে চলে সে পালা। বাতাসে ভেসে আসে ওই চিঠির কথা পরস্পরের কানের পাশে।

শহরে কফি হাউসে, পার্কের বেঞ্চে, রেলিংয়ের গায়ে ঠেস দিয়ে দিনেদুপুরে কথা হয়। পালা চলে। সে ওরা জানে না।

চিঠিতে কালির অক্ষরে মনের কথা খামের গোপনীয়তার মধ্যে দিয়ে আসে। কখনও হারায়—কখনও সন্দেহক্রমে কেউ খোলে বটে তবে দু চারটে ক্ষেত্রে, সকল ক্ষেত্রে নয়। এবং একালে কি বিচিত্রভাবে যে প্রেম হয়!

মাস তিনেকেরও বেশী। এরপর সীমা একখানা চিঠি পেল। চিঠিখানা ডাকে এসেছে, কিন্তু সরাসরি ডাক মারফত তার কাছে নয়—এসেছে আশু সিংহীকে পোস্ট বক্স ক'রে।

আশু সিংহী অপ্রত্যাশিতভাবে পত্র পেলে একখানা। বেশ বড় খামও বটে। মোটাও বটে। চমকে উঠল প্রেরকের নাম দেখে। লেখা—এফ—এস—ইউ অর্থাৎ ফ্রম শু—।এ সংকেতটা আশু জানত। আগেও দু-চারবার চিঠি লিখেছে শুভেন্দু কলকাতায়—সিনেমার ব্যাপার নিয়ে। এখানেও কখনও-সখনও ওদের বাড়ীর রাখাল কি মাহিন্দার চিরকুটের চিঠি নিয়ে এসেছে—তাতেও এই সই থাকত। এস অক্ষরটা এমনভাবে লিখত যে সেটা এস ও সি দুটোই হত, অক্ষম মনোগ্রামের মত এস-এর তলার বাঁকা অংশটাকে বাড়িয়ে সামনে একটু টেনে দিত।

আশু চিঠিখানা খুললে। বড় খাম—মোটা খাম। অনেক কথা লিখেছে সে। যাক একটা দুর্ভাবনা গেল। খবরটা পাওয়া গেল শুভেন্দুর।

আশুকে লেখা চিঠির সঙ্গে আর একখানা আকারে একটু ছোট খাম।

তাতে ছাপার হরফের মত সযত্নে খুব সুন্দর করে লেখা—সীমা। সাধারণ খাম। দুটো চিঠিতে চিঠিটা মোটা হয়েছে; আশুর চিঠিটাও বেশ বড়, ছোট নয়।

লিখেছে—

ভাই আশু,

প্রথম ভেবেছিলাম আত্মহত্যা করব। কিন্তু সে লজ্জা এ লজ্জার থেকে অনেক বেশী। বাবা সেটা করতে গিয়ে একটা আঘাতের পর আর আঘাত করতে ভয় পেয়েছিলেন। হয়তো প্রথম আঘাতটা কম জোরে করে ফেলেছিলেন। অথবা অভিনয় করতে অতি অভিনয় করে ফেলেছিলেন। আমি তা' করব না। ওতে আমার ঘেন্না আছে। আমি নতুনকালের মানুষ। আমি ওকালের পুরনো রোমান্স—আমার মর্যাদা গেল, এ বলে তো মরব না। মরতে পারব না। বলিনি একদিন যে, খবরের কাগজে মোটা হরফে বেকার যন্ত্রণায় আত্মহত্যা লিখবে,—এ আমার কাছে অসহ্য। তার থেকে তো ডাকাতি করা ভাল ;—যদি খেটে খেতে না পারি ! রোগ-যন্ত্রণায় আত্মহত্যা আমার কাছে যুক্তিগ্রাহ্য। কিন্তু এর প্রতিকার তো করতেই হবে। তা না হ'লে আত্মহত্যা নয়—বাড়ীর লোকের—দেশের লোকের আমাকে বিষ দিয়ে মেরে ফেলা উচিত। র‍্যাট-কিলার বিষ বেশী করে দিয়ে মারা উচিত। কারণ বিধাতার সৃষ্টির বাজে খরচ নাকি ইঁদুর। যুক্তিতে তা হলে আমি ইঁদুর।

আশু থামল। একটু না হেসে পারলে না। শুভেন্দু বেশ মুডের উপর চিঠিখানা লিখেছে। বিষণ্ণতার বিষক্রিয়া—মনের গুমোট ভাবটা কেটে গিয়েছে। সীমার চিঠিখানা ঘুরিয়ে দেখলে। খুব যত্ন করে বন্ধ করেছে। একটু নেড়েচেড়ে রেখে দিলো তারপর আবার নিজে চিঠি পড়লে।

তাই ভাগ্যের সন্ধানে বেরিয়ে প্রথমে ভেবেছিলাম সিনেমায় নামব অথবা থিয়েটারে। আজও ভাগ্যের সন্ধান পায়নি, তবে হাঁটছি। ক্লান্ত হইনি। দুটো ঘটনা একসঙ্গে ঘটল। বাবার ঘটনা—সীমার ঘটনা। সীমার ঘটনাতেও কাণাঘুষা শুনলাম—সীমা অন্য কাউকে ভালবাসে—নইলে কখনও শুধু পড়ব বলে পালিয়ে আসে কেউ ? এবং আমার নামটা এল তার সঙ্গে—কানের টানে মাথার

সঙ্গে চুলের মত। আমার বুক কেঁপেছিল—ভয়েও বটে এবং আনন্দেও বটে। বুঝেছিলাম সীমা আমাকে ভালবাসে। আমি চিঠি লিখলাম। বেশ কাব্য করে এবং কৌশল করে লিখলাম—তুমি যখন দেবযানীর মত প্রেম ভুলে যযাতির মত রাজার রাজ্যসম্পদে লুব্ধ হওনি, তখন কচের মত আমিও দেবকার্য সাধনের জন্য অভিশাপ মাথায় করে চলে যাব না। চৌধুরী বাড়ীর গৌরব, তোমরা আমরা ভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ--এ সব ভুলে যাব। এবং তোমাকে পাশে নিয়ে দাঁড়াব কষ্টের দুনিয়ায়। নেলিকে দিয়ে পত্র পাঠিয়েছিলাম। নেলি এসে বললে—পত্রের উত্তর সে দেয়নি। মুখে বলেছে - দূর-- দূর। তাকে ওসব ভাবতে বারণ করিস। প্রেম-ট্রেম নেই আমার। আমি পড়ব।

আমার মাথায় তখন তাপ জমেছে। বেশ সুস্থ ছিলাম না। মানে যে অবস্থায় মানুষ অসম্ভব কিছু করতে পারে সেই অবস্থায়। মানে—সীমা যদি বলত হ্যাঁ প্রেমই বটে, তবে আমি ওকে বিয়েই করে ফেলতে পারতাম। কি খাওয়াব কি খাব—কি হবে এসব ভাবতাম না। আমার এ উত্তর শুনে দুঃখ হল। আমার প্রেমে পড়েনি ? আমার কি কোন যোগ্যতাই নেই ? ওকে আমার প্রেমে পড়তেই হবে। বাধ্য করতে হবে। কি করে বাধ্য করব ? ভাগ্য চাই, ভাগ্য। একজন কৃতী লোক হতে হবে। বাড়ীর দুঃখ ঘোচাব, সীমাকে প্রেমে পড়তে বাধ্য করব। বেরিয়ে পড়লাম ওই কমপেনসেশনের একশো টাকা নিয়ে। এসেছিলাম কলকাতায়। প্রথম ছবির রাজ্যেই চেষ্টা করলাম ভাগ্যসন্ধানের। শ্যামাকিঙ্কর-বাবুর কাছে যাইনি। গেলেই তিনি ধরে বাড়ী ফিরে পাঠাতেন, জানতাম। খবর কি তাঁর কাছে আসবে না ? গিয়েছিলাম দেশের পরিচয়ের দাবীতে স্বপন সিংহ ডিরেক্টারের কাছে। চন্নপুরের নাম শুনে তিনি আমাকে আসতে বললেন স্টুডিওতে। গেলাম। আমাকে জনতার মধ্যে একটা পার্ট—সিনেমায় বলে এক্সট্রা দিলেন। ভদ্রলোক

গরীব লোকের মিলোনো ভিড়। আমাকে গরীব লোক—তাও বয়স্ক লোকের পার্ট দিলেন। অনুগ্রহ একটু ছিল এর ভেতর। পার্টটার মুখে কথা ছিল। আমি পার্টটা ভাল করলাম। অনেকে তারিফ করলে। বললে টাইপ পার্টে আমি ভাল করব। প্রথমেই তারিফ কম কথা নয়। স্বপনবাবুর অ্যাসিস্ট্যাণ্টরা ঠিকানা চাইলে। বললে—ওরা বলে দেবে—দু-চার জায়গায় টাইপ পার্ট হলে ডাকবে। স্বপনবাবু খুশী হয়ে দশ টাকা দিলেন পাঁচ টাকার জায়গায়। কিন্তু আমার ও কথা ভাল লাগল না। টাইপ পার্ট থেকে যদি জনতার মধ্যে একটি কোন তরুণের পার্ট আমাকে দিতেন এবং পারিশ্রমিক কিছুই না দিতেন তবে আমি খুশী হতাম—আশান্বিত হতাম। আশা থাকত—কোনদিন আমি নায়ক হিরো হতে পারব। এ ছিল একটা গেঁয়ো ক্যাবলার পার্ট। মনের মধ্যে সীমার কথার নতুন মানে খুঁজে পেলাম। মেয়েরা বলে নাকি, বরের রূপ চায়; রূপের অভাব পূর্ণ করতে পারে—এক গুণ আর বীর্য। আমার রূপ নাই। বর হবার মত রূপ নাই এ কথা স্বপনবাবুর মত লোক বলে দিলেন। শ্যামাকিঙ্করবাবুর কথাও মনে পড়ল। নাচে রূপ আর গায় স্বর। সিনেমায় প্লে ব্যাকে সুস্বরের অভাব সহজে মেটানো যায়, ছবি বিশ্বাস নায়ক সেজে গান গেয়েছে কিনা বলতে পারিনে। একালের উত্তমকুমার ঠোঁট নেড়ে হেমন্ত-কুমারের গলায় গান গায়—কেউ ধরতে পারে না। কিন্তু রূপের অভাব মেক-আপেও মেটানো যায় না। সুন্দরকে বীভৎস করা যায়, ভয়ঙ্কর করা যায় কিন্তু সুষমা লাবণ্য—যে সুষমা-লাবণ্যে নায়ক সাজে—তা মেক-আপে আসে না। স্বাস্থ্যে কিছুটা পূরণ করে। আমি তাই ও ভূতটাকে নামিয়ে দিয়ে বলেছি—তুমি এস। আমি রাম কবচ নিয়েছি। যাও!

চলে গিয়েছিলাম কলকাতা ছেড়ে। ঘুরলাম। পায়ে হেঁটে ট্রেনে বাসে। একশো টাকা ছিল, তার সঙ্গে জুড়ে নিয়েছি—আংটি, দুটো আংটি ছিল পৈতের সময়ের, বোতাম—ফঙফঙে অবশ্য, ঘড়িটা

—বেচে আর একশো করে ঘুরেছি। দুর্গাপুর—সেখান থেকে আসানসোল—সেখান থেকে রাউরকেল্লা এসে একটা চাকরি মিলিয়ে নিয়ে ছিলাম। মাসখানেক কাজও করেছিলাম। গতরের কাজ। যাতে দেহখানা ভেঙে নতুন করে গড়ে ওঠে। বুকের ছাতিটা চওড়া হয়ে ওঠে। কিন্তু সইল না। অসুখে পড়ে ছেড়ে দিলাম। ও দুর্দান্ত খাটুনি ওরাই পারে। ওই সায়েবরা আর আমাদের দেশের পাঞ্জাবীরা। এখানে যার কাছে কাজ মানে খাটতাম—সে একজন জার্মান সায়েব। লোকটা চিমনী রিবেট করছিল। আমি যোগাতাম তার সরঞ্জাম। একদিন লোকটা পড়ল উপর থেকে, —নিচে সদ্য-ভরাট-করা মাটি ছিল তাই পড়ে মরল না—হাতের কব্জীটা ডিসলোকেশন হল—পায়ের অ্যাঙ্কেল ছাড়ল। আমি নিচে ছিলাম—ভারার মাঝামাঝি জায়গায়। যে কারণে সায়েব পড়ল সেই কারণে আমিও পড়লাম। সায়েব দোতলা থেকে আমি একতলা থেকে। ভাই আমারও লেগেছিল যথেষ্ট, কিন্তু সায়েবের মত নয়। তবুও সায়েব উঠল সাত দিনে—আমি পনের দিনে বেরিয়ে এলাম হাসপাতাল থেকে, তারপর শুরু হল জ্বর আমাশয়। সায়েব দশ দিনে কাজে লাগল। আমি আঠারো দিন পর গিয়ে বললাম—এ কাজ আমি পারব না। রিজাইন করছি। দুর্গাপুরে একজন পাঞ্জাবী লরীওয়ালাকে দেখেছিলাম—তার দুখানা লরী—গাছতলায় গ্যারেজ আর সেইখানেই ছোট একটা টিন দিয়ে ঘিরে ঘর। শুনেছিলাম পাঞ্জাবের রেফুজী, দুর্গাপুরে ডি. ভি. সি'র ব্যারাজ আরম্ভের সময় একটা গাই মোষ নিয়ে এসে ওই গাছতলায় আশ্রয় নিয়েছিল। দুধ বেচত। একটা মোষ থেকে দুটো তারপর একে একে তিনটে গাই করে গাছতলাটাকে গোয়াল বানিয়েছিল। গাছটা এমন ঝাঁকড়া হল যে এক ফোঁটা জল পড়ত না। তারপর সব গাই মোষ বিক্রি করে একটা লরী এবং একটা থেকে দুটো লরী ক'রে ব্যবসা চালাচ্ছে। বাঙালীকে কত্তারা দোষ দেয়—আমরা তা পারি না বলে। পারব কি ক'রে?

বত্রিশ ইঞ্চি ছাতি মেলে না—সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা বাঙালী মেলে না। তা হ'লে তো সিনেমা লাইনেই থাকতাম। ছবি বিশ্বাস বুড়ো হয়েছে। মেক-আপে আর জোয়ান দেখাবে ক'দিন?

যাই হোক—ও চাকরি ছাড়লাম—আমার জার্মান মিস্ত্রী কর্তা বললে—তুমি স্টোরে কাজ কর। একটা পোস্ট খালি আছে।

বললাম—তা জানি সায়েব। কিন্তু ওটাতে গ্রাজুয়েট চাই। আমি তো ম্যাট্রিকুলেট।

সে বললে—যাও যাও। লিখবে তো হিসেব। তার আবার গ্রাজুয়েট। তুমি লেগে যাও আমি লাগিয়ে দিচ্ছি। টেম্পোরারী হয়ে লাগো। তারপর কাজ ভাল হলে ট্রেড ইউনিয়নের যুগে তোমাকে ছাড়াবে কে?

লাগলাম। মাইনে বেশী হল। সবসুদ্ধ নিয়ে দুশো টাকার বেশী। দিন তার পড়ে কত হিসেবে—আট টাকা প্রায়। কিন্তু বিপদ হল—ওই গ্রাজুয়েট নই। সত্যিই আশু, এ যুগে তোদের লাইনে কবরেজী চলে না—অন্যখানে অগ্রাজুয়েট চলে না। বিচিত্র যন্ত্রপাতি, তার পার্টস—তার নাম বিচিত্র—বানানে ঠেকলাম। নাম শুনেছিলাম প্রপার নাউন—ওতে নাকি বানান ভুল হয় না। মিথ্যে কথা। দিন পনের কাজ করে নিজেরই লজ্জা হল—পনের দিন পরই মাইনে মিলল—মাস শেষ হল। আমিও রেজিগনেশন দিয়ে সরে পড়লাম। কলকাতায় এসেছি। পড়ছি। আই-এ দেব। এ বছর সীমা ম্যাট্রিক পাস করবে—। ওর আগেই আমাকে গ্রাজুয়েট হতেই হবে। একটা কিছু তো চাই-ই—যাতে অন্তত বলতে পারি—নায়ক হবার মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন আমার আছে। এই দেখ সীমা আমার গ্রাজুয়েট হবার সার্টিফিকেট। আর রূপ না থাক—ছাতি আমার ছত্রিশ ইঞ্চি। রমেন্দের মত কালো ধুমসোকেও আমি ধরাশায়ী করতে পারব। একটা দিনের বেলার চাকরি পেয়েছি। শ্যামাকিঙ্করবাবুর একখানা পত্র দেখিয়েছিলাম পরিচয়পত্র হিসেবে। কাজ দিয়েছে খুব। আশী

টাকা মাইনে। ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে বই ঝাড়াঝুড়ির কাজ। রাত্রে কলেজ।

এইবার তোকে অনুরোধ—। আমার বাড়ীতে বাবা মা নেলি রইল—তাদের অসুখে-বিসুখে দেখিস। টাকা-পয়সার হিসেব রাখিস—আমি দোব। নিশ্চয় দোব। তুই যে দেখবি সে আমি জানি। এবং আমার পিতাকে জানি—তিনি ফি-টি দেবেন বলবেন—দিতে পারবেন না। তুই সেইটে মেনে নিস।

দ্বিতীয় অনুরোধ—তোর নামে টাকা পাঠালাম। একশো টাকা। ইস্কুলে নেলির মাইনেটা দিয়ে দিস—আর হেডমিস্ট্রেসকে অনুরোধ করিস তিনি যেন নেলিকে বলে দেন—তোমাকে ফ্রি ক'রে নেওয়া হল। বাকীটা সীমার জন্য। ও এসে আশ্রয় পেয়েছে দিদিমণিদের কাছে। হয়তো প্রাইভেটে পরীক্ষা দেবে। কিন্তু খরচ আছে তো। পাঁচজনের দানে সীমা পড়বে—এটা আমার সহ্য হচ্ছে না। সে আমার প্রেমে পড়েনি কিন্তু আমি তার প্রেমে ধপাস করে পড়ে গেলাম। যতক্ষণ আমার চিঠি পেয়ে সে নেলিকে না বলেছে—দূর দূর, ততক্ষণ আমার মনে প্রেমের কিচ্ছু ছিল না। বেশ দাঁড়িয়ে ছিলাম—চৌধুরী বাড়ীর ভাঙা দালানের ছাদে। যেন ওই কথাতে—আমি রেগে লাফ দিয়ে হাড়গোড় ভেঙে পড়লাম।

ওকে একটা চিঠি দিলাম। এটা তোকে পৌছে দিতে হবে। এর মধ্যে তোকেও যা লিখেছি—তাই লিখেছি। হয়তো একটু সরসতর হয়ে থাকবে। শেষের অংশটা—অনুরোধের অংশ থেকে শেষটা থাকল না। টাকার কথাটা থাকল—লিখলাম—"যদি তোমার আপত্তি না থাকে তবে পড়ার খরচের জন্য আমি তোমাকে বন্ধুর দাবিতে সাহায্য করতে চাই। তুমি রাজী হলে টাকা আশু দেবে তোমাকে। তুমি আমাকে ভালোবাস না বাস—টাকাটা নিলে খুশী হব। পরে তুমি শোধ করো। গান আছে—জীবন এত ছোট ক্যানে, আমার কাছে জীবন ছোট নয়। মস্ত বড়। এ কালে তো মস্ত বড়।

আগে বিলেত যেতে জাহাজে এক মাস লাগত। এখন তিন দিনও লাগে না। সুতরাং দশ গুণের উপর বেড়ে গেছে। বেড়ে গেছে বদলে গেছে। সুতরাং নিলে তুমি কেনা হবে না এবং দেনা হলেও শোধের সময় পাবে।"

দেখিস কি বলে।

শিবনাথ দে'কেও একখানি পত্র লিখলাম। লোকটি অন্যের চোখে যাই হোক—আমার কাছে উপকারী মানুষ। এক পয়সা ছাড়বার মানুষ নয়। গুণবান মানুষ ধার্মিক মানুষ মহৎ মানুষ—আমি বলি না, তবে ও আমাদের উপকারী মানুষ। ওঁকে লিখলাম—বাড়ীর প্রয়োজন মত টাকা দিতে। বিশেষ দরকারে টাকা লাগলে ধানে শোধ হবে—বা হবে না এটা যেন না ভাবেন। আমি শোধ দেবই। রোজগার থেকে না পারি জমি আমাদের আছে—তাই বিক্রী ক'রে দেব।

বাড়ীতেও পত্র দিয়েছি। ছোট চিঠি। ভাল আছি—কিছুদিন পর যাব। আর যে একশো টাকা নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম সেটা পাঠালাম।

আর একটা কথা। সীমার পত্রের ব্যাপারটা যেন গোপন থাকে। ওটা যেন প্রকাশ না পায়। দোহাই। একদিকে অমর চক্কোত্তি। অন্যদিকে গাঁয়ের প্রান্তে নস্যুবালা। সে খবর পেলে হয়। ভাদু গান বেঁধে গেয়ে বেড়াবে। যেদিন বাবার কাণ্ড এবং সীমার কাণ্ড হয়, সেদিন রাত্রে শিবনাথ দে বাবাকে দেখতে এসেছিল। যখন ফিরে যায় তখন তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে ওর বাড়ীর দোর পর্যন্ত গিয়েছিলাম। শুনলাম ফটিক দাসের বাড়ীতে গান হচ্ছে।

নাকের বদলে নরুন—ফুলের বদলে বিলিতি বেগুন—

সীমার বদলে ক্ষমা—ও মন রসনা তাই ঘুনা ঘুন—ঘুন। দোহাই। আমার ভালবাসা নিস। ইতি—

আশুর ভারী ভাল লাগল চিঠিখানা। আজ এক নতুন চেহারা নিয়ে শুভেন্দু তার সামনে দাঁড়াল। ভারী ভাল মুডের চিঠি। এটাই যদি তার জীবনের মনে স্থায়ী রূপ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তবে তো ও জিতে গেল। ও তো হাঁস হয়ে গেছে। জলে পাঁকে দুধে যেখানে ডুব দিক, পালকে লাগবে না একটি বিন্দুর দাগ। কিন্তু আশ্চর্য। কি করে হল? কি ক'রে হয়? "চন্দনপুর গ্রাম—জমিদারী উচ্ছেদের ওপাশে অর্থাৎ পিছনদিকে কর্ণওয়ালিশের আমল তাই বা কেন, আলিবর্দীরও আগে থেকে জমিদারের আড়ং। এখানকার মাটি পর্যন্ত জমিদার। আলিবর্দীর আমলে রাজনগরের নবাবের অধীনে চৌধুরীরা জমিদার। তারপর কর্ণওয়ালিশের আমল থেকে এ পর্যন্ত গ্রামের সব ব্রাহ্মণ বাড়ীই জমিদার বংশের ফ্যাকড়া, ডাল থেকে ঝুরিনামা কাণ্ডের মত চৌধুরী বংশের দৌহিত্র। বাঁড়ুজ্জে বেশী—চাটুজ্জে-মুখুজ্জেরা কম জমিদার হয়েছে। তারা নতুন জমিদারী কিনে চন্দনপুরের প্রতাপ আরো বাড়িয়েছে, চন্দনপুরের উঠোন বাঁধিয়েছে প্রজাদের মাথা কুটিয়ে; চারদিকে পাঁচিল তুলেছে জমিদারী ইজ্জতের, ছাদের উপর চিলে কোঠা তুলেছে দম্ভের। চৌধুরীদের নূতন শাখা মাধবলাল এসে তাতে ওয়ারেন হেস্টিংস কর্ণওয়ালিশের কোটপ্যান্টের সঙ্গে গড়গড়া এবং বাঈজী নাচের সিম্বিসিসের মত জমিদারী কয়লার ব্যবসার আয়ে —ইংরিজিয়ানা ইংরিজী ইস্কুল –ই রিজী মেজাজ ঢুকিয়েছিলেন। সাহেব ভক্তি ও ভয়ের আনুগত্যের বিনিময়ে রায়বাহাদুরী অর্জন ক'রে চন্দনপুরকে স্বর্গ না হোক যক্ষপুরী বানিয়েছিলেন। এরা আর যাই হোক—মানুষেতর কিছু ছিল। অন্তত যাকে যক্ষ বলা যায়।"

কথাগুলি আশুর নয়, কথাগুলি শ্যামাকিঙ্করবাবুর। তিনি বলেন —"স্বাধীনতার পর যক্ষপুরী অধিকারে এল মানুষের। যক্ষবাড়ী-গুলিতে নোনা ধরল। নোনা ধরা বাড়ী হলে কি হবে—এ পুরী থেকে বেরিয়ে বাইরে এলে যক্ষেরা মানুষ হয়ে যাবে ভয়ে তারা ঘরের অন্ধকারে লুকোল। তেমনি যক্ষপুরী চৌধুরী বাড়ী। যার প্রতীক

ঠাকুরবাড়ীর ভাঙা ফটকটা বাড়ীটার সর্বাঙ্গে নোনা। ঝুরঝুর করে ঝরছে। জবুথবু স্থবিরের মত দাঁড়িয়ে আছে। শক্ত হাড়ের মত শক্ত গাঁথুনী। পুরনো জ্যাম ধরা লোহার ফটক।”

আগে শুভেন্দুর বোলচাল কথাবার্তা যত আধুনিক হোক যক্ষপুরীর জবুথবুত্ব ছিল এবং যক্ষপুরীর রোমাঞ্চ মায়াও ছিল। সেটা ফুটত তার রোমান্টিক নায়কের অভিনয়ে—ফুটত তার ফিল্ম জগতে নাম করে মনোরম—বিশ্বপ্রিয় হবার সাধের মধ্যে। শুভেন্দুকে সে ওই তার বাবার অদৃষ্টের দুর্ঘটনার দিনেও দেখেছে। ভয় পেয়েছে। ছেলেটা না কিছু করে বসে। মারাত্মক কিছু। শ্যামাকিঙ্করবাবুর একখানা বইয়ে পড়েছে—অর্ধশিক্ষিত জমিদারের ছেলে—যে সৎ মা তাদের সকল দুর্দশার মূল—গৃহত্যাগিনী বলে অপবাদ আছে—সেই সৎমায়ের অপবাদের কথা কোন প্রজা উদ্ধতভাবে বলেছিল বলে সে তাকে গুলি ক'রে মেরেছিল। শ্যামাকিঙ্করবাবুর সকল জীবন ও চরিত্র এখানকার। ওই প্রকৃতি চন্দনপুরের যক্ষতনয়ের প্রকৃতি। শুভেন্দু তেমনি কিছু করে না বসে।

আশ্চর্য সেই শুভেন্দু!—কোথায় কোন্ রন্ধ্রপথ ভেদ করে ঢুকল—মানুষের জগতের আলো বাতাস—নতুনকালের দিন—যার স্পর্শে মোচন হয়ে গেল তার যক্ষত্বের।

॥ ১৭ ॥

চিঠিখানা সীমার কাছে পৌঁছে দেবে কি করে? আশু চিন্তিত হল। দেওয়া সহজ হবে না। অন্তত সকলজনকে গোপন করে দেওয়া অসম্ভব।

—ডাক্তারবাবু!

—কে?

—আমি মাশায়। নিমাই!

ওঃ—বাতব্যাধিগ্রস্ত নিমাই! নিজেদের স্বৈরিণী কন্যাদের যৌন-ব্যাধির বিষে জর্জর নিমাই! রাত্রে কাতরায়। গ্রামপ্রান্তে ঘর—তার কাতরস্বর—গ্রামবাসীদের নিদ্রাভঙ্গ করে না। কেবল শিবনাথ দে ওদের পাশের বিস্তীর্ণ জমি আয়ত্ত করে বাড়ী ক'রেছে বলে সে মধ্যে মধ্যে শুনতে পায়। আর শোনে—নস্থ ও ফটিক দাস।

আশু জিজ্ঞাসা করল—কি হল? কি চাই? ওষুধ?

—দেন বাবু! মরে যেছি। ওঃ। কিন্তুক তার লেগে লয়। একবার সাবিকে দেখে এসেন। তার বেষম জ্বর। কেমন লাগছে! হাসপাতালে নিয়েই বা যাবে কে? আমি তো এই খোঁড়া।

—ভবানীবাবুর কাছে গিয়েছিলি? তাঁকে বলগে।

—আজ্ঞে কাল গিয়েছিলাম বিকেলে।

—কি বললেন? পারবেন না তো বলবেন না তিনি।

—তিনি মশায় খাপ্তাখাপ্পা হয়ে বকছিলেন—ওই জাঙলহাটার মোড়লদিগে। আমি বলতে নেরেছি। পালিয়ে এলাম।

—এখন যা। এখন আর খাপ্তাখাপ্পা হয়ে নেই।

—তিনি বাড়ীতে নাই। সিউড়ী যেয়েচেন।

—তাই তো! তবে? আমি গেলাম না হয় একবার কিন্তু তাতে হবে না। হাসপাতালে পাঠাতে হবে। দেখতে শুনতে তো লোক চাই!

ভবানীবাবু এগুলি করে। ঐ গুণেই এখনও এখানে সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শত্রুমিত্র, সেই যে তর্পণে আছে যে অবান্ধব যে বান্ধব যে জ্ঞাতি যে অজ্ঞাতি আমার জল নাও, ঠিক তেমনিভাবেই ভবানীকিঙ্কর মৃতের শবদেহ স্কন্ধে শ্মশানে যায়, নদীতে স্নান করে ওই মন্ত্রে জল দেয়। শুধু মৃত্যুর পরই নয়—মানুষ বিশেষ করে দরিদ্র মানুষের রোগে সে শয্যাপার্শ্বে গিয়ে দাঁড়ায়—। সে এখানকার কংগ্রেসের প্রধান, হাসপাতালে গিয়ে ব্যবস্থা করে দেয়। দুর্ভিক্ষে মহামারীতে অগ্নিদাহে জলপ্লাবনে সে সর্বাগ্রে ছুটে যায়। এক বছর আগে প্রবল বন্যা হয়েছিল—আশেপাশের দুটো জেলায় একের তিন

ভাগ ডুবেছিল। সরকারী কর্মচারীরা জিপে বোটে যেসব স্থানে পৌঁছেছিলেন, তাদের আগেই ভবানীকিঙ্কর হেঁটে বুকভরা জল ঠেলে সেখানে পৌঁছেছিল—মানুষকে অন্তত 'ভয় নাই' কথাটা বলেছিল। ফিরে এসে বাড়ীতে বুকের যন্ত্রণায় অধীর হয়ে প্রায় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। আশুই চিকিৎসা করেছে, বিনা পয়সাতেই সে তাকে বহু কষ্টে সুস্থ করেছিল। তার হৃৎপিণ্ডের ধ্বনির মধ্যে সে শুনেছিল, আর পারছি না। আর পারছি না।—এই কথা। ভবানীকিঙ্কর বিচিত্র—চারদিন পর আবার বেরিয়েছিল। কিন্তু হলে কি হবে। যক্ষপুরীর যক্ষরক্ত দেহে আছে—তার ক্রিয়া যাবে কোথায় —লোকটি অসম্ভব ক্রোধী। যার প্রাণ রক্ষা করে সেও তার এই ক্রোধের জন্য তার কৃতজ্ঞতা সপ্রেমে জানাতে গিয়ে ফিরে আসে। আরও একটি খুঁত আছে। সে খুঁত লোকটির লেখাপড়া বিমুখতা। কাগজ কলমের সঙ্গে তার বনিবনাও নেই। যক্ষের সম্পত্তি তাদেরও বেশ ছিল। তার কাগজপত্র ছিল একখানা ঘর বোঝাই। তার কিছু অবশেষে নেই—দেখবার লোকের অভাবে। কংগ্রেসের প্রধান। তারও খাতাপত্র বোধ হয় নেই। যা আছে তা ভবানীবাবুর পকেটে কুলোয়। তবে সরল মানুষ। হৃদয়বানও বটে। যারা এ যুগে অচল। তবু ওই এক কারণে চলে। আশু যাবে একবার সাবিকে দেখে আসবে। সঙ্গে বরং ভবানীবাবুর ছেলে জগন্নাথকে নিয়ে যাবে। ছেলেটি বাপের গুণ পেয়েছে। তবে অগুণ ক্রোধটি পায়নি। ওকেই সঙ্গে নেবে। সে-ই গাড়ীর ব্যবস্থা করবে। আরও একবারের গাড়ী চাই। সে ভবানীবাবু এসে করবে। সাবিকে শ্মশানে নিয়ে যেতে হবে। ওই সাবিরা সবই মরবে। একে একে। "যত যক্ষপুরীর কালের যৌন অসংযমের পাপের ভারা—ওদের ঘাড়েই চাপানো আছে—যক্ষপুরীর কাল গত হবার পর ওরা যাচ্ছে। ওদের ফেলছে ভবানীবাবু ভালোই করছে। পাপক্ষয় হচ্ছে যক্ষবংশের।" এও শ্যামাকিঙ্করবাবুর কথা। এ কাজ তিনিই প্রথম করতেন—প্রথম যৌবনে। তিনিই বোধ হয়

সর্বপ্রথম যক্ষপুরী থেকেই বৈরাগ্যবশে ও আলোর আহ্বানে বেরিয়ে এসে পথে দাঁড়িয়েছিলেন। দেশসেবা সমাজসেবার ধ্বজা তিনিই এখানে উঁচু করে তুলেছিলেন। তিনি চলে গেলেন এ সব ছেড়ে সাহিত্যকর্মে। তাঁর পরিত্যক্ত ধ্বজাপতাকা ভবানীবাবু তুলে নিয়েছে।

—ডাক্তারবাবু! কম্পাউণ্ডার ডাকলে।—কলে যাবেন না? রোগী তো সব অনেকক্ষণ চলে গিয়েছে।

—ও। আচ্ছা। ডাক্তার বের হল। ঘড়ি দেখলে, এগারটা পার হয়ে গেছে।

সামনে বি-ডি-ও আপিসে লোকারণ্য আজ।—কি ব্যাপার আজ?

কম্পাউণ্ডার বললে—রাস্তা। সব নতুন রাস্তা হবে। বড় রাস্তা থেকে গাঁয়ের রাস্তা। তাই মিটিং। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মেম্বাররা এসেছে।

—আচ্ছা।

—তুমি আমাদের হেমন্ত মাস্টারের ছেলে? ডাক্তার? এক সবল প্রৌঢ় মণ্ডলমশাই জাতীয় লোক এসে সামনে দাঁড়াল।

—হ্যাঁ।

লোকটি বললে, তোমার বাবা আমার বন্ধু ছিল। ফোর্থ ক্লাস পর্যন্ত একসঙ্গে পড়েছিলাম। আমার নাম রঘুনাথ ঘোষ। বাড়ী রামডাঙ্গা।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। নাম শুনেছি আপনার। তিরিশ সালে পিকেটিং করতে গিয়ে মার খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন।

—শুনবে বই কি। সে সব অনেক কথা। পড়াই ছেড়ে দিলাম। এখন পাকু ঘোষ বলে নাম। বুঝেছ! মানে সব কাজেই আমি নাকি পাক লাগাই। তা অন্যায় হলেই লাগাই। এক নম্বর আপত্তি আমি দিই। বিষয়কর্মেও মামলা-মকদ্দমা করি। তা বাপু একবার তোমার দোকানে বসব। কাগজ চাই, কলম চাই। দরখাস্ত লিখব। দরখাস্ততে আপত্তি দোব। লিখিত আপত্তি। নইলে ওরা সব লিখবে না।

—বেশ তো বসুন। কম্পাউণ্ডার রইল—কাগজ কলম সব দেবে। ওহে নবনী। এঁকে কাগজ কলম দাও তো।

—একখানা ভাল ফুলস্ক্যাপ কাগজ চাই। না থাকে তো কিনে আসুক। দেখ, এই যে সব কাণ্ড দেখছ সব নিজের পাতে ঝোল। সব নিজের গাঁয়ের রাস্তা হলেই বাস। তার ওপর চুরি। এক টাকা খরচ লেখে—চার আনা ছ আনার কাজ—দশ আনা ট্যাক বন্দী। গতবারে—কংগ্রেসের ওপর ক্ষেপে কম্যুনিস্টকে ভোট দিয়েছি। সে সব তখন কত ফতোয়া। ও দুই সমান। আমার গাঁয়ের একপোয়া পথ, এক হাঁটু কাদা বর্ষার সময়, খরাতে ধুলো—রাজপুতনার মরু-ভূমি। ঝড় যখন ওঠে তখন সে যদি দেখ! ওঃ! তা দেবে না—ওই এক পোয়া রাস্তায় টাকা দিতে বলবে না দু পক্ষেই। আমি লিখিত আপত্তি দোব। আর গতবারে রাস্তা যা হয়েছে তার খরচের তদন্ত করতে বলব।

ডাক্তার মনে মনে অসহিষ্ণু হয়ে বললে—আমি যাই। কলে যাচ্ছি। আপনি বসে লিখুন।

—আচ্ছা। আচ্ছা। আমাদের ওদিকে কলে গেলে আমার বাড়ী যেও। বুঝেছ?

—যাব। নিশ্চয় যাব। নমস্কার।

—মঙ্গল হোক বাবা। আমি লিখি—তুমি যাও।

অয়েলস্কিনে মোড়া শোলা হ্যাটটা মাথায় চাপিয়ে আশু সাইকেল হাতে বেরিয়ে পড়ল।

সামনে অনেক লোক। বি-ডি-ও আপিসে এসেছে সব। এ অঞ্চলের বিশিষ্ট জনেরা। এখানে না চেপে সাইকেলটা ধ'রে নিয়েই হাঁটতে লাগল। চন্দনপুরের কুমোরের চাক ঘুরছে এখানে। পুরনো ভেঙে নতুন। মাঠ ভেঙে রাস্তা। মানুষ গাড়ীতে চড়ে ছুটবে, যেখানে যেতে চায়—কোথায় তা জানে না, তবে সামনে না হেঁটে

উপায় নেই ; নইলে পিছনের ধাক্কায় পড়তে হবে মরতে হবে—। পিছনে হটাও যায় না ঃ কারণ মানুষের পায়ের পাতাগুলো সামনের দিকে লম্বা—চোখ দুটোও সামনের দিকে। তা যেখানে যেতে চায় (সেখানে সুখ আছে) সেখানে এমন পায়ে হাঁটা হেঁটে যাওয়া যায় না। যাবে না। তাই জীপে চড়ে ছুটবে।

এরই মধ্যে এক পাশে পুতুল নিয়ে বসে আছে ফটিক দাস। মধ্যে মধ্যে খাতা পেন্সিলে ছকছে কিছু। অন্য দোকান তো চন্দন-পুরের জীবনযাত্রার যন্ত্রের সঙ্গে জোড়া হয়ে—পথের দুপাশে পাকা দোকানে পাতা অনেক দিন থেকে আছে। ফটিকদাস এবং ফটিক দাসের মত পথে বসা দোকানদার দু-চারজন।

সাইকেলের ঘন্টা বাজাতে বাজাতে চলল ডাক্তার। কিন্তু নিজে-দের মধ্যে লোকেরা এমন তর্কমগ্ন যে ঘন্টাও কানে যাচ্ছে না।

—আশুবাবু! আপনি ডাক্তার আশুবাবু? পিছন থেকে কেউ ডাকলে।

—হ্যাঁ।

—নমস্কার। আমি—

—আপনাকে চিনি। আপনি আমাদের এম-এল-এ সীতানাথবাবু।

—হ্যাঁ। আপনার সঙ্গে দু মিনিট কথা বলব।

—বলুন।

—এখানেই? কলে যাচ্ছেন বুঝি?

—হ্যাঁ। একটু পাশে চলুন, দাঁড়াই। হবে না?

—না। চলুন বলতে বলতে যাই। নইলে আপনার দেরি হবে। কথা এমন কিছু নয়। একটা খবর নেব। শুনেছি আপনি মেয়েদের হোস্টেলে ডাক্তার। না?

—হ্যাঁ। ওখানে দেখি আমি।

—ঠিকই শুনেছি আমি। একটা খবর আমি চাচ্ছি।—বন্ধুভাবে, ভদ্রলোক হিসেবে—

—বলুন।

—অমর চক্কোত্তির মেয়ে সীমা। সে ওখানে থাকে।

—হোস্টেলে থাকে না, হেডমিস্ট্রেস ওকে আশ্রয় দিয়েছেন।

—ওই হল।

—না। হল না। হেডমিস্ট্রেস ব্যক্তিগতভাবে আশ্রয় দিয়েছেন। ইস্কুল হোস্টেল—এ ধরনের দায়িত্ব নেয়নি। কারণ সকলে সীমার পালিয়ে আসা সমর্থন নাও করতে পারে। আপনি এখানকার এম-এল-এ। অমর আপনাদের লোক—

—প্রতিবাদ করব। অমর আমাদের লোক নয়। পার্টির সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই।

—নেই? কিন্তু সে তো গতবার কংগ্রেসের টাকা খেয়েছে, আপনাদের কাজ করেছে।

—করেছে। হ্যাঁ করেছে। কিন্তু আমাদের পার্টির লোক সে নয়। ওরকম লোক আমরা পার্টিতে নিই না। যেমন আগেকার কালে কংগ্রেস করত।—এখন তারা রুলিং পার্টি, তারা দল বাড়ানোকেই বড় কাজ ভাবে। তাই যে আসে তাকেই নেয়। সৎ অসৎ বাছে না। তে-হট্টার অসীম চাটুজ্জে তিরিশ সাল থেকে খুনে পুলিস সাহেব সামসুদ্দোহার অনুচর ছিল। কোমরে রিভলভার বেঁধে ঘুরে বেড়াত। তার কীর্তি মুখে বললে পাপ হয়। সে লোকটা আজ গ্রাম কংগ্রেসের সভাপতি। সেও গতবার কংগ্রেসের কাজ মুখে করেছে কাজে করেনি। ওখানেই ভোট আমি বেশী পেয়েছি। তেমনি অমর চক্কোত্তি কংগ্রেসের লোক—বিশ্বাসঘাতকতা করেছে—আমাকে ভোট দিইয়েছে। তাতে সে আমার লোক না। আমার লোক সে নয়। কম্যুনিজিমে ভগবান নেই। আমি কম্যুনিস্ট, কিন্তু বামুনের ছেলে, জাত মানি না, কিন্তু ছেলেমেয়ের বিয়ে বামুন ছাড়া দিইনে দিতে পারিনে। ভগবানও তাই। মানিও না, আবার না-মানাও নই। বাড়াতে শালগ্রাম আছে—জমি আছে—সেবা চালাই।

পলিটিক্সে মিথ্যে বলি। কিন্তু মিথ্যে যে বলে তাকে ঘেন্না করি। আর আপনাকে আমি মিথ্যে কথা বলছি না। অমর চক্কোত্তিও কংগ্রেসের লোক—রমেশও তাই। যারা কোন পলিটিক্যাল পার্টির লোক হতে পারে না। হওয়া উচিত নয়। আর আমি অমর চক্কোত্তির হয়ে কথা বলতে আসিনি। আমি খুশী হয়েছি—সীমার সাহসে, সে যা করেছে তাতে। আমি যা জিজ্ঞাসা করছি তা এই। শুনেছি—সীমাকে খেতে দেওয়া হয় হোস্টেলে—তার জন্যে তাকে ঝি বা রাঁধুনীর মত খাটানো হয়। একটা ভূতুড়ে ঘরে নাকি থাকতে দেওয়া হয়েছে। সেইটের সত্য মিথ্যে আমি জানতে চেয়েছি।

—ও চক্কত্তি মশাই। ও গো! ডাকছে ওখান থেকে সীতানাথকে।

—যাচ্ছি।···সত্য কথাটা আমি জানতে চাই।

—দেখুন, আমি বললেও তো বিশ্বাস করবেন না আপনি।

—কেন করব না। নিশ্চয় করব।

—সীমা ওখানে গিয়ে একদিন পরে হেডমিস্ট্রেসকে বললে—দেখুন—আমি এখানে থাকব—খাব—তা এমনি কেন নেব এসব। আপনার রান্নার কাজটা আমি করে দিই। নইলে আমার ভারী খারাপ লাগবে। তবে আমার খরচও তো কিছু হবে। কাপড় বই এ সবে। আপনি রান্নার লোককে খেতে দেন থাকতে দেন মাইনে দেন। আমাকে দেবেন। হেডমিস্ট্রেস তাতে রাজী হননি। বলেছিলেন, না, সে আমি পারব না। কথাটা হরিবিষ্ণুবাবুর কানে যায়। তিনি খুব খুশী হয়ে বলেন—তুমি গার্লস হোস্টেলে রান্নার তরকারী কি হবে—এসব যদি দেখাশোনা কর—তা হলে তুমি হোস্টেলে খাবে—থাকবে—মাইনেও পাবে দশ টাকা হিসেবে। কাজের লোক কাজ করবে—তুমি দেখেশুনে দেবে। আমাদের রাখতে হত এরকম লোক। তা তুমিই আরম্ভ কর। আর ভূতুড়ে ঘর-টর নয়। সেও প্রবাদ বাক্য। একটা ছোট ঘর পড়ে থাকত। ছোট এক কারণ, দ্বিতীয় কারণ ও-বাড়ী ভূতনাথ বাঁড়ুজ্জের বাড়ী—ভূতনাথের প্রথম

স্ত্রী বিষ খেয়ে মরেছিল কিন্তু ও ঘরে নয়, তবে ওই ঘরটা ছোট বলে ওইটেতে ভূত হয়ে সে বাস করছে—এই আগে লোকে বলত। যেমন বড় বড় গাছ থাকতে শেওড়া গাছে ভূতের বাসা বলে থাকে লোকে। তাও হরিবিষ্ণুবাবু আপত্তি করেছিলেন। সীমাই ওটা বেছে নিয়েছে নিজে।

—ও চক্কোত্তি মশাই। মিটিং যে বসে গেল।

যথাসময়ে চাকা ঘুরতে শুরু করেছে। ও থামে না।

পুতুলের দোকানের সামনেটা ফাঁকা হয়ে গেছে। ফটিক দাস শুধু বসে আছে বাইরে।

॥ ১৮ ॥

সীমা বসেছিল ঘরে। সেই যাকে বলছিল সীতানাথবাবু—ভূতুড়ে ঘর। সেই ঘরে নাকি ভূতনাথবাবুর প্রথম পক্ষের স্ত্রী বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছিল—সে ভূত হয়ে বাস করত। কাঁদত। ছোট্ট ঘর। আগেকার চোরকুঠরী। লোকে নাকি সে কান্না শুনেছে।

বিচিত্র বিস্ময়। এই বাড়ী বাঁড়ুজ্জেদের বাড়ী। যক্ষপুরীর বাঁড়ুজ্জেদের। তিন পুরুষ এক সন্তান। প্রথম পুরুষ কৃপণ। দ্বিতীয় পুরুষ মদ্যপ ব্যভিচারী। তৃতীয় পুরুষ রোগগ্রস্ত বুদ্ধিহীন অক্ষম। তার মধ্যেও চলেছে ব্যভিচার। নারী-নির্যাতনও দু পুরুষের। লক্ষ লক্ষ টাকা নাকি ছিল। কোথায় উড়ে গেল ওই অক্ষমতার পথে, ব্যভিচার মদ্যপানে এত যায় না এবং যায়নি। গেল অক্ষমতার পথে। সেই বাড়ী হস্তান্তরিত হয়ে চন্দনপুরের নতুনকালের গড়নের পথে হয়েছে গার্লস হাইস্কুলের হোস্টেল। কলকাতা ধানবাদ আসানসোল জামসেদপুর থেকেও মেয়েরা এখানে এসেছে।

যে বাড়ীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে বেদনার্ত নারীর দীর্ঘশ্বাস পুঞ্জীভূত হয়ে থাকত—সেই বাড়ীর কোণগুলিতে ঘুরে বেড়ায় তরুণ কণ্ঠের কলহাস্য,

কখনও কখনও কান্নাও ওঠে। ছোট মেয়েরা বাড়ী থেকে এসে প্রথম প্রথম কাঁদে! বিচিত্র একটি সংযোগ তাতে সন্দেহ নেই।

প্রথম যখন এ বাড়ীতে গার্লস হোস্টেলে হয় তখন নস্তুবালা ভাত্নগান একটি বেঁধেছিল।—

ভাত্ন আমার বিবিসাহেব হবে গো!
যে বাড়ীতে কেউ শোনে নাই বউবিটিদের গলা—
বউ কেঁদেছে ঘরের কোণে বাবুর হাঁকাড় হুই বাগানে—
সেই বাড়ীতে মেয়ের মেলায় এ কি হাসির পালা!
ভাত্ন আমার বিবিসাহেব হবে গো!

চোর-কুঠরিটায় প্রথম জিনিসপত্র থাকত। এখন একটা জানালা ফোটানো হয়েছে; সেটাই বেছে নিয়েছে সীমা। তার তক্তাপোশের তলায় এখনও জিনিসপত্র থাকে। ওর জিনিস আর কি? এক কাপড়ে এসেছিল। প্রথম ভবানীকিঙ্কর কিছু টাকা চাঁদা তুলে দিয়েছিল ওর বই খাতা এবং তুখানা কাপড়ের জন্য। সেটা সীমা নিয়েছিল। এখন মাইনে পেয়ে একটা টিনের স্যুটকেস কিনেছে। ছিট কিনে দিদিমণির কাছে ব্লাউজ কাটিয়ে নিজেই সেলাই করে নিয়েছে। কেমন করে কোথা হতে কিভাবে সে এমন সৃষ্টিছাড়া হল তাও সে ভাবে মধ্যে মধ্যে। একলা হলে ভাবে। এই এখানে চাকরি নেওয়ায় যেতে তার দেরি হয় ইস্কুলে। ইস্কুলে তার নাম নেই। প্রাইভেট হিসেবে পরীক্ষা দেবে। সব সাবজেক্ট সে মোটামুটি জানে, কাঁচা সে ইংরাজীতে। তুবার ফেল সে ইংরাজীতেই হয়েছে। সংস্কৃতটা রেখে ভুল করেছে—ওটাতেই টায়ে-টায়ে তেত্রিশ পেয়েছে। কিছু বেশী হলে সেকেণ্ড ডিভিশন হত, কম্পার্টমেন্টাল পেত। তাই সে ইংরাজীর ক্লাসের সময় যায়। সংস্কৃত ক্লাসেও যায়। সংস্কৃত ক্লাস প্রথম দিকে। সংস্কৃতের ক্লাস সেরে হোস্টেলে ফিরে স্নান করে খায়, পড়ে। সেই অবসরে ভাবে।

নেলি বাড়ীতে দাদার চিঠি পেয়ে কাকার বাড়ী খবর দিয়ে ছুটে এসে সীমাকে খবর দিয়েছিল। সীমা খুশী হয়েছিল। কোন সন্দেহ

কোন পক্ষে জাগেনি। নেলিরও মনে হয়নি সীমাকে ছুটে বলতে এল কেন? সীমারও হয়নি। সে প্রশ্ন করেনি, তা সে খবরটা এত লোক থাকতে আমাকে কেন বল তো? অত্যন্ত অসঙ্কোচে খুশী হয়েছিল। শুভেন্দুর তাকে ভালোবাসা সম্পর্কে কোন সন্দেহই ছিল না। শুভেন্দুর পত্রেও কিছু ছিল না। কচ দেবযানীর উপমা কচ দেবযানী অভিনয় নিয়ে—তার কোন দাগ তো উভয়ের মনেই পড়েনি। কতদিন তো তারপর দেখা হয়েছে কথা বলেছে। শুভেন্দুর ওটাতে প্রেমের কোন গন্ধ থাকলে শুভেন্দুই কি সেটা নেলিকে পড়তে দিত। তাই প্রথম চিঠি পাওয়ার দিন সে যেমন অসঙ্কোচে বলেছিল—দূর দূর; তেমনি অসঙ্কোচে খুশী হয়েছিল শুভেন্দুর চিঠি এসেছে সংবাদ শুনে। বলেছিল—বাবাঃ, বাঁচলাম নেলি। আমার মনে ভারী কষ্ট হয়েছিল। জানিস—ওকে যদি তখন সামনে পেতাম না খুব কষে যা-তা বলে দিতাম। বাড়ী থেকে না বলে পালানো খুব বাহাদুরি বুঝি! কাপুরুষ বলে দিতাম। তা তোর দাদা বাড়ী আসবে না? এলে আমি ঠিক বলব—দেখিস!

নেলি বলেছিল—দাদাকে লিখে দেব তাই। সীমা এইসব বলছিল।

— লিখিস।

নেলি চলে গিয়েছিল ইস্কুলে, সীমা ঘরে বসে ছিল। ঘণ্টাখানেক পর—হেডমিস্ট্রেস ক্লাসে এসে নেলিকে ডেকেছিলেন।—নেলি শোন।

নেলিকে সঙ্গে নিয়ে অফিস রুমের দিকে যেতে যেতে বলেছিলেন—আশুবাবু ডাক্তার এসেছেন, তোমার দাদার খবর বলতে। ওঁকে চিঠি দিয়েছে তোমার দাদা—সেটা পড়তে দেবেন। যাও, ভিজিটার্স্ রুমে রয়েছেন উনি।

আশু ডাক্তার অনেক ভেবেও এ ছাড়া পথ পায়নি। সে ইস্কুলে এসেছে—নেলি ছাড়া আর কারুর দ্বারা এ হয় না—হতে পারে না। একবার নেলিই শুভেন্দুর চিঠি সীমার কাছে নিয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয়

পত্রও সে-ই নিয়ে যাবে। নেলি যদি গররাজী হয়, তবে সে এ চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দেবে অথবা শুভেন্দুকে ফিরে পাঠিয়ে দেবে।

নিজের চিঠিখানা নেলিকে দিয়েছিল—পড়। পড়ে দেখ।

নেলি চিঠিখানা পড়ে একটু বিহ্বল হয়েই তার দিকে তাকিয়েছিল। বোধ হয় ভেবে পায়নি কি বলবে! সেই অবসরেই আশু সীমার চিঠিখানা তার দিকে বাড়িয়ে ধরে বলেছিল—এটা দিয়ো। আর আমার চিঠিটা দাও।

নেলি তাই করেছিল। এবং আশু ডাক্তার যেতেই চিঠিখানা জামার মধ্যে পুরে হেডমিস্ট্রেসকে বলেছিল—আমি বাড়ী থেকে একবার ঘুরে আসব বড়দিমণি?

—যাও। তিনি পাশের ঘরে বসেছিলেন। ওই একটা কথা যা হয়েছিল -পড়। পড়ে দেখ। তারপর—নাও দিয়ে। আমার চিঠিটা দাও। এ সবই তাঁর কানে গেছে। তার মধ্যে তো তিনি আপত্তির কিছু পাননি। কারণ সীমার নামগন্ধও তার মধ্যে ছিল না। তিনি তো চিঠিখানা বাপ-মাকে লেখা বাড়ীর চিঠি বলেই ধরে নিয়েছিলেন। নেলিকে বলেছিলেন, যাও!

নেলির মনেব মধ্যে তখন আড়ষ্টতা কেটে গিয়েছে। তরুণ কৈশোরে—এই জীবনের এই পূর্বরাগের মাধুরীলীলায় সখীত্বে যে একটি সকৌতুক আসক্তি আছে সেই সকৌতুক আসক্তি জেগে উঠেছে তার মনে। সে দ্রুতপদে যেন ছুটতে ছুটতে এসে সীমার ঘরে ঢুকে বিছানায় বসেছিল—বাবা বাবা—তোমার আর দাদার জন্যে আমার এই নাজেহালের কি মজুরী আমি পাব তা জানি না। হয়তো লবডঙ্কা। কিন্তু আমি মলাম।

—কি?

—কি?—এই দেখ কি? দাদার চিঠি। শ্রীচরণে নিবেদন। ধর।

—চিঠি?—হাতে করে নিয়ে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়েছিল নেলির দিকে।

নেলি বলেছিল—পড় না। সব মালুম হবে।

চিঠিখানা রুদ্ধনিশ্বাসে পড়ে গিয়েছিল সীমা। তারপর কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারপর চিঠিখানা ছিঁড়তে সুরু করেছিল। নেলি অবাক হয়ে দেখছিল। আধখানা ছিঁড়ে একবার কয়েক মুহূর্তের জন্য থেমেছিল সীমা—তারপর অত্যন্ত দ্রুত টানে চিঠিখানা কুচিকুচি ক'রে দিয়েছিল। আবার হেঁট হয়ে বসে কুচিগুলি কুড়িয়ে বেরিয়ে চলে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ আসেনি। নেলি বুঝেছিল—সীমা সেগুলিকে আগুনে পুড়িয়ে দিতে গেছে। কিছুক্ষণ পর সীমা ফিরে এলে নেলি বলেছিল—ওতে কি লিখেছে দাদা আমি জানি না। তবে ভালবাসার কথা আছে সেটা জানি; তবে—। কিছুক্ষণ থেমে বোধ করি সঙ্গত অসঙ্গত বিবেচনা ক'রেই বলেছিল—তবে এ তো সংসারে আছে। লেখ চিঠি। খারাপ হলে নিশ্চয় আপত্তির কথা। কিন্তু দাদা তা লিখবে? বিশ্বাস হয় না।

সীমা বললে—তোমার দাদাকে লিখে দিয়ো—আমার প্রেম করবার সময় নেই। বিয়ের জন্যে সীমা জন্মায় নি। তাহলে সে বিয়ের আসর থেকে উঠে আসত না। প্রেমের জন্যেও না। হলে তার প্রথম পত্রের উত্তরেই একখানি মস্ত লম্বা চিঠি লিখতাম। আমার লক্ষ্য আমার ভবিষ্যৎ অন্য রকম। তিনি যেন আমাকে উত্ত্যক্ত না করেন। আমাকে পাস করতে হবে। পড়তে হবে। চাকরী করব আমি।

নেলি ফিরে এল। সে আর ইস্কুলে গেল না। মুহ্যমান হয়ে বাড়ী এল। বারোটা বাজে। তখন মা তার চণ্ডীতলায় পূজো দিয়ে সদ্য ফিরেছে। ছেলের খবর এসেছে। ছেলে চাকরী করে পড়ছে। খবর পেয়েই পূজোর জিনিস কিনে আনিয়ে পূজো দিতে গিয়েছিল। বাবা নীচে নেমে এসেছে।

* * *

বোর্ডিংয়ের ঘরে সীমা বসে ভাবছিল। হঠাৎ কে যেন তাকে ডাকলে। ভাবনার মধ্যে সে এতই মগ্ন হয়েছিল যে প্রথমটা আতঙ্কে

চমকে উঠে একটা অস্ফুট আর্তনাদ ক'রে উঠেছিল। সে সব ভুলেই গিয়েছিল এমন কি নিজেকে পর্যন্ত।—কে ? কে ডাকলে তাকে ? এই দুপুর বেলা ?

চঞ্চলভাবে চারিদিকে তাকিয়ে দেখে, মনের ভয়টা যেন একটা বদ্ধপাত্র থেকে আকস্মিক ভাবে মুক্ত কোন উগ্র বাষ্পের মত তাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেললে। মনে হল এই চোরকুঠরীতে যে বউটির প্রেতাত্মা বাস করে—সেই বোধ হয় তাকে ডাকলে। বুকটা ধড়ফড় করে উঠল।

পরক্ষণেই আবার সে ডাক শুনতে পেলে—সীমে! অ—,সীমে!

এবার সে সাহস পেল। না ঘরের ভিতর থেকে নয়, নিচে থেকে কে যেন তাকে ডাকছে।—কে ? ঘরের ছোট্ট জানালাটা সে খুললে। নিচে থেকে সাড়া এল—আমি লো—ভাদুর-মা।

ভাদুর মা! নস্তুবালা!—ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল সীমা। কাজ নেই কম নেই—এই একটা উপদ্রব—মেয়ে সেজে চিরকালটা একটা বিচিত্র অভিনয় করে গেল নস্তুবালা। কেন তা কেউ জানে না। কিন্তু সর্বত্র আছে ও। উঃ! সেই যেদিন সে বিয়ের পোশাক পরে বাড়ী থেকে পালিয়ে এসে থানার বারান্দায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল সেদিনও ওই নস্তুই তাকে ঠিক এমনি ক'রে ডেকেছিল সীমে-- সীমে! অ-সীমে!

সে খুব রাগ করেই বললে—কেন ? কি— ? কি বলছিস কি তুই ? এ্যাঁ ?

—শুভেন্দু তোকে চিঠি নিকেছে ?

—কি ? কি ?

—শুভেন্দু তোকে চিঠি নিকেছে ?

—হ্যাঁ নিকেছে! তাতে তোর কি ?

—তাতে আমার কি বুন ? এই দেখ সীমে কি বলছে দেখ! হেসে উঠল নস্তুবালা।—আমার অনেক—আমার অনেক তাতে সীমে—আমার অনেক! এই দেখ্ তোর বিয়ে হলে বাসরে আমি

গান করব। গায়ে হলুদের আসরে নাচব। একখানা কাপড় পাব। আর আমার মনে মনে খুব আনন্দ হবে। আর কি বল!

—না। তা তুমি পাবে না। কারণ বিয়ে আমি করব না।

—বিয়ে করবি না?

—না। বিয়ে করব না!

—কি করবি?

—লেখাপড়া শিখে চাকরি করব।

—চাকরি করবি? বিয়ে করবি না?

—না।

—বিয়ে করবি না তো চাকরী ক'রে কি করবি?

—জানি না। যা।

—সীমে!

—না—না—না। তুই যা। তুই যা। খবরদার এমন ক'রে বিরক্ত করিস নে তুই। সশব্দে সে জানালা বন্ধ করে দিল।

—সীমে। অ—সীমে! সীমে—শোন। অ—সীমে!

সীমা উত্তর দিল না। চোখ মুখ তার লাল হয়ে উঠেছে উত্তেজনায়। মনে হচ্ছে যেন কেউ বা কোন অদৃশ্য শক্তি তার নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে দিচ্ছে। একটা হাঁপানি ধরছে যেন।

এ কি প্রশ্ন? ওই মেয়ে-সেজে-থাকা নস্তুবালার এই প্রশ্নগুলো যেন সাংঘাতিক বলে তার মনে হল! তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। এখনও সে প্রশ্নগুলো তার চারিদিকে যেন ফিস্ ফিস্ করে উচ্চারিত হচ্ছে। বিয়ে করবি না? কি করবি? চাকরি করবি? বিয়ে করবি না তো চাকরি করে কি করবি?

কি করব?—এই সারা দেশের মেয়েরা যারা এই নতুন কালে এই ভাবে লেখাপড়া শিখছে—লেখাপড়া শিখে চাকরি করছে তারা কি সকলেই বিয়ে করছে? না। করছে না। সেও করবে না।

এই তো কালের হাওয়া। কালের নিয়ম।

লেখাপড়া শিখবে মেয়েরা। স্বাধীন হবে তারা। পুরুষের মতই স্বাধীন হবে। চাকরি করবে। কি চাকরি করবে সে জানে না। তবে একটা চাকরি করবে। বড় একটা চাকরি। মস্ত বড় একটা চাকরি সে করতে চায়। মেয়েরা এখন উকীল হয়, ব্যারিস্টার হয়, ডাক্তার হয়, জজ-ম্যাজিস্ট্রেট তাও হয়। মন্ত্রীও হয়। রাজ্যপাল গভর্নরও হয়। এর মধ্যে একটাও কি কিচ্ছু সে হতে পারবে না?

একটা তো অনায়াসে হতে পারে।—সেটা হল লীডার। রাজনৈতিক দলের লীডার। তার বাবা যা হতে গিয়ে হ'তে পারে নি। যা থেকে সে ভ্রষ্ট হয়ে একটা চিহ্নিত পতিত জনে পরিণত হয়ে গেছে। এই তো এখানকার সীতানাথ চক্রবর্তী এম-এল-এ—তার বাবার এককালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তার কাছে গেলে সে তাকে সাগ্রহে তার দলে নেবে। কিন্তু না—তা সে যাবে না। না। লেখাপড়া শিখবে সে। এ কালের হাওয়াই এই। লেখাপড়া শিখবে, চাকরী করবে। স্বাধীন হবে,—সবার মত স্বাধীন। বাবার অধীনও থাকবে না। কোন পুরুষেরই অধীন থাকবে না।

বিয়ে?

বিয়ে সে তখন ইচ্ছে হলে করবে। যাকে তার পছন্দ হবে—ভাল লাগবে। যে তাকে ভালবাসবে—প্রমাণ দিয়ে সে ভালবাসাকে প্রমাণ করবে—তাকে সে বিয়ে করবে। সে জাত মানবে না—ধর্ম মানবে না—কোন মন্ত্র না—কোন তন্ত্র না,—শুধু বিয়ে—রেজেস্ট্রী ক'রে বিয়ে করবে।

ম্যারেজ কন্ট্রাক্ট। দরকার হলে ডাইভোর্স করবে।

ইচ্ছে না হয়—বিয়েই সে করবে না।

বিয়ে করাটাই সব নয়। না—নয়।

ওই যে বাবুদের ধনীদের আর একেবারে অক্ষরপরিচয়-হীন গরীবদের মেয়েগুলো বিয়ে ক'রে শাঁখা সিঁদুর পরে এক পাল ছেলেমেয়ের মা হয়ে—নিজের কপালকে গাল দেয়—নিজের বাপকে

গাল দেয় নিজের সব দুর্দশার মূল ওই স্বামীটাকে গাল দেয়—তা সে দেবে না।

না।

কালের হাওয়া। কালের হুকুম। কালের ফতোয়া।

॥ ১৯ ॥

কিছুদিন পর। আষাঢ় মাস, রথযাত্রার দিন। রথের ঢাক বাজছে। চৌধুরীদের ভাঙাবাড়ীর নড়বড়ে রথ।

কথাটা সতীশ ঘোষালের কথা। এমন কথা বানাতে কেউ পারে না। "চৌধুরীদের ভাঙাবাড়ীর নড়বড়ে রথ– আজ ঢেঁকিস্যো ঢেঁকিস্যো ক'রে হেলতে হেলতে চলবেন। একবার এদিকে কাৎ হবেন—একবার ওদিকে হেলবেন ;—পড়লেও পড়তে পারেন, পড়াই উচিত কিন্তু মজার কথা পড়েন না। পড়ছেন না। শালা দশমুণ্ড রাবণের মত—কাটলে আবার গজায়। মন্দোদরীর কাছে গচ্ছিত আছে ব্রহ্মাস্ত্র—সে বাণ নইলে মরবে না। বেটা লর্ড কর্ণওয়ালিশ ছিল ব্রহ্মার অবতার—সেই বেটাই এই রাবণদের পত্তন করে গিয়েছে। এ যাওয়া কি সোজা কথা।"

আপন-মনে বাক্যের তুবড়ী ফোটাতে ফোটাতেই চলেছেন সতীশ ঘোষাল ঠাকুরবাড়ী। সংসারে এইটি ছাড়া তার আর কর্ম নেই। যেখানে পর্ব সেখানে সে যাবেই এবং বকতে বকতে যাবে।

চৌধুরী বাড়ীর এজমালী ঠাকুরবাড়ীর কথা এখানকার সকলের কাছেই সুবিদিত। সকলেই জানে। এর পিছনে প্রবাদ আছে কাহিনী আছে ইতিকথা আছে—ইতিহাস আছে। গ্রামপ্রান্তে অট্টহাস শক্তিপীঠ। ওই শক্তিপীঠকে প্রকট করেছিলেন এক সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী নিজে ছিলেন বৈষ্ণব। সেই মতেই সাধনা করতেন তিনি কিন্তু তাঁকে

দেবতা দেখা দিলেন শক্তিরূপা হয়ে। সন্ন্যাসী সিদ্ধ হলেন—ঈশ্বরকে মাতৃরূপে পেয়ে। কিন্তু কৃষ্ণ-মূর্তিটিকে নিয়ে পড়লেন বিপদে। তাঁর কাছে ছিল একটি কৃষ্ণমূর্তি এবং একটি শালগ্রাম শিলা। এই মূর্তি ছুটিকে কিছুদিন মাতৃরূপা শক্তির সঙ্গে একসঙ্গেই পূজা করেছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারলেন না। কারণ শক্তিপূজার জন্য মৎস মাংস মদ্য প্রভৃতি উপকরণ এক সঙ্গে পূজার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল। তখন তিনি এই গ্রামের ওই চৌধুরীদের শ্রীকান্ত চৌধুরীকে ডেকে তাঁকে বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে এই বিগ্রহ এবং শালগ্রাম শিলা দান করেন। শালগ্রাম শিলা এবং বিগ্রহ দান ক'রে—পূজা তাঁদের উপর চাপিয়ে দেননি—সঙ্গে সঙ্গে ভূসম্পত্তির ব্যবস্থাও ক'রে দিয়েছিলেন। তখন মুসলমান আমল। এ অঞ্চল ছিল রাজনগরের নবাব—বা দেওয়ান সাহেবের দখলী অঞ্চল। মুর্শিদাবাদের নায়েব-নাজিমকে সামান্য কর দিয়ে স্বাধীন নবাব সাহেবের মতই তিনি থাকতেন। এখানেও প্রবাদ আছে যে রাজনগরের নবাবদের আদিপুরুষ এখানকার হিন্দু রাজাকে বধ ক'রে যখন সিংহাসন দখল করেন, তখন রাজার ইষ্ট-দেবী কালীর কোপে পড়ে দেবীর কাছে এক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তাঁর রাজ্যে হিন্দুর দেবতা ও দেবমন্দিরের কোন অনিষ্ট হবে না। হিন্দুর উপর হিন্দু বলে কোন অত্যাচার হবে না। এবং যথোচিত রাজদরবারের সাহায্য সর্বদাই প্রসারিত থাকবে। সে প্রতিশ্রুতি তাঁরা তাঁদের সুদীর্ঘ রাজত্বকালে কখনও লঙ্ঘন করেননি। সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ীই রাজনগরের নবাব সন্ন্যাসীর বিভূতি দেখে শ্রদ্ধাবশে এই দুই দেবতা অর্থাৎ শক্তিপীঠ এবং এই বৈষ্ণব বিগ্রহ দুয়ের জন্যই দু-দফা ভূসম্পত্তির সনদ দিয়েছিলেন। অবশ্য, আজকাল লেখাপড়া জানা লোকেরা বলে ও সব স্বপ্নটপ্ন কিছু না—দু-দফা সম্পত্তি পাবার জন্যই শাক্ত বৈষ্ণব দুই দেবতারই সৃষ্টি করেছিল ওই সন্ন্যাসী।

আর একদল বলে—বাজে কথা, সন্ন্যাসীই হল বাজে কথা।

আসলে সব হল ওই সুচতুর শ্রীকান্ত চৌধুরী—সেই ওই এক সন্ন্যাসীকে সামনে খাড়া ক'রে এই বিরাট দেবোত্তর ব্যবসার পত্তন ক'রে গিয়েছিল। কারণ এই চৌধুরীরা সন্ন্যাসীর শিষ্য হিসাবে একদিকে হল বৈষ্ণব দেবোত্তরের মালিক, আর একদিকে এরাই হল জমিদার হিসেবে শাক্ত দেবোত্তর ওই অট্টহাসের সেবায়েত। সুতরাং ফেরালে কোঁৎকা ঘোরালে লাঠি। যাক সে কথা।

এরপর শ্রীকান্ত চৌধুরী চাকরি পেয়েছিল রাজনগরের নবাব দপ্তরে-এখানকার পরগণা কুতবপুরের নায়েবের অধীনে হিসাব নবীশ হয়েছিল শ্রীকান্ত চৌধুরী এবং হিসেবের কোন্ ফাঁক দিয়ে একটা লাটের ছ আনা অংশ দিয়ে একটা স্বতন্ত্র লাট তৈরী ক'রে নিজেদের বৈষ্ণব দেবতার নামে দেবোত্তর করে নিয়েছিল—তার সব বিশদ বিবরণ কারুর আর মনে নেই, কিন্তু নবাব দরবারে যখন এই লাট চুরি ধরা পড়ে তখন নবাব সাহেব চমৎকৃত হয়ে যা বলেছিলেন —তা কেউ ভুলে যায় নি। সে কথাটা চৌধুরীদের দু-চারজন প্রাচীন-পন্থী তান্ত্রিক, আজও অহংকার করে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে থাকে। তারা বলে—"নবাব বলেছিলেন শ্রীকান্ত চৌধুরী নিমকহারাম হারাম-জাদ লেকেন হিসাব জিন্দা আচ্ছা কলমবাজ! ইয়ে নাকচ কভি নেহি হো সকতা! লিখে দাও—"খাতে বকশিশ—কলমবাজীকা!" সেই হিসাব ভুলের বকশিশ ওই জমিদারী থেকে তৈরী হয়েছিল এই ঠাকুরবাড়ী। এই ফটক! ফটকের কথা আগে বলেছি।

রথের সময় থেকে এই ফটকের ভিতর দিয়ে ঠাকুরের উৎসব যাত্রার শুরু! রথযাত্রায় ঠাকুরের রথ বের হয়, তারপর এই ফটকের সামনে—ওই বকুলগাছের ডালে ঝুলন পূর্ণিমার দিন ঝুলন যাত্রায় গোবিন্দ ঝুলনে চাপেন। রাসের সময় পূর্ণিমার পরদিন ঠাকুর চতুর্দোলায় চেপে এই ফটকের ভিতর দিয়ে গাঁয়ের বাইরে বনভোজনে যান।—চৌধুরীবাড়ীতে ছেলে হলে সে ছেলে প্রথম ষষ্ঠীতলায় যায় এই ফটকের ভিতর দিয়ে। পৈতেতে এই ফটকের ভিতর দিয়ে গিয়ে

ঠাকুরপুকুরে চান ক'রে আসে। এই ফটকের তলা দিয়ে ছেলে বিয়ে করতে যায়। মা ফটকে দাঁড়িয়ে ছেলেকে জিজ্ঞাসা করে—কোথায় যাচ্ছ বাবা ?

ছেলে বলে—তোমার দাসী আনতে যাচ্ছি মা।

ছেলে বউয়ের পালকি এখানে এসে নামে। মা বউয়ের ঘোমটা খুলে বউয়ের মুখ দেখে ছেলে বউ নিয়ে গোবিন্দমন্দিরে গিয়ে প্রণাম করিয়ে তবে ঘরে নিয়ে গিয়ে তোলে। চৌধুরী বংশে যে বাড়ীতেই কেউ মরুক শবদেহ নিয়ে যাবার সময় এখানে একবার নামিয়ে খানিকটা ধুলো মৃতের মাথায় দিয়ে বলে—ব্রজের ধুলো মাথায় নিয়ে চলে যাও।

শ্রাদ্ধের আগে তষ্ঠীরাম ব্রাহ্মণেরা এসে ঘটির মধ্যে চাবি নেড়ে বাজনা বাজিয়ে গাইত—"ওগো বাবুগো তোমার বাবা দেহ ত্যাগ করে ব্রজের ধুলো কপালে নিয়ে সর্বাঙ্গে হরিনাম লিখে তিলক রচনা করে হরিপ্রেমে দরবিগলিত অশ্রুধারা বর্ষণ করতে করতে বায়ুপথে বৃন্দাবনাভিমুখ গমন করলেন—ওগো···বাবুগো বৃন্দাবন হতে তোমার পিতৃদেব—।"

সতীশ ঘোষাল হাতের লাঠির উপর ভর দিয়ে ধীরে ধীরে পথ চলে; অহরহই মনে হয় মাথা ঘুরছে, মনে হয় পড়ে যাবে কিন্তু এই সব মনে করতে করতে কখন যে সব ভুলে গিয়েছিল তা তার খেয়াল ছিল না। সে বেশ সরল পদক্ষেপেই চলতে চলতে পরম কৌতুকে আপন মনে খু-খু-খু শব্দ করে হেসে ফেলছিল।

"বৈকুণ্ঠে গমন করছেন। অহো।"

"ব্রজের ধুলো লেপন করছেন। বাহা-বাহা-বাহা।"

চৌধুরি বংশটার উপরেই তার ক্রোধের আর শেষ নেই। কেন সে তা বলতে পারবে না। সে নিজে চৌধুরীদের দৌহিত্র বংশের ছেলে; যেটুকু জমি জমা আছে তার সবটুকুই চৌধুরীদের দেওয়া। তার বাপ চাকরি করেছে। করেছে হরিবিষ্ণুবাবুদের বাড়ী। সেও কিছুদিন

করেছিল—কিন্তু বনেনি। বনেনি ওই হরিবিষ্ণুবাবুর সঙ্গেই। হরিবিষ্ণুবাবু ওর স্কুলের সহপাঠী। স্কুল থেকেই দুজনের মধ্যে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা সেই কারণেই হরিবিষ্ণুবাবুর কাছে চাকরি করা তার পক্ষে সম্ভবপর হয়নি।

—মারো পয়জার শালা নোক্‌রির মাথায় গোলামির মুখে। নেহি দরকার শালা যেমন তেমন চাকরি ঘি ভাতে—। দুনিয়ার কারুকে সে ক্ষমা করবে না। দেখো না বাবা ভেল্কিকা খেল। জিন্দগী বদল গয়া পিঁড়ি উলট গয়া—।

হঠাৎ একটা গোলমাল কোথায় হল শুনে ঘোষাল চমকে উঠল। কি হল?

কলরব উঠছে।

একটা ব্যস্তসমস্ত ভয়গ্রস্ত কোলাহল। সরে যাও সরে যাও—সাবধান! সাবধান যেয়ো না। ওদিকে যেয়ো না। —এই এই!

* * *

সামনেই চৌধুরীদের প্রাচীনকালের গোপনব্রজ মাটির বৈকুণ্ঠ। এই নামই ছিল ওদের ঠাকুরবাড়ীর। সামনে ঠাকুরপুকুরের পাড়ের উপর রথের মেলা বসেছে। মেলা মানে ঘণ্টা কয়েকের মেলা। বেলা দশটা থেকে বসতে আরম্ভ করেছে। চারটে খুঁটি পুতে মাথায় একটা চট বা তেরপলের ছাউনি দিয়ে তক্তাপোশের উপর সুরো ময়রা, ডবা ময়রা, গিরি ময়রা, সুহাসী ময়রাণী—ওরা রসগোল্লা পান্তোয়া প্রভৃতি মিষ্টির দোকান সাজিয়ে বসেছে। বৈরিগীদের গোপেশ পাঁপর তেলে ভাজার আসর পেড়েছে, একটা টিনের উনোনে কয়লার আঁচ দিয়ে কড়ায় পাঁপর ভাজছে। ওপাশে কাঞ্চনী ময়রানী পাঁপর ভাজছে। ওদিকে আমওয়ালারা এসেছে আম নিয়ে। এখন মালদার আমের আমদানি। এবং পাকিস্তানে—ভারতে দেশভাগ হয়ে যাওয়ার ফলে পূর্ববঙ্গে আর মালদার আম যায় না। আমের ঠেলটা আসে এদেশে। কাঁঠালের আমদানি হয়েছে। কয়েকটা বাজীকর এসেছে। ঠাকুর-

বাড়ীর ভেতরের এলাকায় অ্যাম্‌প্লিফায়ার সহযোগে গ্রামোফোনে রেকর্ড বাজছে। চৌধুরীবাড়ীর ছেলেরা বাজাচ্ছে। গোপাল চৌধুরীর খুড়তুতো ভাইদের এখন চলতি ভাল। জমিদারী যাওয়ার জন্য তারা বিশেষ ধাক্কা খায়নি। তারা তাদের মাতামহের অর্থ পেয়েছে, তা ছাড়াও লোকে বলে তারা নাকি গুপ্তধনও কিছু পেয়েছে মাটির নিচে থেকে। সেই মূলধনে তারা জমিদারী দণ্ডটিকে সুযোগ্যতার সঙ্গে বাণিজ্যের তোলদাঁড়ী বা মানদণ্ডে পরিণত ক'রে ভাল চালাচ্ছে। দিন-কাল এখন তাদের ভাল। তাদের বাড়ীর ছেলেরাই এ ব্যবস্থা করেছে।

আগে অনেক সমারোহ হত। আশা-সোঁটা নিয়ে—পাইক নগ্দী বরকন্দাজ ঢাক ঢোল কাঁসী বাঁশী বাজিয়ে রথের পুরোভাগে মিছিল চলত, খই-বৃষ্টি হত, বাতাসা থাকত, পয়সা থাকত। সে সব উঠে গেছে। আগে কয়েকখানা গ্রাম থেকে হরিনাম সংকীর্তনের দল আসত—তারা সকাল থেকেই গ্রাম প্রদক্ষিণ ক'রে বেড়াত; এখানেই প্রসাদ পেতো, কিছু কিছু বিদায় পেতো; তারাও আর আসে না। রথযাত্রার উৎসব যেন ক্রমে ক্রমে নীরব বিষণ্ণ জরাগ্রস্ত স্তিমিত হয়ে এসেছিল—যুদ্ধের পরবর্তী এই নূতন কালের ধমে —; লোকজন অনেক আসে—আগের থেকে অনেক গুণে বেশীই আসে। হুল্লোড় হয়—মেলায় বেচাকেনা হয়, কিন্তু সে সবই সেই বিকেলে,—অর্থাৎ অকালে, যখন নাকি রথযাত্রার আসল অনুষ্ঠানের অনেক পরে। যেন তার সঙ্গে এই জনতার কোন যোগই থাকে না। সকাল থেকে রথের পূজার্চনার সময়টিতে সব স্তিমিত জীর্ণ পুরাতন বাতিল বলে মনে হয়। যা আকারে ইঙ্গিতে বলে—"চৌধুরীদের ডাকে কেউ আসে না, কেউ আসে না—ওদের আর কেউ পোঁছে না।" সেটা চৌধুরীদের মধ্যে যারা অন্তত কিছুটা জীবন্ত তাদের পীড়া দেয়। সেই হেতু এই গ্রামোফোনে অ্যাম্‌প্লিফায়ার লাগিয়ে গানের চব্বিশপ্রহর এবং 'মচ্ছব' অর্থাৎ মহোৎসব জুড়ে দিয়েছে। গোপাল

চৌধুরীর ভাইপোরা দুজনে বসে রেকর্ড চালিয়ে যাচ্ছে। এই পল্লী অঞ্চলের আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত যে শূন্যলোক সে লোকটির গাঢ় নির্জন কোলাহল এখানে সচরাচর থই পায় না, হারিয়ে যায়। কিন্তু এই যন্ত্রযোগে আজ আকাশ পর্যন্ত শূন্যলোককেও যেন গানে গানে ছেয়ে দিয়েছে।

সতীশ ঘোষাল কানে হাত দিয়ে আক্ষেপ করে বললে—রাধা-মাধব হে! কি কালই হল? এই চীৎকারে মানুষের মাথা ঠিক থাকে? হরি—হরি—হরি। সুর নয়—অসুর। গান নয়—ঘেস্তা-ঘেচাং—ধেতাং ধেতাং। শালা—মারো ঝাড়ু, ঝেঁটিয়ে বিদেয় কর এই সব বেলেল্লাপনা। থমকে দাঁড়াল সে ফটকের সামনে। সেই ভাঙা ফাটা ফটকটা। চৌধুরী পরিবারের লোকেরা বলে—'সিং দরজা' অর্থাৎ সিংহদ্বার।

সতীশ ঘোষাল বলে—শালা সিংহদ্বার—! সিং দরজা? গুষ্টির পিণ্ডি। 'কুত্তা মুড়ি'! অর্থাৎ কুকুর ঢুকবার গলি বা নর্দামা!

ফটকটার বাইরের দিকটায় ঠাকুরপুকুরের পাড়ের উপর মেলার এলাকা। ওই ফটকটা ঠাকুরপুকুরের পশ্চিম পাড়ের ঠিক মাঝখানে অবস্থিত। ফটক থেকে বেরিয়ে দুদিকে চলে গেছে দুটো রাস্তা। বা একটা পথই ফটকটাকে পাশে রেখে পুকুরপাড় ছাড়িয়ে চলে গেছে উত্তর ও দক্ষিণ মুখে। এইটেই গ্রামের ভিতরের সাধারণের ব্যবহার্য কুলি শড়ক। আগে এটা চৌধুরীদের নিজস্ব পথ ছিল—এখন সর্বসাধারণের।

ফটকটার ওপাশে অর্থাৎ ভিতর দিকে—চৌধুরীদের ঠাকুরবাড়ী চন্দনপুরের গুপ্ত বৃন্দাবন; সাধারণ প্রজাসজ্জনেরা বলত—'ল বেন্দাবন' অর্থাৎ নব বৃন্দাবন। বলবার কারণ আছে; চৌধুরীরা সে-কালে এই ফটকের ওপাশে লম্বা প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যে বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে কোথাও তৈরী করেছিলেন রাসমঞ্চ, কোথাও বা ঝুলনবেদী, কোথাও দোলমঞ্চ,কোথাও তমাল বন,—তালবনের জন্যে চেষ্টা করতে

হয় নি—তালবন এখানে সর্বত্র। তমালবনের একটা তমাল গাছ এখনও আছে। এ ছাড়া সবই এখন ভাঙাভগ্ন ফাটা-ফুটো; এরই মধ্যে পার্বণগুলি পালিত হয়। অর্থাৎ শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকর্ম যাগযজ্ঞগুলি অনুষ্ঠিত হয়। আজও তাই হচ্ছে।

গোবিন্দবিগ্রহ এবং রাজরাজেশ্বরের পাকা দালানের সামনে এককালের পাকা নাটমন্দিরে ঠাকুরদের বসিয়ে রথযাত্রার যজ্ঞ হচ্ছে; পাশেই নড়বড়ে কাঠের রথখানা রাখা হয়েছে—কড়ি ভটচাজ পূজো করছে। সামনে পাতায় পাতায় নৈবেদ্যের আয়োজন, সে নৈবেদ্য অবশ্য যৎসামান্য, —চারটিখানি ভিজে আতপ চাল, একখানা বাতাসা, চিমটি দুই-তিন চিনি, টুকরো দুয়েক আম, এক আধ কোয়া কাঁঠাল। তবে তার পাশে চৌধুরী শরীকদের বাড়ী থেকে বাটীতে বাটীতে এসেছে নৈবেদ্য—তাতে আম আছে, কাঁঠাল আছে, দুধ আছে, মিষ্টান্ন আছে। মোটামুটি ভাল পরিমাণেই আছে। দু-চারজনের বাটীতে তো প্রাচুর্যের চিহ্ন রয়েছে। সেও ওই গোপাল চৌধুরীর ভাইদের এবং ওদের ভাগ্নে হরিবিষ্ণুবাবুদের বাড়ীর ভোগ বলে চিনতে কষ্টও হয় না দেরিও হয় না।

নাটমন্দিরের একদিকে চৌধুরীবাড়ীর গিন্নীবান্নীরা ময়লা এবং গন্ধওলা পবিত্র পূজোর পট্টবস্ত্র প'রে বেশ জাঁকিয়ে বসেছেন। অধিকাংশই এঁরা বিধবা। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা; এবং চেহারাগুলি বেশ হৃষ্টপুষ্ট। যারা সধবা তারা বরং অপেক্ষাকৃত শীর্ণ। অল্পবয়সী সে সধবা এবং কুমারী দুইই—তারা একটু অল্পদূরে দাঁড়িয়ে আছে। দেখলেই বোঝা যায় তারা মাত্র দর্শক। তাদের কাপড়ের রংয়ের বাহার এবং আভরণের ঝলমলানি এই ভাঙাচোরা পুরনো নাটমন্দির ও এই অপ্রচুর আয়োজনের সঙ্গে বিসদৃশভাবে সামঞ্জস্যহীন হয়ে চোখে ঠেকছে, অসঙ্গত বলেও মনে হচ্ছে। বউদের মাথায় ঘোমটা থাকলেও সে আধঘোমটা—তাতেই অবশ্য চেনা যায় বউ বলে। মেয়েরা সে কুমারী বা সধবা যাই হোক—তাদের মধ্যে

কিছুটা আটপৌরে ভাব আছে কিন্তু বউয়েরা সবই যেন পোশাকী কাপড়ের মত পরিপাটীভাবে ইস্ত্রী করা। প্রায় সকলের নখেই নেল পালিশ লাগানো—ক'জনের ঠোঁটে লিপস্টিকের রঙ টুক্‌টুক্‌ করছে।

নাটমন্দিরের আর এক প্রান্তে বসেছে পুরুষেরা। পুরুষেরা অর্থে প্রাচীন প্রবীণেরাই বেশী। গোপাল চৌধুরীর মত যাঁরা প্রবীণ এবং যাঁরা প্রাচীন গৌরবের ছেঁড়া সাদা ছাতা মাথায় দিয়ে বেড়ান তাঁরা। গোপাল চৌধুরীর জ্ঞাতিভাই হরেকৃষ্ণ চৌধুরী শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী ব্রজকান্ত চৌধুরী বসেছেন শতরঞ্জির উপর। সকলেই ষাটের উপর। কাঠের নল লাগানো দুটো পুরনো গড়গড়ায় তামাক চলছে। দা-কাটা তামাক। কেউ কেউ বিড়ি খাচ্ছেন। কথাবার্তা বেশী হচ্ছে না। মধ্যে মধ্যে টুক্‌রো টুক্‌রো কথা। সে কথাও কেউ কারও সঙ্গে বলছে না— যে যার আপনার মনে বলে যাচ্ছে।

—রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন-- ন—, ন বিদ্যতে।

—এবার আকাশ যে নীল হে। এক টুক্‌রো মেঘ নেই।

—হিসেব দিতে হবে পাই পয়সার। সব লুটে খাচ্ছে।

—এঁঃ··· বিধবার পোশাক দেখ! বিধবা! রাম রাম রাম!

একটু দূরে বসেছিলেন অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সীর দল; এখানে তামাকের ঝঞ্ঝাট নেই— সিগারেটের আসর; মানুষেরা সকলেই চল্লিশ পারের মানুষ। গায়ে ফতুয়া বা গেঞ্জি— পরনে ধুতি, প্রান্ত খানিকটা তুলে কোমরে গোঁজা। হাঁটু পর্যন্ত বেরিয়ে আছে। এখানে কথাবার্তায় যোগাযোগ আছে—বিচ্ছিন্ন কাটা কাটা কথা নয়, শীতল হিম নয়, তাপ আছে।

আরও খানিকটা দূরে প্রায় ফটকটার সামনে ওই ঝুলনমঞ্চের আমগাছতলায় বসেছিল আর একটি দল। দলটির মানুষগুলি সবাই পঁচিশের নীচে। নাটমন্দিরের মানুষগুলির দিকে পিছন ফিরে সিগারেট টানছিল। মধ্যে মধ্যে উঠছিল হাস্যধ্বনি। এদের কয়েক জনেরই পরনে ঢিলা পায়জামা এবং শার্ট বা পাঞ্জাবি, কেউ কেউ

হাওয়াই শার্টও চালিয়েছে। জনদুয়ের পরনে ফুলপ্যান্ট এবং শার্ট। কাপড় পরে খালিগায়ে বসে আছে একজন।

মধ্যবয়সীদের আসরে চলছিল—ল্যাণ্ড রিফর্ম থেকে কম্‌পেনশেশনের কথা। ব্লক-ডেভেলপমেণ্ট আপিসের কথা; প্রধান-বক্তা এখানে গ্রাম-অধ্যক্ষ। আলোচনার উত্তাপ এখানে পুরনো কালের ম্যালেরিয়া জ্বরের মত—শন শন করে একশো পাঁচে গিয়ে উঠেছে। কথাটা শুরু হয়েছিল—গ্রামের রাস্তা নিয়ে। গ্রামের রাস্তাটি খানা খন্দে এমন ভরে উঠেছে—যে গরুর গাড়ী ছাড়া আর কোন যানই নিরাপদ চলনে চলতে পারে না।

কথাটা তুলে দিয়েছে চৌধুরীবাড়ীর ভাগ্নেদের ভাগ্নে—ইস্কুলের মাস্টার মনোমোহন চাটুজ্যে। আজ রথের ছুটি। এখানে মেলা হয় বলে সকালে স্কুল বসেই সঙ্গে সঙ্গে ছুটি হয়ে যায়। স্কুল থেকেই ফেরার পথে মনোমোহন চাটুজ্যে ঠাকুরবাড়ীতে ঢুকেই গোপাল চৌধুরীর খুড়তুতো ভাই নেপাল চৌধুরীকে বলেছিল—এবার কি রথ আপনাদের মায়ের তলা পর্যন্ত যাবে না নাকি মামা?—পথ যে একেবারে দুর্গম গিরি কান্তার মরু—! রথের দিন এক পশলা বৃষ্টি যদি চেপে হয় তো দুস্তর পারাবারও হয়ে যাবে! যা—খানা খন্দ দেখে এলাম!

নেপাল চৌধুরী মানুষটির অবস্থা ভাল হলেও উত্তাপ বা কর্কশতা নেই তার মধ্যে। প্রকৃতিতেই মানুষটি ঠাণ্ডা মিষ্টি। সে বললে—বলো এই পঞ্চায়েতের অধ্যক্ষবাবুকে!

গ্রাম পঞ্চায়েতের অধ্যক্ষ বিষ্ণুপদ চৌধুরী—নিরীহ ভালমানুষ। তার নিজের কোন রাজনীতি নেই—তবে তার শালা বামপন্থী, তার ছোট ছেলে বামপন্থী কিন্তু ভগ্নিপতি কংগ্রেসী পাণ্ডা—সে আবার এখানকার অঞ্চলপ্রধান। বিষ্ণুপদ বললে—গ্রামের লোক ট্যাক্স না দিলে অধ্যক্ষ কি করবে? কোত্থেকে টাকা আসবে হে?

—সে তোমার কংগ্রেসী বোনাইকে জিজ্ঞাসা কর। বাবা, ওপর

থেকে টাকা আসছে—কাঁড়ি দরুনে,—বি-ডি-ওকে পকেটে পুরে কাটো ভাউচার করো সই। ব্যাস। এদিকে ট্যাক্সো চালাচ্ছ। এই তো মার্চে টাকা আদায় করেছ ডিস্ট্রেসের ভয় দেখিয়ে গেল কোথায় সে টাকা? শালা সব খেয়ে দিলে হে।

—দেবে না? বাঘে ধান খেলে তাড়ায় কে হে? বলিহারি বাবা এক নয়নের দিব্যদৃষ্টি! বাবা বেছে বেছে যত জোতদার আর ব্যবসাদার অর্থাৎ শাঁসালো এবং ধুরন্ধর ব্যক্তিকে বসিয়ে দিয়েছে জেলা কংগ্রেস থেকে মণ্ডল কংগ্রেস পর্যন্ত, ওদিকে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে থানা পরিষদ পর্যন্ত। জেলা পরিষদ বাকী। তা সেখানেও হয়ে যাবে মিলওনার বাবু; সে-ই তো কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট।

এই কথাতেই তাপমাত্রা হঠাৎ বেড়ে উঠেছে— যেন হঠাৎ এক ঝলক উত্তাপ দমকা হীটওয়েভের মত এসে পড়েছে। এখানকার মণ্ডল কংগ্রেসের সভাপতি উত্তপ্ত হয়ে বলে উঠেছে— আই প্রটেস্ট! স্ট্রংলি প্রটেস্ট! এভাবে পারসোনাল অ্যাটাক—

তার কথা শেষ হয়নি— দিবাকর চৌধুরী রাগী মানুষ, সে ব'লে উঠেছে— আই ডোণ্ট কেয়ার। আমি আবার বলব—

—বলো না দিবাকর। রিপোর্ট চলে যাবে—তুমি, তোমার গুষ্টি সব লাল মেরে গেছ!

—গেছি তো গেছি। কার কি সাধ্য আছে ক'রে নিক!

—সাধ্যি আর কি! থানা থেকে নজর রাখবে—

—রাখুক বাবা রাখুক। দেশের টাকাগুলো নিয়ে তছনছ করে দিলে বাবা! দেশে বলবার মানুষ নেই।

হেসে আবার নেপাল চৌধুরী বললে—মানুষ নেই মানে?— এতবড় সতীশ ঘোষাল মন্দ মানুষ জ্যান্ত কবি ছড়াদার থাকতে, অমর চক্কোত্তীর মত গলাবাজ থাকতেও বলছ মানুষ নেই? বল কি হে!

—চুপ কর ঘোষাল আসছে। হাতে লাঠি নিয়ে বাড়ী থেকে বেরুতে দেখেছি আমি।

আজকালখার ধুয়োটা কি তার বল তো ? শুনতে কিছু পাই না।

—শুনবে কি ? কিছুদিন চুপচাপ আছে— সেদিন পথের উপর ওকে ছেলেরা ধরে খুব টাইট দিয়েছিল। ভাগ্যে সেদিন সুরেশ্বরবাবু ছিল তাই রক্ষে—না হলে করোনারী না-হয় সেরিব্রেল থ্রমবসিস্ একটা হত। শুনলাম—ওর মা ওকে খুব মিনতি করেছে। বউ খুব কেঁদেছে—। ঘোষাল প্রতিজ্ঞা করেছে কারুর কোন কথায় আর থাকবে না।

এখানে যখন পল্লী স্বায়ত্তশাসন বা গ্রাম-স্বরাজের বিতর্ক চলছিল, তখন পঁচিশ বছরের কমবয়সীদের আসরে চলছিল—ফার্স্ট ডিভিশন ফুটবল লীগের কথা—চিরকেলে মোহনবাগান—ইস্টবেঙ্গলের লড়াই —এবং তার সঙ্গে ছবির রাজ্যের উত্তম সুচিত্রা সুপ্রিয়া সৌমিত্র সত্যজিৎ রায়ের কথা—পাশাশাশি একসঙ্গে এক নিঃশ্বাসে। তার তার সঙ্গে আসছিল নাটকের আলোচনা। গ্রামে হরিবিষ্ণুবাবুদের পূর্বপুরুষদের দাক্ষিণ্যে এবং উদ্যোগে তৈরী পাকা স্টেজটা অনাথ হয়ে পড়ে আছে। সেখানে এখন অভিনয় উদ্যোগের অভাব হয় না— সেখানে নতুন ক'রে অভিনয়ের কথা হচ্ছে। নাটক ?—কোন্ নাটক হবে ?

ছেলেগুলি যারা জমে আছে—তারা একালের ছেলে—বারো-চোদ্দজনের মধ্যে দু'তিনজন ছাড়া সকলেই মোটামুটি শিক্ষিত অর্থাৎ লেখাপড়া শেখা ছেলে। জনচারেক গ্র্যাজুয়েট। জনতিনেক এল-সি পাস ; বাকীরা ম্যাট্রিক পাস। একজন আই-এ ফেল। এখানে তখন সেই মুহূর্তটিতে নাটকের কথার, মধ্যে শুভেন্দুর ভাই বলে উঠল—কেন বাবা, নাটক নাটক করে মাথা ঘামিয়ে কি লাভ বল ? এখানে তো বেগুন গাছেও নাট্যকার ঝোলে—এবং নাটক ফলে। লাগাও না যা হোক একখানা। এন-এস-বি, এন-জি-এম, কে-কে-এম, টি-এস-বি, এন-এন-বি— শুনেছি এই পাত্র-ও একখানা নাটক লিখেছিল গরুচোর বলে—সেই নাটক চুরি করেছিল চৌধুরী-

বাড়ীর ছেলে। এ-কে-আর তো বসেই আছে নাটকের গাদা নিয়ে—যাও না।—

সকলের মুখেই হাসি দেখা দিল। হাসির কথাই বটে। চৌধুরী-বাড়ীর ভাগ্নে এ-কে অর্থাৎ আর্যকুমারের মাথা খারাপ হয়ে গেছে—তিনি এখন বাড়ী বসে বসে শুধু নাটক লেখেন এবং লোকজন পেলেই বলেন—কি? একবার থিয়েটার-টিয়েটার কর তোমরা। এমন সুন্দর নাটক লিখেছি হে!

আর্যকুমার শুধু নাটকই লেখেন না, তিনি বলেন বাংলাভাষার সব ভাল নাটকই তাঁর লেখা। তাছাড়াও পাগলামি আছে। সকাল বেলায় একবার উঠেই পোস্টাপিস গিয়ে একটা লেকচার দেন ইংরিজীতে—তারপর আসেন থানায়। সেখানে একটা লেকচার দিয়ে বাড়ী ফিরে বৈঠকখানায় বসে রাস্তার লোককে ডেকে বলেন—শোন তো হে! শুনে যাও তো নতুন নাটকের এইখানটা—কেমন হয়েছে বল তো!

উত্তর না দিয়ে, এমনি আপন মনে চলে যাওয়ার মত চলে গেলে বিশেষ কিছু ঘটে না, কিন্তু 'সময় নেই' বা 'না পারব না' বললে রক্ষা থাকে না—তিনি চীৎকার করে আর একটা লেকচার দেন।

হাসিটা এই কারণে।

ঠিক এই মুহূর্তে উঠল একটা শব্দ—তার সঙ্গে একটা কোলাহল; কয়েকটা ক্রুদ্ধ চীৎকার বাদানুবাদ, একটা প্রচণ্ড শব্দ, যে শব্দ ওঠে বস্তু সংঘাতের ফলে, একটা ভয়ার্ত চীৎকার। সব কটা একসঙ্গে। একটি মুহূর্তে একই সঙ্গে।

সকলেই চমকে উঠল—কি হল?

ছেলেদের দল সচকিত হয়ে তাকাল। প্রৌঢ়ের দল উদ্‌গ্রীব হয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে প্রায় একসঙ্গে প্রশ্ন করলে—কি কাণ্ড! কি হল?

বৃদ্ধেরা বিরক্তিভরে বলল—আঃ ছি—ছি—ছি।

ফটকের ওধারে সতীশ ঘোষাল থমকে দাঁড়ালো।—কি হল ?

থমকে এবং চমকে গেল সকলেই যে যেখানে ছিল—সেখানেই সে এবং তারা চকিতভাবে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মনে মনে নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করলে কি হল ? তারপর প্রশ্ন সরব হয়ে উঠল।

সতীশ যেমন প্রশ্ন করলে তেমনিভাবে সকলেই প্রশ্ন করলে-- এদল ওদলকে—কি হল ?

বিচিত্রভাবে শব্দটা যেন একটা নয়। অনেকগুলো শব্দ এক সঙ্গে একই মুহূর্তে বিচিত্রভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটা বড় অখণ্ড শব্দে পরিণত হয়ে ধ্বনি তুলেছে– প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

একটা যেন খুব বড়জাতের পটকা ফুটেছে। তার সঙ্গে আরও অনেক শব্দ, সম্ভবত কোন টিনের উপর ভারী একটা কিছু পড়েছে সন্দেহ নেই। অথবা টিনের চাল সমেত কোন ঘর ভেঙে পড়েছে।

সব থেকে বেশী উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন নাটমন্দিরের প্রবীণারা। গোটা চৌধুরীপাড়াটাই ভাঙা আর ফাটা পুরীর রাজত্ব। সেই কোন পুরানো আমলে তৈরী বাড়ী ;—দুশো বছরের বেশী বয়স ; দুশো বছরে ভেঙেচুরে আগাগোড়া নতুন কিছু হয়নি, হয়েছে,—মানে, পড়েছে বেশীর ভাগ পার্টিশনের দেওয়াল, কোথাও কোথাও বারান্দা ঘিরে খুপরীর মত ঘর, দু-চার বাড়ীতে দু-চারখানা নতুন ঘর হয়েছে, তাও ভিত্ খুঁড়ে নয়, একতলার মাথায় দোতলায়, দোতলার মাথায় তিনতলায়। এবং এই পুরুষে গত দশ পনের বা বিশ বছরের মধ্যে প্রায় প্রতি বাড়ীতে টিনের চাল দিয়ে হয় ছাদের উপর নয় উঠোনে বা ছাদে উঠোনে দুই জায়গাতেই তৈরী করা হয়েছে, বাথরুম। ও নইলে মান থাকে না জাত বাঁচে না। জাত মানে জমিদারী জাত। তাই কার বাথরুমের চালের উপর কি পড়ল এই প্রশ্নটাই সকল প্রবীণার মনে যেন জিজ্ঞাসা চিহ্নের মত মনের ব্ল্যাকবোর্ডে বেশ বড় করে আঁকা হয়ে গেল।

—বাবু মশায়রা !—মাসীর বাড়ীর পূর্ব পাশের দেওয়ালটা—।

নাটমন্দিরে বুড়োবাবুদের আসরের সামনে এসে দাঁড়াল সাঁওতালদের মেঘু সর্দার। এবং ডাকলে—বাবু-মশায়রা! মাসীর বাড়ীর পূর্বদিকের দেয়ালটা—।

বড় আসরে বসেছিল চৌধুরীবাড়ীর প্রবীণেরা—তাঁদের দৌহিত্র বাড়ীর-মাতব্বরেরা সকলেই একসঙ্গে প্রশ্ন করে উঠল—কি? কি হল? কিসের শব্দ?

—মাসীর বাড়ীর ঘরের পূবের দেয়ালটা গো—

—কি?

—দড়াম করে পড়ে গেল।

—দেয়ালটা পড়ে গেল?—আচমকা পাকা দেয়াল পড়ে গেল?

—হাঁ। ওই তুদের বাউড়ী পাড়ার উরা আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করতে এল। উরা আমাদের খাসী চুরি করে খেয়েছে। তাই নালিশ করেছি আমরা। তার উপরে উদের কাজটো আমরা করছি তুদের কথায়—; এই সব লেগে উরা এল দল বেঁধে। বলে তুদিগে মেরে ভাগাব—। নিয়ে ওই দ্যালের গোঁড়াতে একটা এই মোটা পটকা না বোমা কি বলে দিলে দুম্ করে মেরে। অমুনি দেয়ালটো কাঁপতে কাঁপতে হুড়মুড় করে পড়ে গেল।

—বোমা মারলে—, দেয়াল ভেঙে দিলে—? বাউড়ীরা?

চৌধুরী বংশের শ্রেষ্ঠ দৌহিত্রবংশের বংশধর ইস্কুলের সেক্রেটারী হরিবিষ্ণু বাঁড়ুজ্যে হাতের সিগারেটটা আছড়ে মাটিতে ফেলে পা দিয়ে পিষে ফেলে বললেন—এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে? এই তো অবশ্যম্ভাবী! কুরুক্ষেত্রে কৌরব বংশ যখন ধ্বংস করলেন শ্রীকৃষ্ণ, তখনই যদু বংশেরও ধ্বংস নির্ধারিত হয়েছিল—এবং তারপরই এটাও নির্ধারিত সত্য হয়েছিল যে শবরেরা ব্যাধেরা একদিন দল বেঁধে এসে যদু-বংশের বধূকন্যাদের ধরে নিয়ে যাবে।

—তার মানে? ফোঁস করে উঠল হরেকৃষ্ণ চৌধুরী। গোপাল

চৌধুরী বিস্ফারিত দৃষ্টিতে হরিবিষ্ণুর দিকে তাকিয়ে কথাটা বুঝতে চেষ্টা করছিল—তার মাথার মধ্যে এখনও গোলমাল পাকিয়ে আছে। সে কাঠের গড়গড়ার নলটা হাতে ধরে বললে—কি ? কি ? কি হল ?

হেসে হরিবিষ্ণু বললে—ও তুমি বুঝতে চেয়ো না খুড়ো। ওতে অনেক ছেঁড়াচুল বটের আটা আছে—জটা বনে গিয়েছে। চিরুনিতে আঁচড়াতে গেলে চিরুনি ভাঙবে।

ব্রজকান্ত বলে উঠল—তা যদুবংশটা কোন বংশ শুনি ?

—কেন ? চৌধুরীরা। জবাবটা যেন হরিবিষ্ণুর ঠোঁটের ডগায় মজুদ হয়ে ছিল।

—হুঁ। আর তোমরা ? বেশ তিক্ত সুরে প্রশ্ন করলে ব্রজকান্ত।

—আমরা ধর—। আমরা আর কি, আমরা—। কথা শেষ হবার আগেই শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী বলে উঠল—ধরতে হবে না। তোমরা কৌরব।

হরিবিষ্ণু আবার একটা সিগারেট ধরিয়ে বললে—তা হতে আর আপত্তি কি ? তবে গরমিল হচ্ছে তো। স্বাধীনতা হল দেশের ; বলা চলে কুরুক্ষেত্তর পার হয়ে গেল। রাজ্য অবিশ্যি গিয়েছে কিন্তু কৌরবেরা টেঁকে রইল যে গো ! আর তোমরা যদি নিজেরা যদুবংশ বলে দাবী কর তা হ'লে পরিণামেই বা মেলে কই। মা ষষ্ঠীর দয়ার তো অভাব নেই। খুড়ীমাদের কোলে তো বছর বছর নতুন খোকা দেখতে পাই। তাছাড়া ধর, যদি, তাই মেনে নিলাম আমরা কৌরব তোমরা যাদব, তা হ'লে পাণ্ডবটা দাঁড়ায় কে ?

এতক্ষণে সতীশ ঘোষাল সরস কৌতুকদীপ্ত মুখে বললে—হম জানতা হ্যায় বাবা। আর কেউ জানতা নেই। এটি হল—লোকাল কংগ্রেস-লীডার জেলখাটা অর্থাৎ বনবাস প্রত্যাগত ভবানীকিংকর।—হুঁ—হুঁ।

রহস্য-রসিকতার সুগারকোটিং দেওয়া এই যে বাঁটুল যুদ্ধ চলছিল—এই যুদ্ধটি এই বহুকেলে জমিদার ভদ্র বংশ অধ্যুষিত চন্দনপুরের একটা বিশেষভাবে চিহ্নিত ধারা। চমৎকার পৌরাণিক তুলনার মধ্য দিয়ে মিষ্ট ভাষায় জ্ঞান-গাম্ভীর্যের নামাবলী বা উত্তরীয় গায়ে

দিয়ে পরস্পরকে মর্মান্তিক অভিসম্পাত দিয়ে থাকেন। জমিদারী বিগত হতে বসেছে; সে একরকম গেছেই। বাড়ীগুলো ফেটেছে, বংশাবলী জ্যামিতিক হারে বেড়েছে—তবু এই অভিজাত যুদ্ধপ্রথাটি যায় নি। এবং এই যুদ্ধে তারা যখন মাতে তখন আর সব ভুলে যায়। সে হিসেবে একে কুরুক্ষেত্রের পালার সঙ্গে তুলনা না করে পাশা খেলার আসরের সঙ্গে তুলনা করাই ভাল—কারণ তখন আর এদের জ্ঞান গম্যি থাকে না—দ্রৌপদীকে পণ রাখার মত প্রমত্ততাও বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে।

এ আলোচনাটা আরও চলত হয়তো। কারণ শব্দটা আর দ্বিতীয়বার উঠে তাঁদের ব্যাঘাত ঘটায়নি—এবং শব্দটার কারণ যা পাওয়া গেছে—তাতে কারুর কোন ব্যক্তিগত ক্ষতি হয়নি; মোটামুটি বোঝা গেছে—'সাজার মা' অর্থাৎ বহুজনের—মালিকানি বিশিষ্ট 'মাসীর বাড়ী' নামক ঘরখানার পূর্বদিকের দেওয়ালটা সশব্দে পতিত হয়েছে। বাউড়ীদের কারা এসেছিল মারামারি করতে সাঁওতালদের সঙ্গে।—তারা পটকা বা বোমা ছুঁড়েছিল।

কিন্তু মেঘু সর্দার আবার বাধার সৃষ্টি করলে—বললে বলো গা—বাবুরা! এক শালোকে ধরেছি—উকে কি করব?

—ধরেছিস একজনকে?

—হঁ গো। আরও দুজনাকেও ধরেছিলাম—তা সেই সাঁপটো বেঁরায়ে পড়ল; এই ফেণা, এই মোটো, আর বেঁড়ে পারা—সেই টো। কুথা ছিল—উইখানে—

—হ্যাঁ বাস্তুসাপটা ওখানেই থাকে আজকাল।

—হঁ ওই দেয়াল পড়ল—আর উটা কুথা ছিল কুন ঝোঁপে ঝোড়ে বেঁরায়ে পড়লো। বেঁড়ে সাঁপ, ছুটো হঁয়ে গেইছে, এই মোটো—ছুটতে লারে, কি করবে ফেণা তুলে দাঁড়ালেক। 'কামড়াতো আমাদের একটো ছেলেকে;—তা পিটায়ে মেরে দিলাম—তো ছেলেটা বাঁচলো কিন্তু উরা পাঁলায়ে গেল!

অর্থাৎ বোমার আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ালটা ভেঙে পড়ে গেল; সঙ্গে সঙ্গে কোথায় কোন্ গর্তে বা ঝোপে-জঙ্গলে সাপটা ছিল বেরিয়ে পড়েছিল। বুড়ো সাপ প্রকাণ্ড ফণা তেমনি মোটা কিন্তু বয়সের জন্য লম্বায় ছোট হয়ে গেছে, লেজের দিকটা ক্ষয়ে ক্ষয়ে এসেছে। সেটা চলে মন্থর গমনে। ছুটতে পারে না। অগত্যা এতগুলি লোকের মধ্যে ফণা তুলে দাঁড়িয়েছিল এবং একটা ছেলেকে আক্রমণ করেছিল। তখন সাঁওতালরা সাপটাকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মেরে দিয়েছে। সেই সুযোগে—বাউড়ীদের আর দুজন যারা ধরা পড়েছিল তারা ছুটে পালিয়ে গেছে।

"সাপটাকে মেরে ফেলেছিস ?"

একসঙ্গে অনেকগুলি কণ্ঠস্বর থেকে একই প্রশ্ন উচ্চারিত হল। —"সাপটাকে মেরে ফেলেছিস!"

একটা সর্বনাশ হয়ে গেছে বলে মনে হল। কণ্ঠস্বর যেন হতাশায় ভেঙে পড়ল। "সাপটাকে মেরে ফেলেছিস!"

সাপটা বাস্তুসাপ। চৌধুরীদের বাস্তুদেবতার প্রতীক; কেউ বলে ওর বয়স পাঁচশো বছর; কেউ বলে—ওর থেকে কিছু কম। কতকাল পত্তন হয়েছে এই ঠাকুরবাড়ীর, গোপনব্রজের—ততকাল ও এসে ঢুকেছে এই ঠাকুরবাড়ীতে।

লোকপ্রবাদ—যে সন্ন্যাসী নবাবদপ্তর থেকে মা চণ্ডীর জন্য নিষ্কর জমির সনন্দ নিয়ে এবং চৌধুরী শিষ্যদের রাজরাজেশ্বরের নামে জমিদারী কিনে চন্দনপুর আসেন—সেই দিন এই বাস্তুদেবতা এসে চৌধুরীবাড়ী ঢুকেছিল।

সেই বাস্তুদেবতাকে মেরে ফেলেছে ?! আজ এই রথের দিনে ?! হে রাজরাজেশ্বর—হে ভগবান!

মেঘু আবার বললে—বুল গা বাবুরা! উরা আবার ফিরে আসবেক। মারামারি করবেই উরা। বুল—! উ বাউড়ীটিকে তুরা নে—যা করবার কর, আমরা বাবু চলে যাছি। উয়াদের সাতে

মার আমাদের হবেই। হুঁ। উরা আমাদের খাসী খেয়েছে চুরি করে, আর বুলছে—এ সব কাম উদের কাম,—ই কাম করতে আমরা পাব না! হুঁ!

॥ ২০ ॥

ব্যাপারটা বড্ড জড়ানো ব্যাপার। আজ বছর চারেক থেকে একটা দুরারোগ্য ব্যাধির মত চন্দনপুরের জীবনকে আক্রমণ করেছে। চৌধুরীবাবুদের এবং মা চণ্ডীর স্থানের আশ্রিত এক দল বাউড়ী সেই পুরনো কাল থেকে এখানে বসবাস করছে। তাদের সঙ্গে আছে ঘর কয়েক বাগ্দী, কয়েক ঘর ডোম।

মা চণ্ডীর নিষ্কর পুকুরের পাড়ে এরা বাস করে। কোন খাজনা নেই; শুধু মা চণ্ডীর থানে বছরে একদিন বেগার দিতে হয়। এ ছাড়া এরা পুরুষানুক্রমে চৌধুরীদের বাড়ীতে বাঁধাধরা কাজ করে আসছে। এক এক চৌধুরীবাড়ীতে এক এক ঘর ওরা বাঁধা চাকর। বংশানুক্রমে চৌধুরীরাও বেড়েছে এরাও বেড়েছে। এরা রাখালী করে মাহিন্দারি করে—কৃষানি করে, মেয়েরা বাড়ীতে বাসন মাজার কাজ করে; উঠোন ঝাঁট দেয়; আঁস্তাকুড়ও পরিষ্কার করে। চৌধুরীরাই ওদের খাবার ধান দেয়—ঘর ছাইবার খড় দেয়, রোগে অসুখে চার আনা আট আনা থেকে দু টাকা পাঁচ টাকা ঋণও দেয়; এরা তা শোধ করে চলে বংশানুক্রমে। চৌধুরীদের ঠাকুর-বাড়ীতে এই গোপন ব্রজে ওদের নেমন্তন্ন দেওয়া আছে—রথের দিন একদিন রাশের দিন একদিন ও দোলের দিন একদিন—এই তিনদিন রাজরাজেশ্বরের প্রসাদ পেতো বৎসরে এবং দুর্গাপূজোর সময় নবমীপূজার দিন একদিন মায়ের প্রসাদ পেতো তার সঙ্গে নবমীপূজায় যে মহিষ বলি হত সেই বলিটা পেতো। আরও পেতো বিজয়া দশমীর দিন চণ্ডীতলায় বলির মহিষের ধড় ও মুণ্ডটা। এ

ছাড়া দশমীর দিন চণ্ডীতলায়—মায়ের মাংস ও মসুরী কলাইয়ের একটা ভোগ হয়—সেই ভোগের প্রসাদও পেতো। রাত্রে এক হাঁড়ি মদের দাম পেতো। এসবের বদলে ওদের রথে রাশে দোলে—এক-একদিন ঠাকুরবাড়ী পরিষ্কারের কাজ করতে হত। এবং বিজয়া দশমীর দিন এদের দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জনের জন্য কাঁধ দিতে হত।

বর্তমানে ওদের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে; চৌধুরীবাড়ী নিমন্ত্রণ বন্ধ করেছে; ওরা বেগার বন্ধ করেছে; কিন্তু নিমন্ত্রণের দাবী ছাড়ে নি। তার সঙ্গে আর একটা গোলমাল বেধেছে—সেটা হল রথ-টানার ব্যাপার নিয়ে একটা বিচিত্র গণ্ডগোল। নিয়ম ছিল চৌধুরীদের গোপন ব্রজ বা ঠাকুরবাড়ীর 'সিংদরজার' ও-পাশে অর্থাৎ ভিতরে রথ টানবে ব্রাহ্মণ থেকে জলচল জাতি যারা তারাই—সেটা ক্রমে ক্রমে ভদ্র জাতিতে পরিণত হয়েছিল—এবং সিংদরজার বাইরে গ্রামের মধ্যে রথ টানত এই বাউড়ীরা। এখন বাউড়ীরা ক বছর থেকে দাবী ধরেছে রথ টানতে হলে তারা ওই ঠাকুরবাড়ীর ভিতর থেকেই টানবে। চার বছর থেকে গোলমাল বেধে রয়েছে। প্রথম দু বছর কথা কাটাকাটি করেও শেষ পর্যন্ত পুরনো নিয়ম বজায় থেকেছিল। গত দু বছর বাবুরা নিমন্ত্রণ বন্ধ করেছে, বেগারও নিচ্ছে না; এবং গ্রামের পথে রথ বের করাও বন্ধ করেছে। রথ ঠাকুরবাড়ীর এলাকার মধ্যেই টেনে শেষ করে; রশিখানেক দূরে বহুকালের ওই 'মাসীর বাড়ী' নামক টিনে ছাওয়া একটা দুয়ার-হীন ঘর, সেই ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে রথের পরব শেষ করে।

বাউড়ীদের এইখানেই ঘোরতর আপত্তি। কেন তারা ঠাকুর-বাড়ীর ভিতরের এলাকা থেকেই রথ টানতে পাবে না? ওরা ঠাকুরবাড়ীর ভিতর ঢুকতে পায়—সেখানে কাজকর্ম করে। এমন কি—চণ্ডীমণ্ডপে ঢুকে বেদীর উপর থেকে ওরাই দুর্গাঠাকরুণ নামিয়ে ঘর থেকে বের করে আনে; তবে কেন ওরা রথ টানতে পাবে না?

গোলমালটা এখানেই শেষ নয়, আরও আছে, গতবার

বিজয়া দশমীতে দুর্গাঠাকরুণ প্রতিমা বিসর্জন নিয়েও একটা জট পাকিয়েছে। বিসর্জনের জন্য এখানে প্রতিমা বের ক'রে বাঁশের চারখানা সাঙের উপর চাপিয়ে ঢাক ঢোলের বাজনার তালে তালে নাচতে নাচতে চলে বাহকেরা। তার জন্য বাবুদের অন্যান্য বরাদ্দের সঙ্গে বরাদ্দ আছে এক জালা বা এক হাঁড়ি পচাই মদের। তাঁর স্থলে ওরা এখন আকণ্ঠ মদ্যপান করে প্রতিমা বাঁইচ করে। তাতে প্রায় প্রতিবারই প্রতিমার কিছু কিছু ভাঙে। কয়েকটা আঙুল—একটা হাত বা চালচিত্তিরের খানিকটা যায়। আগের কালের ভয় আর নেই। বাউড়ীরাও মানে না—বাবুরাও নিরুপায়। তাঁদেরও আগের কালের প্রতাপ নেই। ফলে গতবার যা হয়েছে তা মনে করতে শরীর শিউরে ওঠে; বাহকদের পা ট'লে গিয়ে প্রতিমা প্রায় ডানদিকে কাত হয়ে পড়ো পড়ো হয়ে কোন রকমে বেঁচেছে, কিন্তু পুরো বাঁচেনি। গণেশের মুণ্ডটা এবং ডানদিকের হাত দুটো একেবারে খসে পড়ে গেছে।

তার প্রতিকারের জন্য তখন হয়েছিল অনেক কিছু। কিন্তু 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া' এই সূত্রানুযায়ী শেষ পর্যন্ত হয়নি কিছু। সে সব দিক থেকেই। শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী কোন পূজার্চনাও করাননি বাবুরা এবং বাউড়ীরাও মৌখিক একটু লজ্জা প্রকাশ ব্যতীত আর কিছু করেনি। বিচিত্র একাল-বিচিত্র এ কালের ধর্ম। ওই বাউড়ীরা এর জন্য এতটুকু শঙ্কিত বা ভীত বা উৎকণ্ঠিত হয় নি। দেবতা ব্রাহ্মণ বিশ্বাস যে নেই ওদের তা নয়। তবে সার্কাসের বাঘ সিংহীর মত যেন ওদের অনেকটা নিরীহ করে এনেছে। একটা কথাতে প্রমাণ পাওয়া যায়। যে বাউড়ীটি গোপাল চৌধুরী উদ্যত জুতো কেড়ে নিয়েছে—সেই বলেছিল—ওরে ওরা কিছু লারবে রে, চুপ ক'রে গ্যাট হয়ে বসে থাক। যাক ক্যানে, ওরা নিজেরা কাঁধে ক'রে ওই মাটির ঠাকুরের ওজন বয়ে নিয়ে যাক! দেখি! হঁ। বলে সেই—নড়তে নারে বন্দুক ঘাড়ে। আর হবে কচু! ছাই হবে!

চোরের অনুমান অভ্রান্ত। বাবুরা কোন হাঙ্গামা করে নি। শুধু বলে দিয়েছে—"আগের ব্যবস্থা বাতিল হয়ে গেল বাবা। আমরা বেগার নেব না। আর নেমত্তন্ন-ফেমত্তন্নও না।"

তা ছাড়া নবমীর দিন মহিষ-বলি উঠে গেছে। বিজয়া দশমীর মহিষ-বলিও বাতিল হয়েছে। এক-একটা মহিষের বাচ্চার দাম এখন একশো, একশো পঁচিশ; মোটামুটি উঠিয়েই দেওয়া হয়েছে। এ উঠিয়ে দেবার জন্য বাবুরা ব্যস্তই ছিল, এবার একটা ছুতো পেয়ে বর্তে গেছে।

ঝগড়ার শিকড় এই এমনি ভাবে, দুর্গা নবমী, বিজয়া দশমী থেকে রথযাত্রা রাসযাত্রা দোলযাত্রা পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে; তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের সারা বছরটার রন্ধ্রে রন্ধ্রে শিকড় চালিয়ে দিয়েছে। ঠিক এই সময়ে হাউমাউ করতে করতে এসে উপস্থিত হল নসুবালা। হেই মারে। কি হবে রে! ও দাদারা তোমবা এর বিধেন কর—লইলে

আর থাকবে না গো। রসাতলে যাবেগ।

* * *

মাঝিদের একটা খাসী বাউড়ীদের ছোকরারা চুরি করে খেয়েছে—এটা সত্যি; তার দায়ে জনকয়েকই দায়ী, সকলে নয়। তার খেসারৎ নিয়ে মামলাটা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রও এটা নয়—যুদ্ধক্ষেত্রও নয়। আসলে বাবুরা ঠাকুরবাড়ীর সিংদরজা বন্ধ করে দিয়ে যে বাউড়ীদের দাবীটা অগ্রাহ্য করে দেবেন সেটা তাদের সহ্য হয় নি। দেবদ্বিজে ধর্মে ভগবানে বিশ্বাসের স্বরূপটা তাদের যেমনই হোক, সেটা খাঁটি সোনা বা রূপা বা তামার মত কোন ধাতুর তুল্য না, হোক, অন্ততঃ লোহা বা টিন বা সীসের মত কিছুর তুল্য বটে তাতে সন্দেহ নেই। তার মূল্য বাজারে না থাক, তাদের নিজের জীবনে আছে। তারা ঠাকুরঘরে ঢুকে পুরোহিতের পদ চায় না, বামুন-কায়েতদের মত পাটের কাপড় পরে পুষ্পাঞ্জলিও দিতে চায় না কিন্তু বাবুদের বাড়ীতে পাট-কামের অঙ্গ হিসেবে ওরা যখন ঠাকুরবাড়ীর উঠোন চেঁচে পরিষ্কার করে ঝাড়ু দেয়, মেরামত করে, তাদের মেয়েরাই নিত্য অঙ্গনে

মাড়ুলী দেয়, তখন রথ টানবার জন্য তারা ঠাকুরবাড়ীর এলাকার মধ্যে ঢুকতে পাবে না কেন ? দুর্গাপূজার সময় একেবারে চণ্ডীমণ্ডপের ঘরের ভেতর থেকে তারা প্রতিমা বের করে আনে ; তবে ?

বাউড়ীদের মাতব্বর বলেছে, আমাদের প্রেস্টিজ। প্রেস্টিজ শব্দটা তারা শুনে শুনে শিখে ফেলেছে। নস্তুবালা বললে—দাদাবাবারা কি বলবগ। বলছে আমাদের পেস্টিজ থাকবে না। পেস্টিজ কি—না বললে মান্যি। মান্যি থাকবে না।

আজকের এই রথের দিনে মশগুল মজলিশগুলোকে চকিত করে দিয়ে যে মাসীর বাড়ীর টিনে ছাওয়ানো ঘরখানার পূর্বদিকের দেওয়ালটা প্রচণ্ড শব্দ করে ভেঙে পড়ল—তার হিসেবও ঠিক তাই ; অর্থের ক্ষতি খুব একটা কিছু নয়। পুরনো আমলের রথের ঘর ; কাদায়-ইটে গাঁথা দেওয়াল, তাও দেওয়াল চারখানা নয়, সাড়ে তিনখানা,অর্থাৎ সামনের দরজাটা রথ ঢুকবার মত প্রশস্ত হওয়ায় আধখানা দেওয়াল জুড়েই দরজাটার পরিসর। মাথার উপরে এককালে পুরনো আমলের টালির ওপর পেটানো ছাদ ছিল ; কড়িবরগা ছিল তালকাঠের বা কাঁড়ির, সেগুলো বয়সের সঙ্গে বুড়োমানুষের পিঠের মত বেঁকতে শুরু করেছিল ; ক্রমে যখন খানিকটা খানিকটা করে ভাঙতে লাগল, তখন ওই ছাদটাকে ফেলে দিয়ে করোগেটেড শীট দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। বছরে মাত্র সাতদিন কাজে লাগে। পুরীর নিয়মানুযায়ী রথ টেনে গ্রাম ঘুরিয়ে এনে ওই মাসীর বাড়ীতে রথখানা ঢুকিয়ে দেওয়া হয় এবং সাতদিন পর উল্টোরথের দিন রথখানাকে মাসীর বাড়ী থেকে বের করে আর এক পাক গ্রাম ঘুরিয়ে এনে রথের ঘরে তুলে দেওয়া হয়। এমন একটা ঘরের একটা দেওয়াল খসে পড়ায় আর্থিক ক্ষতি কত হয়েছে তা অঙ্ক কষলেই বের হয়ে পড়বে। এবং তার সঙ্গে একটা সাপ মরেছে—অনেক দিনের বুড়োসাপ। তাতেও ক্ষতি বলতে গেলে সে কিছুই হয় নি। তবু যেন একটা আতঙ্কে আতঙ্কিত হয়ে উঠল

সবাই। ওই ঠাকুরবাড়ীতে সমবেত চৌধুরীদের ছোট বড় নারী পুরুষ সবাই এবং তার সঙ্গে তাদের দৌহিত্র বংশীয়েরাও সবাই—। বাঁড়ুজ্জে মুখুজ্জে চাটুজ্জে এমন কি ঘোষাল পর্যন্ত। হরিবিষ্ণু বাঁড়ুজ্জে থেকে দুর্মুখ ঈর্ষাজর্জর সতীশ ঘোষাল পর্যন্ত সকলেই স্তম্ভিত হয়ে গেল।

একটা যেন ভয়ানক কিছু হয়েছে। অত্যন্ত ভয়ঙ্কর কিছু।

যে-হরিবিষ্ণু একটু আগে মহাভারতের যদুবংশ বধদের পরিণতির সঙ্গে উপমা দিয়ে চৌধুরীদের ভবিষ্যৎ ইঙ্গিত করছিল, সেও এখন সেই সত্যটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যেন হতবাক হয়ে গেছে! নসুবালা বললে, পাড়াতে সব 'আয়জন' (আয়োজন) হচ্ছে আমি শুনে এলাম। সকাল বেলাতে আমাকে বলেছিল, আমার সই ওই বাঁকা বাউড়ীর বউ। বলেছিল, আজ রথ নিয়ে হ্যাঙ্গাম হবে সই।

আমি বলি, হ্যাঙ্গাম! হ্যাঙ্গাম কিসের? করে কে? ঠাকুরের রথ!

তা বাঁকার বউ বললে, আমরাও তো ভাই তাই জানতাম। তা সবাই বলছে—ঠাকুরের রথ, ঠাকুরের বাবার রথ। মানুষে টানে তাই রথ চলে। মানুষ মানে—তাই ঠাকুর ঠাকুর, নইলে পাথর। কই, বের করুক তো হাত-পা দেখি।

আমি বললাম, হেই মারে! এমন কথা বলতে আছে না বলে? জিভ খসে যাবে না?

তা বাঁকার বউ বললে, শুধি আয়গা সীমেকে, ওই অমর চক্রবর্তীর বিটি সীমেকে, গায়ে হলুদ নিয়ে যে পালিয়ে এসে থানা এসেছিল—তাকে শুধিয়ে আয় বুন—সে বলেছে ছিদেমের দেঁতোনী বউকে, সে এসে আবার পাড়ায় বলেছে। সীমে বলেছে, 'এত কথার দরকার কি, চোখে তাকিয়ে দেখ্ না কেনে আমার বাবার দিকে; আমার বাবা মা-চণ্ডীর পিঠের উপর চড়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে দিলে—তাতে হল-টা কি? বাবা মরে নাই, বাবার কুষ্ঠ হয় নাই, বাবার হাত-পা পঙ্গু হয় নাই, বাবা কানা হয় নাই—দিব্যি বরং এখন নতুন জামাইয়ের বাড়ী

থেকে ভালমন্দ খেয়ে-টেয়ে শরীর সেরেছে। ছিদেমের বউ বলছিল, সে কি হাসি সীমের!

সতীশ ঘোষাল হাতের তর্জনী আস্ফালন করে বলে উঠল—She is a Communist and you—you শ্রীল শ্রীযুক্তবাবু হরিবিষ্ণু ব্যানার্জী স্কুল and কলেজের রেসপেকটড সেক্রেটারী, you have given shelter to her. She is a Communist.

* * *

না। তা সত্য নয়। সীমা কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গেই কোন রকমে যুক্ত নয়। কোন রাজনৈতিক মতবাদে সে তালিম নেয় নি। তার বাবা কখনও কংগ্রেস কখনও কম্যুনিস্ট কখনও হিন্দু মহাসভা করে বেড়ায়। তার প্রয়োজন টাকার। যে টাকা দেয় তার হয়েই ভোট ক্যানভাস করে বেড়ায়। বলতে পারে, কইতে পারে, হাত-পা ছুঁড়ে শ্লোগান দিতে পারে এই পর্যন্ত। সীমা তারই মেয়ে, কোন রাজনৈতিক আদর্শে তার বিশ্বাস জীবনগত নয়। তবে একালের মেয়ে সে তার উপর অমর চক্রবর্তীর মেয়ে, তার বিশ্বাসের রঙও চড়া হবেই, গন্ধও কড়া হবেই, স্পর্শের মধ্যেও যে হাতের ছাপ পড়বে তা মিহি বা মোলাম হাতের ছাপ নয়।

ব্যাপারটা অত্যন্ত সহজ এবং স্বাভাবিক: মেয়ে-হস্টেলে কাজ করে দেঁতোনী, ছিদামের বউ। তার দাঁত দুটো যত উঁচু তত সে আহ্লাদী। বাঁজা মেয়ে, ছেলে-পিলে হয় নি—তার উপর তার স্বামী ছিদেম সে একজন নিতান্ত নিরীহ লাজুক এবং দেহে-মনে অতি দুর্বল মানুষ। দেঁতোনীর সঙ্গে তার বয়সের তফাৎ অনেক। নিরীহ স্বামীর সেই পরিচালক। ছিদেম মনিবের বাড়ী কাজ করে—মাইনে হিসেব করে নেয় দেঁতোনী, দেরি হলে সেই তাগাদা দেয়। মাসের খোরাকির ধান—তাও দেখে শুনে বস্তাবন্দী করে ছিদেমের মাথায় তুলে দিয়ে বলে—চল্ নে মুন্সে। অসময়ে কাপড় ছিঁড়ে গেলে সেই এসে

তাগাদা দেয়—কাপড় ছ্যান বাবু। কাপড় ছিঁড়েছে। অসময় তা হয়েছে কি? তাহলে ছেঁড়া কাপড় পরে থাকবে, না ন্যাংটা হয়ে থাকবে শেষ? এ্যাঃ—। বলে একটা ঠ্যাকারও দেয়।

এই দেঁতোনী হস্টেলের ঝি। এঁটো-কাঁটা পরিষ্কার করে বাসন মাজে। মেয়েদের সঙ্গে দিদিমণিদের সঙ্গে তার খুব ভাব। ওদের সকল সুখের সকল দুঃখের সহভাগিনী। সীমার সঙ্গে বেশী ভাব, কারণ সীমা হস্টেলের জিনিসপত্র খাওয়াদাওয়া ইত্যাদির দেখাশুনা করবার চাকরি করে। তার উপর এই মাস তিনেক—পরীক্ষা দেওয়ার পর—অখণ্ড অবসরের মধ্যে দেঁতোনীর সঙ্গে সীমার আলাপটা হয়ে উঠেছে অত্যন্ত গাঢ়। নানান বিষয়ের আলোচনা করে। দেঁতোনী জিজ্ঞাসা করে—"আচ্ছা হা সীমে দিদি, তুমি বিয়ে ক্যানে করলে না বল দিকিনি?"

—দূর, এত অল্প বয়সে বিয়ে করে নাকি? লেখাপড়া না শিখে বিয়ে করে নাকি?

—করে না? তবে এতকাল হল কি করে? এই ধ্যারোগা (ধরোগা) গিয়ে সেক্রেটারী বাবুর বউ ছিল, সে তো নেকাপড়া জানত না। ওই তোমার বি. ডি. সাহেবের বউ, সে নেকাপড়া জানে না

—কে বললে? বি. ডি. ও. সাহেবের বউ আই-এ পাস।

—পাস! তবে সি চাকরি করে না ক্যানে?

—চাকরি করে না—। অনেক ভেবে সীমা বলে, করে না খারাপ করে।

—খারাপ করে?

—নিশ্চয়!

অনেক ভেবে-চিন্তে সীমার মনে পড়ে 'বুর্জোয়া' কথাটা। সে বলে—ওরা হল বুর্জোয়া।

বার কয়েক কথাটা উচ্চারণ করবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হি হি করে হেসে নিয়ে বলে—সেটো কি বটে?

—কি, বুর্জোয়া?

—হু।

—কথাটা হল—। একটু ভেবে-চিন্তে সহজ উত্তরটি পেয়ে গেল এবং সেই উত্তরটিই দিয়ে বসল—এই এ গাঁয়ের বাবুরা যা—তাই—তাকেই বলে—। বসে বসে বাপুতি ধনে খায়, সব লোককে ছোট দেখে। বামুনরাও তাই বট—যারা তোদের ছোটলোক করে রেখেছে তোদের ছুঁলে চান করে, তোদের দিয়ে ছোট কাজ করায়—

দেঁতোনী অবাক হয়ে শোনে।

এই সূত্র থেকেই কথাটা উঠেছিল। দেঁতোনী বলেছিল—তাই বটে সীমে দিদি, এই আমাদের পাড়াতেই দেখ ক্যানে, মরদরা বলছিল, বাবুরা সব রথের নেমতন্ন উঠিয়ে দিলে—দশমীর—বেসজ্জনের পাব্বণী মেরে দিলে—

সঙ্গে সঙ্গে সীমা বলেছিল—তোরাও তাহলে কাজ করিস নে।

—হেই মা! অপরাধ হবে না?

—কার কাছে?

—দেবতার কাছে।

—মরণ। দেবতা ঠাকুর-ফাকুর ইসব আছে নাকি? এ যুগে কেউ মানে নাকি? দূর!

দেঁতোনী হেসে প্রায় ভেঙে পড়ে বলেছিল—হেই মা, তোমার বাবা মা-চণ্ডী থানের পাণ্ডা—

সীমা এবার চটে উঠে বলেছিল—পাণ্ডা! পয়সা পায় তাই পাণ্ডাগিরি করে। পাণ্ডা! জানিস বাবা মদ খেয়ে চণ্ডীর মাটির ঢিবির উপর ঘোড়ায় চড়ার মত চড়েছিল—

দেঁতোনীর চক্ষু বিস্ফারিত হয়েছিল—দাঁতগুলির বত্রিশটিই বেরিয়ে পড়েছিল এবং সীমা এই উত্তাপের মুখে একটি উত্তেজনাময় বক্তৃতা দিয়ে ঈশ্বর দেবতা ধর্ম প্রভৃতির উপর মোশন অব নো কনফিডেন্স মুভ করে—দেঁতোনীর ভোটটি পর্যন্ত আদায় করে নিয়েছিল।

এরপর ঘটনাগুলি অতি সহজ এবং স্বাভাবিক। ১৯৫৮ সালের

যে-কাল সে-কালে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে যে-বাতাস বয়—সেই বাতাসে যারা নিশ্বাস নেয়, সে মানুষেরা যেই হোক, বামুন হোক কায়স্থ হোক বাগ্দী বাউরী হাড়ি যেই হোক, তাদের কাছে এই সব ধরনের চিন্তার ক্রিয়া উর্বর ভূমিতে বর্ষাকালে পড়া বীজের মত অঙ্কুরিত হয়ে হু-হু করে বেড়ে উঠেছিল।

এর বেশী কিছু নয়।

না আরও কিছু আছে। এই মাসখানেক ধরে এই কথাটা আলোচনা প্রায় নিত্যই কিছু না কিছু হয়ে আসছে।

দেঁতোনী এই সীমা-মুখ-নিসৃত কথাগুলি যথাসাধ্য আত্মস্থ করে পাড়ায় গিয়ে উদ্গীরণ করেছে। প্রথম স্বামীর কাছে, তারপর ওর সহোদর ভাই এবং আরও কয়েকজনের কাছে। অতঃপর গোটা পাড়ায় সেটা ছড়িয়ে পড়েছে। দেঁতোনীর ভাই একালের ছোকরা, স্বাস্থ্যবান সবল এবং বিশেষ দলের লোক, যার পাণ্ডা হল ওই চোবে বাউড়ী ; যারা স্টেশনে কুলিগিরি করে ; মদভাঙ খায় ; আবার চায়ের দোকানে চা খায় ; রাত্রিকালে হুল্লোড় করে গান করে এবং গ্রামের সকল লোককে গাল দেয় এবং পয়সা-কড়ির অভাব হলে পুকুর থেকে কাঠ তুলে বেচে দেয় ; গোয়াল থেকে ছাগল ভেড়া এনে কেটে খায় ; আবার বেচেও দেয়। এদের কাছে দেঁতোনীর বহন ক'রে আনা বাণীগুলি—অঙ্কুরিত হয়ে বর্তমানে রীতিমত চারাগাছে পরিণত হয়েছে।

ওরা কম্যুনিস্টও নয় কংগ্রেসও নয়, হিন্দু মহাসভাও নয় মুসলীম লীগও নয়, ওরা হল কালের সহচর, ওরা মহাকালের সঙ্গে চিরকাল দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করে বেড়ায়।

—কালটাই যে এমনি নস্থ।

—ঠিক বলেছ দাদাবাবু, যেমন কলি তেমনি চলি।

—কালের নাম কলি হলে কলিকালের ধারাটা এই বটে। এ-কালে সে-কালের কোন কিছু চলবে না।

কথাটা বললেন শ্যামাকিঙ্করবাবু।

নস্থ চুপ ক'রে বসে রইল। কোন এক অগাধ ভাবনার সমুদ্রে সে পড়ে গেছে, তার আর কূল-কিনারা নেই। অনেকক্ষণ পর সে সেই কথাটাই বললে—এর আর কূল-কিনারা নাই, নাকি বল দাদাবাবু।

শ্যামাকিঙ্করবাবু হাসলেন। বললেন—চিরকালই মানুষ এমনি কূলকিনারা-হীন হয়ে ভাসছে রে নস্থ। তবে এক-একসময় তুফান ওঠে; তখন মনে হয়—এমনিতর। মনে হয় পরাণপাখীর খাঁচা বোঝাই মহাজনী নৌকোর মত এই পৃথিবীখানার বুঝি ভরাডুবি হল। কিন্তু হয় না। ঝড় তুফানে কিছু কিছু খাঁচা ভেসে যায়, কিছু পাখী জলে পড়ে ডুবে মরে। তারপর আবার ঝড় থামে, কাল-সমুদ্র শান্ত হয়, তখন আবার পৃথিবীর মহাজনী নৌকো দিনরাতের পাল তুলে চলতে থাকে, মনে হয় পার পাব, পাব সেই দ্বীপটা। যে দ্বীপে দুঃখ নাই, বিপদ নাই, ঝড় নাই, বাদল নাই, মরণ নাই।

—আ মরি মরি। দাদাবাবু—কি শোনালে গো!

—কি শোনালাম— ? তার থেকে তোর গান যে অনেক ভালো! কি গাইছিলি এতক্ষণ—বেতারে বাজিয়ে ফ্লুট—

নস্থ হেসে মিহিগলায় সুর তুলে গান ধরলে—

—বেতারে বাজিছে ফ্লুট—
মন রসনা—থামা কদমতলার বাঁশী
লে ভাতু লে চটী পরে—পথে কাদা নাই লো।
পিচ ঢালা রাস্তায় চল মন রসনা কলিকাতা যাই লো!

—তারপর ?

—তারপর !—শোন তাহ'লে—

সান কাড়তে হবে নাকো সান গিয়েছে উঠি
আলতাপরা ঘুচেছে লো তার বদলে চটি
ও মন রসনা আমার—হায়—গো
আমার সীমে কি যাবে ভাসি ?

শ্যামাকিঙ্করবাবু বললেন—যাক চাকরি. সীমে তোর ভেসে যাবে না।

—যাবে না ?

তার আগে সীমার কথা বলি। দিন সাতেক পর। রথের পর সেদিন আকাশে ঘন বর্ষার মেঘ দেখা দিয়েছে। এলোমেলো বাতাস বইছে। গরমের ছুটির পর ইস্কুল খুলেছে- হস্টেল খুলেছে।

সীমা হস্টেলের মধ্যে তার জন্যে নির্দিষ্ট সেই খুপরীর মত কুঠরীর জানালাটায় চুপ করে বসেছিল। মন তার বিষণ্ণ। দৃষ্টিও বিষণ্ণ। সেই দৃষ্টি আকাশের দিকে তুলে চেয়ে আছে।

তার চাকরি গেছে। হরিবিষ্ণু তাকে জবাব দিয়েছেন। দিয়েছেন ওই অপরাধে, কিন্তু মুখে কিছু বলেন নি।

ওদিকে তাদের বাড়ী থেকে খবর এসেছে, বাবার খুব অসুখ।

অমর চক্কোত্তী, তার বাবা, গতকাল অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে। গাড়ীতে তুলে বাড়ী নিয়ে গেছে। নিয়ে গেছে রমেন্দ্র। নইলে হয়তো হাসপাতালে যেত। মদ খায় চক্রবর্তী. সে কথা বিশ্ববিদিত। কাল বেশী খেয়েছিল ঝগড়া করবার জন্য। চণ্ডীতলা নিয়ে ঝগড়া। সামান্য কারণে ঝগড়া নয়, চণ্ডীতলা নিয়ে প্রকাণ্ড সমস্যা উপস্থিত হয়েছে। সেই সমস্যা ভিত্তির উপর ঝগড়া। অমর চক্রবর্তীর ঝগড়া ইচ্ছা করে। তার ফল—।

দেশের নতুন আইনে—জমিদারি জমি থেকে খাজনা যত রকমের

আছে—সব গিয়েছে গবর্ণমেণ্টের হাতে। পুরনো মতে চণ্ডীমায়ের সেবাইত বল সেবাইত, মালিক বল মালিক—ছিল জমিদারেরা। তারা একজন সাধু-সন্ন্যাসীকে গদীয়ান নিযুক্ত করত। সেই পরিচালনা করত সমস্ত—পূজো-ভোগ, খাজনা আদায় ইত্যাদি। এ ব্যবস্থা আশ্চর্য রূপে অচল হল—উপযুক্ত সাধু সন্ন্যাসীর অভাবে। সন্ন্যাসী মেলে, সাধু মেলে না। তখন হয়েছিল এক ম্যানেজিং কমিটি। দেশ স্বাধীন হবার পর -ম্যানেজিং কমিটি জমিদারে তৈরী করলে না—করলে হিন্দু জনসাধারণ। কিন্তু সেটেলমেণ্টের সময় জমিদার করলে দাবী—সেবাইত তারা। আপত্তি দিলে সেটেলমেণ্টে। ফলে—যে টাকা অন্তবর্তী কালে অ্যান্নুয়িটি পাবার কথা সরকারের কাছ থেকে তা বন্ধ হয়ে গেল। মা-চণ্ডীর দরবার—জমিদার বাড়ীর সমান হল। মায়ের অনাহারের অবস্থা। এই অবস্থায় মাছ বিক্রী ধান বিক্রী করে ম্যানেজিং কমিটি ভোগের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাই চলছিল। হঠাৎ কমিটিতে ঝগড়া লাগল। কমিটির সভাপতি রামসুন্দর গণ্যমাণ্য লোক হলেও—তাকে দায়ে ফেলল কমিটি। কয়েকটা অবিবেচনার কাজ তিনি করেছিলেন। তারা কমিটি থেকে তাকে দায়ী করে শুধু অপদস্থ নয়—পদ থেকে অপসারিত করবার জন্য কোমর বাঁধলে। সভাপতির দল অবশ্যই একটি ছিল। কিন্তু তারা মুষ্টিমেয়। এবং তারা খুব শ্রদ্ধেয় নয়। শক্তিমানও নয়। বিপক্ষে যারা, তাদের মধ্যে বড় বাঁড়ুজ্জে বাড়ীর শিবশঙ্কর, শিবনাথ দে, নিত্য চৌধুরী, ভবানীকিঙ্কর সকলে আছে। সভাপতি সঙ্কট বুঝে কলকাতায় গিয়ে ধরেছিলেন শ্যামাকিঙ্করবাবুকে। শ্যামাকিঙ্কর এখানকার কোন কলহ সমস্যায় থাকেন না। আসেন—দুদিন থেকে সকলের সঙ্গে হেসে খেলে গল্প করে চলে যান। তিনি এলে হস্টেলের মেয়েরা যায়—শিক্ষয়িত্রীরা যায়—প্রণাম করে—গল্প করে চলে আসে অন্য লোক এলেই। মঞ্জু রঞ্জু দুই বোন ভাল গান গায়—তারা গান শোনায়। বন্ধুরা আসে—তার মধ্যে সুরেশ্বর প্রধান,

নিত্য চৌধুরীও থাকে। বাইরের লোকও আসে। শ্যামাকিঙ্করবাবুর নতুন নেশা—গাছের ডাল—বট অশ্বথের ঝুরি থেকে সুন্দর পুতুল তৈরী করেন। চমৎকার সেগুলি। কিন্তু কোন সমস্যা বা কলহের সমাধান করতে বললে—হাত জোড় করে বলেন—আমি তোমাদের ভালোবাসার আদুরে ভাই। আমাকে তোমরা, আর চন্দনপুরের মাটির মধ্যে যে মা আছেন—সেই মা বিদেশে পাঠিয়েছেন—তোমাদের মহিমার কথা বলতে। আর সারা দেশ থেকে যে দান—যে ঋণ তারা পাঠিয়েছে—তাই শোধ করতে। আমি তোমাদের ভালবাসায় ধন্য। আমাকে এসবে টেনো না। এবার কিন্তু তিনি ঠেলতে পারেন নি এঁর কথা। কারণও ছিল। প্রথম সাহিত্যিক জীবনে—যখন তিনি সামান্য—যখন তিনি পথের মানুষ তখন—বছর দেড়েক—কলকাতায় গিয়ে এই রামসুন্দরবাবুর বাসায় থাকতেন—মাসে পাঁচদিন সাতদিন কখনও দশদিন। তারও পেছনে একটু কথা আছে। এই সত্তাপতি—রামসুন্দরবাবুকে একবার গ্রামের প্রধানেরা পতিত করবার আয়োজন করেছিল; করেছিল বিলেতফেরতের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেবার জন্য। তখন শ্যামাকিঙ্কর ছিলেন। জেলফেরত কংগ্রেসকর্মী। তখন তার চোখে বহ্নিকণা বের হত এবং সে বহ্নিকণায় গ্রাম জুড়ে আগুন লাগতেও পারত। সেদিন তিনি রামসুন্দরের পক্ষ নিয়ে সারা গোঁড়া সমাজের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর কথা ছিল—বিলেত গেলেই যদি জাত যায়, সে জাত যায় হিন্দুর অখাদ্য-কুখাদ্য খেলে; তবে বাড়ীতে যাঁরা সাহেব ভোজন করান এবং তাদের সঙ্গে অখাদ্য-কুখাদ্য ভোজন করেন—তাদের পতিত কর সর্বাগ্রে। আমি কারও পক্ষে নই কারও বিপক্ষে নই। আমার যুদ্ধ নীতির জন্য। এতেই রামসুন্দর রক্ষা পেয়ে গেলেন। এরপরই রামসুন্দর শ্যামাকিঙ্করকে সমাদর করে বাড়ীতে আহ্বান করেছিলেন। এবং অপরিসীম যত্ন করেছিলেন এই কালটিতে। তাঁর স্ত্রী মায়ের মত যত্ন করতেন স্নেহ করতেন। সেই সময় হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল। সেই

হৃদ্যতার আকর্ষণেই—রামসুন্দরের অনুরোধে তিনি এসেছিলেন এই গ্রাম্য বিরোধ মিটিয়ে দিতে। কাল ছিল সেই সভা। বহুলোক এসেছিল। রমেন্দ্রও এসেছিল।

ঘটনাটা সম্মান রক্ষা করেই মিটিয়ে দিয়েছেন শ্যামাকিঙ্করবাবু। কিন্তু মাঝখান থেকে মদ খেয়ে প্রমত্ত হয়ে ঝগড়া করেছিল অমর চক্রবর্তী—অন্য একজনের সঙ্গে। নিতান্ত তুচ্ছ কারণে। সে মদ্যপ গালাগাল দিয়ে বলেছিল— তুই আর লাফাসনে। তোর কীর্তি মার্কা-মারা। শালা, তোর নাকে চুন গালে কালি—তুই আর বলিসনে।

—খবরদার। শালা—শুয়ার কি বাচ্চা চুপ রহো।

—চুপ রহেগা? শালা—তুই চণ্ডীমাকে কিল মারিসনি!

—মেরেছি। আলবৎ মেরেছি, ফিন মারেগা। হম পাণ্ডা হ্যায়। সিদ্ধপুরুষ।

— ওরে শালা সিদ্ধপুরুষ। তুই সিদ্ধ, তোর মেয়ে ইস্কুলে সিদ্ধ হচ্ছে।

—খবরদার—

আর কথা বের হয়নি। লাফ দিয়ে পড়তে গেছে লোকটার উপর, কিন্তু তার আগেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে।

রমেন্দ্র জামাই। সে তার নিজের মান-সম্মান বজায় রেখে—তাকে বাড়ী নিয়ে গিয়ে ডাক্তার ডেকে দেখিয়েছে। ডাক্তার বলেছে—সাবধানে রাখবেন। কোন রকম উত্তেজনা যেন না হয়। রমেন্দ্রও মদ খেয়েছিল। বলতে গেলে—রমেন্দ্রের কাছে কলহকারী দুই মদ্যপই মদ খেয়ে প্রমত্ত হয়েছিল। এবং মদের নেশার উদারতায় দীর্ঘ দশ মাস পর শ্বশুর জামাইয়ে এই প্রথম মিল হয়েছিল। দুজনেই নাকি চণ্ডীতলার জঙ্গলে বসে মিটিংয়ের পূর্বে চোখের জলও ফেলেছিল অনেক।

খবরটা সীমা পেয়েছে। বাপ সম্পর্কে এই কয়েকমাস তার কোন আবেগ কেউ লক্ষ্য করেনি—কিন্তু চাপা সীমার মনে মনে একটি তীক্ষ্ণ কাঁটা খচখচ করেছে যখনই কোন স্পর্শ তাতে পড়েছে। বাবা তাকে

ভালোবাসতো, একথা সে অস্বীকার করতে পারবে না। কখনও ভেবে দেখেও তার মনে হয়েছে—বাবার মধ্যে যা গুণ ছিল—তা তো কম ছিল না। সে অভিনয় করতে পারে, সে বক্তৃতা করতে পারে, রাজনীতিও জানে বোঝে। দেশপ্রেম—দরিদ্রের প্রতি মমতা এও তো তার ছিল। সে তো জানে। তবু কী মানুষ কী হয়ে গেল! কেন হয়ে গেল? না—আরও কিছু আছে! আছে! সে যদি স্থান পেত—ছোট হোক খাটো হোক একটুখানি বিশিষ্ট স্থান—যদি একটি উচ্চ মার্গে ওঠার প্রথম ধাপটিতে সে একটু দাঁড়াবার স্থান পেত—তবে হয়ত এমন হত না। আরও আছে, যদি ওই কালের, ওই কালই বা কেন, নারী-লালসা সকল কালের, নারী-লালসা তার না থাকত। যদি পবিত্র হত তবে এমন হত না! তিনটি অভাব ত্র্যহস্পর্শের মত তার বাবার জীবনকে এমন ব্যর্থ করে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিল। ওঃ!"

বারবার তার ইচ্ছা হয়েছে, বারবার—ছুটে গিয়ে বাবাকে দেখে আসে। কিন্তু পারে নি। সাহস হয় নি। একটা সঙ্কোচ, অজ্ঞেয় দুর্নিবার সঙ্কোচ তাকে জড়িয়ে ধরেছে নাগপাশের মত! সেই কারণেই তার মন বিষণ্ণ। উদাস দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে সে বসে আছে। মধ্যে মধ্যে মেঘ ডাকছে। বর্ষার গম্ভীর গুরু গুরু ডাক।

পাশেই রাস্তার ওপাশে শ্যামাকিঙ্করবাবুর বাড়ী। ওদের বৈঠকখানার কাছারিটিকে উনি নিজের মত অদলবদল করে নিয়েছেন। যখন আসেন ওইখানেই থাকেন। ওখান থেকে হাসির শব্দ আসছে। আনন্দ হচ্ছে। কথার মধ্যে আনন্দের স্রোত। একখানা মোটর এসে দাঁড়াল। জিপ। কোন অফিসার এসেছেন,—শুনেছেন শ্যামাকিঙ্করবাবু আছেন এখানে—দেখা করতে এসেছেন। হয়ত স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের কেউ হবে। আজ এখানে প্রথম ইলেকট্রিক আলো জ্বলবে।

নম্বুবালা তার ভাদু গেয়ে গেয়ে বেড়াচ্ছে। ইলেকট্রিকের ভাদু।

চল ভাদু যাই চন্দনপুরের
অবাক কাণ্ড দেখে আসি।

সে গান সকালেই সীমার কানে গেছে। এই মেয়েদের হস্টেলেই সে গেয়ে গেছে। কিন্তু সীমা বের হয় নি। ইচ্ছা হয় নি, পারে নি। মধ্যে মধ্যে কান্না পাচ্ছে। তার পরীক্ষার খবর বের হবার সময় হয়েছে। সেই নিয়েই ছিল তার উদ্বেগ। কিন্তু সে উদ্বেগও তার আজ নেই। তার বাবা—হতভাগ্য বাবা—। ওঃ, কারুর চেয়ে খাটো নয় মানুষটা, অথচ কি পরিণতি হয়ে গেল তার! এমন শোচনীয় পরিণতি আর সে দেখে নি!

হঠাৎ মনে হল সতীশ ঘোষালের কথা। ওই আর একটি। অবশ্য তার বাপের মত দুর্ভাগ্য তার নয়। সংসারে মা আছে স্ত্রী আছে তার গুণমুগ্ধ। আর সে তার বাপের মত পতিত নয়। হীন সে নয়। তবে ওই প্রতিষ্ঠার উদগ্র কামনায় এ লোকটি ব্যর্থ হয়ে গেল। পরশু সে অবাক হয়ে দেখেছে তার কাণ্ড। শ্যামাকিঙ্করের নিন্দা করছিল, শ্যামাকিঙ্কর নাকি পথ বন্ধ করেছে। মিথ্যা কথা সে নিজে জানে। মেয়েদের স্নানের ঘাটের উপর দিয়ে সাইকেল চড়ে যেতে তিনি বারণ করে বলেছেন—মেয়েদের স্নানের ঘাট মেয়েদের পথ। এ পথে পুরুষের যাওয়া ঠিক নয়। চন্দনপুর এখনও পল্লীগ্রাম এখনও মেয়েরা ঘাটে স্নান করে!

বিচিত্র লোক। লোক বিচিত্র নয়। বিচিত্র মানুষের ব্যর্থ প্রতিষ্ঠা-লিপ্সা এমনি উদ্ধত অহঙ্কারী করে তোলে। তার জন্য কষ্ট পায়—নিন্দিত হয় তবু উদগ্র প্রতিষ্ঠা-কামনায় চীৎকার করে তারস্বরে। আর একদিনের কথা মনে পড়ছে।

ঘোষাল বসেছিল রাস্তার ধারে—একা। কথা বলবার লোক মেলে না। খানিকটা দূরে—ক'টি ছেলে গল্প করছিল। একটি ছেলে বলছিল—গতরাত্রে সে সাপের উপর পা দিয়েছিল। পুণ্যের জোর ছিল তাই বেঁচে গেছে।

ঘোষাল তৎক্ষণাৎ ডেকে বলল—মূর্খ কোথাকার। তুমি বলতে চাও—পাপীকেই সাপে কামড়াক?

ছেলেরা সন্তুষ্ট নয় ঘোষালের উপর। তার কথা শুনে ছেলেরা বলেছিল—তবে কি—পুণ্যাত্মা হলেই সাপে কামড়ায়?

ঘোষাল বলেছিল—মহাভারত পড়েছ? অকালপক্ক—মূর্খের দল!

—কি আছে মহাভারতে? তাই লেখা আছে বুঝি?

—নিশ্চয়! সত্যবান—অর্থাৎ—সত্য ছাড়া যে মিথ্যা বলে না—পরম পুণ্যাত্মা—তার কিসে মৃত্যু হয়েছিল? জান?

—কিসে?

—সর্পাঘাতে।

অন্য একটি ছেলে তৎক্ষণাৎ বলেছিল—না।

—হ্যাঁ।

—না।

—তুমি মূর্খ। তুমি মূর্খ। তুমি মূর্খ।

—না—না—না। দাঁড়ান, আনছি মহাভারত। সে কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত এনে খুলে ধরেছিল—পড়ুন।

—পড়। তুমি পড়। আমার চশমা নাই। আমার পড়া আছে

—না—নেই। শুনুন আমি পড়ি—"বীর্যবান সত্যবান কাষ্ঠছেদন করিতে করিতে সাতিশয় ব্যায়াম হওয়াতে তাহার গাত্র হইতে স্বেদ বিনির্গত হইতে লাগিল ও মস্তকে বেদনা জন্মিল। তখন তিনি প্রাণ-প্রিয়া প্রণয়িনীর সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন—সাবিত্রী প্রভূত পরিশ্রম হওয়াতে আমার শিরঃপীড়া হইয়াছে। ফলতঃ আমি নিতান্ত অসুস্থ হইয়াছি। আর মস্তকে যেন শূল বিদ্ধ হইতেছে।" শুনলেন? সাপ ত্রিসীমানায় নেই। মূর্খ আমরা নই। মূর্খ—

আমি? না? মুর্খ আমি? হে ভগবান!

থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছিলেন ভদ্রলোক। প্রতিবেশী সুরেশ্বর এসে ছেলেদের নিরস্ত করে তাকে ঘরে—

—টেলিগ্রাম!

টেলিগ্রাম! কোন দিদিমণির না কোন ছাত্রীর! কার কি হল।

সীমার চিন্তায় ছেদ পড়ল। সে বেরিয়ে এল। হ্যাঁ। পিওন দাঁড়িয়ে।

—আপনার টেলিগ্রাম।

—আমার?

—সীমা দেবী।

—হ্যাঁ। আমি। কই? দাও।

—সই করুন। ভাল খবর। বকশিস নেব। পাশের খবর।

—পাশের খবর?

সে পাশ করেছে! কোন রকমে সই করে দিয়ে টেলিগ্রাম খুললে—

Passed second division—congratulation. all school candidates passed except roll 26. 29. 30. Subhendu!

উল্লাসে অধীর হয়ে উঠল। সব সে ভুলে গেল। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মেঘ ছিঁড়ে যেন সূর্য উঠল।

কাকে বলবে? কাকে? স্কুলের সময় মেয়েরা দিদিমণিরা সব স্কুলে। কোন একটি মেয়ে মাথা ধরেও হোস্টেলে নেই—কাকে বলবে? সামনে ছিল রতন ঠাকুর। তাকেই সে বললে—রতন আমি পাশ করেছি। তারপর ছুটে গেল ভবানীবাবুর বাড়ী। ভবানীবাবুর মাকে বলে ঠাকুমা। এ পাড়ায় ঠাকুমা তিনি—তার পায়ে ঢিপ করে প্রণাম করে বললে—ঠাকুমা আমি পাশ করেছি। জোরে চিৎকার করে বললে। কারণ ঠাকুমা কালা।

—পাশ করেছ? বৃদ্ধার চিবুকটি স্নেহের আবেগে কাঁপতে লাগল। খুব ভালো, আরও পড়। আরও।

—কাকীমা আমি পাশ করেছি। ভবানীবাবুর স্ত্রীকে প্রণাম করলে। তারপর ছুটল ইস্কুলে।—দিদিমণি আমি পাশ করেছি—সেকেণ্ড ডিভিশন।

মিস্ট্রেসরা বেরিয়ে এলেন। সে সকলকে প্রণাম করলে।—আমি পাশ করেছি। স্কুলের তিনটি পাশ তিনটি ফেল।

—কোথায় খবর পেলে?

—টেলিগ্রাম। এই দেখুন!

হেডমিস্ট্রেস টেলিগ্রাম পড়লেন—বললেন—শুভেন্দু! মানে নেলির দাদা!

কমলাদিদি হেসে বললে—কচ? দেবযানী পাশ করেছে?

এতক্ষণে খেয়াল হল সীমার। শুভেন্দু টেলিগ্রাম করেছে। তার মুখখানা লাল হয়ে উঠল। কানের পাশ দুটো গরম হয়ে উঠল মুহূর্তে। ভুরু দুটি কুঁচকে উঠল।—কেন? শুভেন্দুর এ হিতৈষীপনার কি দরকার ছিল। ভারী অন্যায়।

দিদিমণি বললেন—যাও প্রণাম কর সকলকে।

—করেছি দিদিমণি। ঠাকুমাকে, কাকীমাকে পাড়ার যাকে দেখেছি সকলকে প্রণাম করেছি।

—করেছ! বেশ! শ্যামাকিঙ্করবাবুকে করেছ? তিনি এখানেই আছেন।

—যাই নি, যাব?

—যাও!

—আর—। একবার বাড়ী গিয়ে তোমার বাবাকে প্রণাম করে আসবে না? তাঁর তো অসুখ। তা ছাড়া—। চুপ করে গেলেন দিদিমণি। সেও তাঁর কথার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল।

দিদিমণি বললেন—যাওয়া উচিত। তুমি—ওঁকে শ্যামাকিঙ্কর-বাবুকে একবার জিজ্ঞাসা করে নিয়ো।

সে হাঁপাচ্ছিল, ছুটেই এসেছে স্কুল থেকে। এসে ঠুক্ করে প্রণাম করে হাসিমুখে উঠে দাঁড়াল। শ্যামাকিঙ্কর তাঁর বসবার প্রিয়স্থান নিমগাছতলার বেদীটির উপরে বসে কাঠের পুতুলে রং দিচ্ছিলেন। তিনি তাকে দেখে হেসে বললেন—

ধন্যা কন্যা সীমা অনন্যা?
দুখবিজয়িনী চিরপ্রসন্না?

দুর্বার যার জীবনবন্যা ?

কি সংবাদ গো। হঠাৎ নমো কেন ? এ্যাঁ ?

ওই ছড়া বলেই তিনি বরাবর তাকে অভিনন্দিত করেন। তার মাথায় হাত দিয়ে বলেন—এমন মেয়ে হয় না।

হেসে সীমা বললে—আমি পাশ করেছি। সেকেণ্ড ডিভিশনে।

—অভিনন্দন—কনগ্র্যাচুলেশন্। বসো, মিষ্টি খাও। রাম, মিষ্টি আন—চা আন। সীমা ইস্কুলের সীমা পার হল—পুকুর থেকে নদীতে পড়ল। আন মিষ্টি আন।

লজ্জায় আনন্দে তার জীবন যেন বিগলিত হচ্ছিল। সার্থকতা যখন শ্যামাকিঙ্করবাবুদের মত বড় মানুষের অভিনন্দনে ধন্য হয়—তখন জীবন যেন হয় বিগলিতশিলা। হিমালয়ের পাথর গলে গঙ্গা নির্গমনের মত চোখের গোমুখী থেকে গঙ্গা যমুনা পাশাপাশি নেমে এল সীমার মুখ বেয়ে বুকের উপর।

শ্যামাকিঙ্করবাবু—বললেন চন্দনপুরের জয়যাত্রার পথে আজই ইলেট্রিক জ্বলবে ; তুমি পেলে পাশ করার খবর। এ একটা রেকর্ড। এখানকার নারী জীবনের ইতিহাসে—তুমি তেনজিং নোরকে। তেনজিং যেমন এক অখ্যাত নেপালী পল্লীর অধিবাসী এভারেস্ট জয় করলে—সঙ্গে সঙ্গে দার্জিলিং বললে তেনজিং আমার। তেমনি চন্দনপুরও আজ নবীনপুরের কন্যাটিকে আত্মসাৎ করলে—বলবে নবীনপুর আমারই অংশ—ও আমার কন্যা—ধন্যা ধন্যা—সে যে অনন্যা !

সে মুগ্ধ হয়ে শুনছিল ! শ্যামাকিঙ্করবাবুর পরিচারক একখানি প্লেটে মিষ্টি এবং কাচের গ্লাসে জল এনে নামিয়ে দিল। শ্যামাকিঙ্করবাবু বললেন—খাও।

—না। এখন খেতে পারব না। আমি প্রণাম করে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলাম।

—না খাও ! পাশে পেট ভরে না। পেট ভরবার ওটা একটা ভাঁড়ারের চাবী মাত্র। নাও খাও।

সে খেতে বসল। শ্যামাকিঙ্করবাবু বললেন—তোমার প্রশ্ন আমি সম্ভবত অনুমান করতে পারি।—যাবে, নিশ্চয় যাবে বাবাকে প্রণাম করতে, দেখতে।

থেমে থেমে তিনি বলেই গেলেন—, শুনতে শুনতে তার খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল—। শ্যামাকিঙ্করবাবু বললেন—তোমার বাবার কাছে তোমার অনেক ঋণ। সাধারণ সন্তানের পিতৃঋণ থেকে বেশী। এই দুর্ধর্ষতা তার থেকে পেয়েছ তুমি। অমর দুর্ধর্ষ চিরকালের।

আবার বললেন—কাল এমন অকস্মাৎ ঘটে গেল ঘটনাটা যে—কেউ আমরা এগিয়ে যাবার সময় পেলাম না। মদটা বেশী খেয়েছিল কাল। আমাকে দাদা বলে—ভক্তি করে—কাল নেশায় তাও যেন—। চুপ করে গেলেন।

আবার বললেন—আমি নিজে অপরাধ বোধ করি অমরের এই পরিণতির জন্য। তোমরা জান না। উনিশ শো সাঁইত্রিশ সাল—তখন রাজনীতি ছেড়েছি, সাহিত্যক্ষেত্রে কিছু প্রতিষ্ঠা পেয়েছি। এ অঞ্চলে অমর তখন কর্মী। জেলা কংগ্রেস ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ইলেকশনে নেমেছে। অমর চাইলো প্রতিনিধিত্ব, আর চাইলেন—রামসুন্দরবাবু। হ্যাঁ এই রামসুন্দরবাবু। কংগ্রেস কর্মী অমরকে দিল নমিনেশন। রামসুন্দরবাবু আমাকে অনুরোধ করলেন। এই এবারেরই মত।—থেমে গেলেন।

হেসে আবার বললেন—জান, ভুল সংসারে সবাই করে, মানুষকে মানুষ ওই যুক্তিতে ক্ষমাও করে। কিন্তু যে ভুল করে সে নিজেকে ক্ষমা করতে পারে না। কারণ ওর মাশুল না দিয়ে তার নিজের নিস্তার নেই। বছর কয়েক আগে—রামসুন্দরবাবুকে বিলেতফেরতের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়া নিয়ে পতিত করতে চেয়েছিলেন গ্রামের প্রধানেরা—

এবার সীমা বললে—জানি। আপনি ওঁর পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন

—না। আমি দাঁড়িয়েছিলাম—একটি নীতির জন্যে। এবং বিপক্ষে বলতে গেলে কোন বা কয়েকটি ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়—দাঁড়িয়েছিলাম সমাজের সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে। জিতলাম। কিন্তু তারপরই করলাম

ভুল। তখন কলকাতায় যাই—দু চারদিন সাতদিন বড়জোর দশদিন থাকি চলে আসি। রামসুন্দরবাবু সমাদর করে আহ্বান করলেন—এস আমার এখানে ভাইয়ের মত থাকবে। আমি গ্রহণ করলাম নিমন্ত্রণ। বছর দেড়েক এই ভাবে—কখনও তিনদিন—কখনও সাতদিন কখনও দশদিন থেকেছি। তারপর বুঝলাম—না—এটা আমার ভুল হচ্ছে। ভুল হয়ে গেছে। গোটাটাই দাঁড়িয়ে গেছে উল্টো। মনে হল আমি যা সমাজের জন্য করেছিলাম, সেটা রামসুন্দরের জন্যে করা হয়ে গেছে এবং তার ঋণ শোধ হয়ে আমি ঋণী দাঁড়িয়ে গেছি। তাই সেদিন যখন রামসুন্দরবাবু অনুরোধ করলেন—এ নমিনেশন আমাকে করে দিতেই হবে; তখন আমি কর্তাদের বললাম। কর্তা সুরেন আমার বন্ধু। কিন্তু তিনি নিরুপায়, তিনি বললেন—আমার হাতে আর নেই। আপনি অমরকে ধরুন। সে আপনার কথা নিশ্চয় শুনবে। আমি একবার ভুল করেছিলাম—আবার ভুল করলাম। চন্দনপুর এসে অমরকে ডেকে বললাম—তুমি এবারের মত ওঁকে আমার অনুরোধে ছেড়ে দাও সিট; অমর আমার অনুরোধে ছেড়ে দিয়েছিল। বিনিময়ে দেড়শো কি দুশো টাকা রামসুন্দর দিয়েছিলেন—তোমাদের গ্রামের স্কুলের জন্য—দিয়েছিলেন অমরেরই হাতে। অমর তখনকার মত খুশী মনে গেল। কিন্তু তার ভিতরের প্রতিষ্ঠা কামনার উত্তাপ আগুন হয়ে জ্বলে উঠল। ভুল সেও করেছিল আমার অনুরোধ রেখে। সেই আগুন তাকে পুড়িয়ে দিল। সেদিন যদি সে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বার হয়ে প্রতিষ্ঠার সিঁড়ির প্রথম ধাপে স্থান পেত, তবে সে উঁচুর দিকেই উঠত, নীচে নামত না। তার জন্যে দায়ী আমি খানিকটা এ তো ভুলতে পারি না।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন শ্যামাকিঙ্করবাবু। সীমার চোখ থেকে দুটি অশ্রুর ধারা নেমে এল। আর সে খেতে পারলে না খাবারের থালাটি রেখে দিলে। শ্যামাকিঙ্করবাবু দেখলেন—বললেন—জল খাও।

আবার বললেন—যাও। তুমি সেদিন রাত্রে চলে এসেছিলে—ভুল তোমার হয় নি। বিয়ে করলেই ভুল করতে। শেষ মুহূর্তেও সে ভুল তুমি সংশোধন করেছ—তাই তুমি অনন্যা। কিন্তু আজ তুমি যদি না-যাও বাবাকে প্রণাম করতে—তবে ভুল করবে। এবং চিরজীবন অন্তত মনে মনেও আমার মত মাশুল দেবে। তবে—।

হেসে বললেন—বাবা অসুস্থ। মনে রেখো। আবেগের বশে একটা এমন কিছু করো না যাতে অমরও আবেগের বশে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। বোধহয়—। গোড়াতেই অমরের কাছে যাওয়া ঠিক হবে না। বাইরে খবর নিয়ো তোমার—সেই—

—তিনি সত্যিই আমার মা। বাবা তাকে বিধবা বিবাহ করেছেন। বিয়ে ঠাকুমা দিয়ে গেছেন। শুধু চণ্ডীতলার সেবাইতগিরি যাবে বলে গোপন রেখেছেন কথাটা।

নীরবে শ্যামাকিঙ্কর কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে—তারপর বললেন—তোমার মাকে আমার আশীর্বাদ দিয়ো, নমস্কার দিয়ো। যাও।

॥ ২২ ॥

ভাগ্যক্রমে সেদিন চণ্ডীতলার ডাক্তার ছিল। তারা অমর চক্রবর্তীকে দেখেছিল এবং বাঁচিয়ে ছিল। ঐ মিটিঙে উপস্থিত ছিল আশু সিংহী আর যোগপুর থেকে এসেছিল—ধ্রুব ডাক্তার।

অসুস্থ অমরকে দেখে ধ্রুব ডাক্তার বলেছিল—শক্ত মানুষ লড়ুয়ে মরদ, বেঁচে গিয়েছে। ক্ষতি হয়েছে, তবু দাঁড়াবে। স্ট্রং ম্যান—ফাইটিং সোলজার। কেবল ভাগ্যদোষে হয়ে গেল এমনটা!

বাড়ীতে আনার পরও রমেন্দ্র ধ্রুব ডাক্তারকে 'কল্' দিয়েছিল। ক্ষমা এসে সেবা করছিল। বলতে গেলে সমস্ত ভার রমেন্দ্র নিয়েছে।

রমেন্দ্র ধ্রুবকে বলছিল—খাড়া করে দেন একবার। আমি নিয়ে

যাব—বনচাতরাতে থাকবেন। আলাদা বাড়ীতে থাকবেন। বলতে গেলে আমিই তো ছেলে। আর তো কেউ খোঁজও করে না। আর এক মেয়ে তো—

সীমা এই সময়ে এসে দাঁড়াল। আশু বললে—সীমা!

ধ্রুব ডাক্তার বললে—তুমি সীমা! আচ্ছা! তোমার বাবা ভাল আছে।

রমেন্দ্র চুপ করে রইল। ধ্রুবই বললে—কি হে রমেন্দ্র! কথা বল! তোমার শ্যালিকা!

রমেন্দ্র বললে—আসুন।

সীমা বলে ফেললে—আমি পাশ করেছি সেকেণ্ড ডিভিশনে।

ধ্রুব বললে—গুড নিউজ। ভেরী গুড নিউজ। দাঁড়াও। আমি গিয়ে চক্রবর্তীকে তৈরী করে দিই। তারপর তুমি আসবে। ঠিক হয়ে যাবে। হি ইজ এ ভেরী স্ট্রং ম্যান। মদ ছাড়লে এখনও বিশ বছর বাঁচবে। আমি গ্যারান্টি দিতে পারি।

সত্যই শক্ত মানুষ—অসাধারণ প্রাণশক্তি এই অমিতাচারী উচ্ছৃঙ্খল—ব্যর্থতার তাড়নায় অধীর এই হতভাগ্য মানুষটির। সে কাঁদল সংবাদটা শুনে। ধ্রুব ডাক্তার বললে—তাকে ডেকে পাঠাব? দেখতে ইচ্ছে তো হয়!

—হয়। কিন্তু—।

—কি?

—সে আসবে?

—নিশ্চয় আসবে। আসবে না? সে কন্যা তো তোমার গুণবতী কন্যা।

—নিশ্চয়! জান ডাক্তার, ও বি-এ পাশ করুক, আমি ভাল হয়ে উঠি। উঠব, সেরে উঠব আমি। আমি ওকে এখানে অ্যাসেম্বলীর জন্যে দাঁড় করাব। দেখবে ঠিক রিটার্ন হয়ে যাবে।

ধ্রুব হেসে বললে—সে হবে। ওসব চিন্তা এখন ছাড়। এখন ডেকে পাঠাই ?

—দাঁড়াও। রমেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করি ! তার অমতে কিছু করতে পারব না আমি।

—রমেন্দ্র আপত্তি করবে না আমি বলছি।

—না। তাকে ডাক।

রমেন্দ্র এসে হেসে বললে—দেখুন দিকি। আমি আপত্তি করব ? কেন ? উনি আপনার যেমন—তেমনি আমাদেরও গৌরবের জিনিস। উনি তো এসেছেন। এতক্ষণ তো কথা বলছিলাম। ডাকি আমি, ডাকি।

ধ্রুব বললে—খবরদার, নো ইমোশনাল আউটবার্স্ট।

সীমা এসে ঘরে ঢুকল।

ধ্রুব বললে—নো ইমোশান সীমা। মনে কর এক্ষুনি তোমাকে টি-এ-বি-সি-ইনজেক্‌শন দেওয়া হবে—খুব আস্তে। হ্যাঁ, আস্তে আস্তে ছোট্ট একটি প্রণাম। এবং একটি কথা—আমি পাশ করেছি বাবা ! আর একটা কথা বলতে পার—আমাকে ক্ষমা কর বাবা ! ব্যস ! চক্রবর্তী—তোমার ওয়ান ওয়ার্ড,ওনলি ওয়ান ওয়ার্ড।—বসো। ব্যস। কই চক্রবর্তী-গিন্নী—সীমাকে জল খেতে দাও। ব্যস চলি এখন।

ডাক্তার চলে গেল। ক্ষমা, মনোরমা ঘরে এসে ঢুকল। ক্ষমা সীমাকে প্রণাম করলে। বললে—তুই পাশ করেছিস ? ধন্য তুই।

রমেন্দ্র বললে—আমিও তাহলে একটা প্রণাম করি ! বড় শালী ! সম্পর্কে বড় !—

না। লাফ দিয়ে উঠল সীমা—না ! বাবাঃ !

সকলে হেসে উঠল। আশ্চর্য একটি প্রসন্নতা সেদিন—অমর চক্রবর্তীর লক্ষ্মীশ্রীবর্জিত রুক্ষকেশা-ছিন্নবাসা ভিক্ষুণীর মত ঘরখানিতে ফুটে উঠল। যেন ভিক্ষুণীর ভিক্ষার ঝুলি কোন্ লক্ষ্মীর প্রসাদে পরিপূর্ণ হয়ে উছলে পড়ছে।

কিছুক্ষণ পর—সীমা বললে—আমি যাই এখন।

—না। আজকের দিনটা থাক। আনন্দ করি। বস্, আমার শিয়রে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দে, আমি ঘুমুই।

পরিবর্তনশীল জগতের কোন গভীরে একটি স্থির চিরকালের পৃথিবী আছে। পরিবর্তনের সকল আবেষ্টনী ভেদ করে বেরিয়ে আসে। সেইটিই বোধ হয় মানুষের অনন্তকালের সংসার। বিরোধ মতভেদ রুচিভেদ সব দূর হয়ে গিয়ে শুধু হৃদয়ের আনন্দই সেখানে আছে!

* * * *

তবে সে বড় স্বল্পক্ষণ স্থায়ী।

ওই আনন্দ আলোকের ছায়ার মধ্যে—তার বিপরীত ধর্ম জাগে। কালো অন্ধকার।—নিঃশব্দতার মধ্যে বিকট চীৎকার করে এই কালো অন্ধকার জেগে ওঠে। দিনের আলোকে মুছে দেয়।

তখন মধ্য রাত্রি! এমনি চীৎকার উঠল চক্রবর্তী বাড়ীতে। একটা বিপুল ভারী কিছু যেন ভেঙে পড়ল। চক্রবর্তী বাড়ীর ভাঙা দরজাটা সশব্দে খুলে গেল। ছুটে বেরিয়ে গেল সীমা। সে অন্ধকারের মধ্যে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ুচ্ছে। চোখের দৃষ্টি নিষ্পলক।—অন্ধকার ভেদ করে সে খুঁজছে পথ। প্রায় এক বছর আগে সে যেমন একদিন পালিয়ে এসেছিল—নবীনপুর থেকে চন্দনপুরে।

চন্দনপুরে ঢুকেই সে আলো পেলে।

আজ এখানে ইলেকট্রিক আলো জ্বলেছে।

আলোতে এসে দাঁড়াল। তার কাপড়ে রক্ত। অনেক রক্ত। বেশভূষা বিপর্যস্ত। হাঁপাচ্ছে সে। মধ্যরাত্রির আলোগুলি স্থির হয়ে জ্বলছে। শুধু একটি বাড়ীর উঠোনে গান হচ্ছে এখনও। ফটিক দাসের বাড়ী রাস্তার ধারে। ওইখানেই একটা লাইটপোস্ট। তারই আলোয় ফটিক এবং নস্থ আজ সারা রাতের পালা জুড়েছে। চাঁদের আলোয় জেগে থাকা গান গাওয়া পাখীর মত তাদের চোখে

ঘুম নেই। তারা আজ শিবনাথ দে'কে বলে তার হুকুম পেয়েছে। —দে হেসে বলছে—তা যখন তোমাদের ইচ্ছে, আর আলোতে ঘুমই আসবে না—তখন গেয়ো গান। আমি না হয় জানলা বন্ধ করে পাখা খুলে শোব!

তারা গান গাইছে—

ইলেকট্রিরির আলো এলো ; ও ভাদু তুই
কেমন করে কদম তলায় যাবি।
নিশে চোর মরে বেঁচেছে—
আলো করা রাতের বেলা আঁধার
কোথা পাবি ?
মন রসনা কেমন করে কদমতলা যাবি!

সীমা এসে থমকে দাঁড়াল।—ভাতুর মা!

—কে? হেই মা! সীমে? টলছ! ধর-ধর আমাকে ধর, একি; সর্বাঙ্গে রক্ত! হেই মা।

—আমাকে থানায় নিয়ে চল ভাতুর মা!

—থানায় ?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ থানায়। থানায়।

॥ ২৩ ॥

—বেয়াই!

—বেয়ান!

—ই কি হল ?

—কি হবে ? যা হয়েছে—তাই হল। বিধেতার খেলা বল—তাই—

—না। এমন খেলা সে কেনে খেলবে ? তা হলে তো কানার খেলা!

—তা হবে বেয়ান।

—না তা হলে সি মরুক। কানার আবার খেলার সাধ কেন? আমরা তা মানব কেনে?

আজ আর নস্নুবালার খেয়াল নেই সে 'ক্যানো'কে 'কেনে' বলছে।

ফটিক দাস হেসে বললে—তা সি মরেছেও হতে পারে। চণ্ডীতলার বাগে তাকিয়ে দেখ!

—তা বটে। ভোগ হয় না সময়ে। সাঁজ পড়ে না সময়ে। মাটির ঢিপ—ঢিবি হয়ে পড়ে আছে—নড়ে না—চড়ে না। আগে কালে শিবাভোগ না হলে চন্দনপুরে সব গেরস্তের উপোস হত। কান্না পড়ে যেত। আজ কেউ খোঁজও করে না। তা যাক ভাই—কিন্তু এ হ'ল কি!

—দেখ—এঁকে রেখেছি পটে। এই দেখ, রমেন্দ্র সি একটা পাষণ্ড পিশাচ তার ওপরে বড়লোক মহাজনের বেটা—তার যত লালস তত আক্রোশ। দেখ তুমি, মুখটা দেখ! সীমেকে এতদিন বাদে দেখে অবধি তার বুকে ওই দুটো জোড়া সাপের মত ফোঁসাচ্ছিল। বেরিয়ে আসতে পথ খুঁজছিল। রাত্রে সীমা থাকল—আঁধারে সাপ দুটো উঁকি মারলে। বললে—আচ্ছা সুযোগ। এই লাও অপমানের শোধ। আর ক্ষমাটা শুধু একটা মাংস পিণ্ডি। ওতে কি কোন সুখ আছে? সীমের মত মেয়ে নইলে সুখ। সীমে রাজী হবে না? তা কি সহজে হয়! তবে টাকা-গয়না এত কি সহজ? আগে কাবু কর। তারপর মুখ বন্ধ টাকাতে গয়নাতে হবে। এই দেখ মদ খাচ্ছে ঘরে বসে। ক্ষমাই দিচ্ছে। ও তো দিত। ওটা তো মাংসপিণ্ড। জানত শুধু গয়না পরতে সাজতে আর খেতে। রমেন্দ্র বলেছিল—বন্ধ করে, দরজা বন্ধ করে। সীমা যেন বুঝতে না পারে। হাজার হলো পাশ করা মেয়ে—তার ওপর সম্বন্ধে বড়।

—ওঃ কুপাক! হায় দুর্বুদ্ধি! ই শুনি নাই কোন কালে। ই কি কাল! ই কি কাল? কলিকাল!

—তা বলো না। ই সব কালেই আছে। রামায়ণে সীতাহরণ মহাভারতে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ। সতী যারা তারা সীতার মতন নড়াই করে। দেবতাকে মানুষকে চীৎকার করে ডেকে বলে—আমার অপমান করছে সাক্ষী থাক। তবে জলে পাথর ভাসে—রাবণ বধ হয়। সীতা অগ্নিপরীক্ষে দিয়ে বেরিয়ে আসে। মহাভারতে কুরুক্ষেত্র হয়, দুর্যোধনের একশো ভাই মরে। যারা চেঁচায় না—ভয়ে হোক লজ্জায় হোক—তাদের কথা কেউ জানতে পারে না, ঢাকা থাকে। বিচার হয় পরকালে—ধর্মরাজের আদালতে। মেয়ের সাজা হয় গোপন করেছে বলে—এমন পুরুষের সাজা হয় অত্যাচার করেছে বলে। তা সি সব তো উপকথা। মিছে কথা। ভুয়ো কথা! এই চন্দনপুরে এমন পাপ কত হয়েছে। জান তো তুমি। তুমি বলে চন্দনপুরে শুকসারীর সারী—তুমি জানো না। এ কন্যে আচ্ছা কন্যে—ওই যে শ্যামাকিঙ্কর বলে—ধন্যা কন্যা অনন্যা তাই।

এ কথা হচ্ছিল ছ মাস পর। হচ্ছিল—নস্তুবালা আর ফটিক দাসের মধ্যে। নস্তু বললে—উ কথা রাখ ভাই। এখন ক্ষমার সিঁথির সিঁদুরটা থাকলে হয়।—আঃ কচি মেয়ে হে! কাল জজ যে কি রায় দেবে—ভগবান জানেন।

* * * *

আদালতের বিচারে রায়েও তাই বললেন জজ সাহেব। "এই মামলার প্রধান সাক্ষী শ্রীমতী সীমা চক্রবর্তী একটি আশ্চর্য মেয়ে। এমন মেয়ে সমাজের গৌরব। অসাধারণ সাহসের অধিকারিণী, দৃঢ় চিত্ত, সত্যবাদিনী। তাহার প্রতিটি বাক্য আমি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। জুরীরাও করিয়াছেন। রাত্রির অন্ধকারে পিতৃগৃহে আত্মীয়-পরমাত্মীয়দের মধ্যে নিদ্রামগ্ন কুমারী কন্যা নিশ্চিন্ত নিদ্রায় মগ্ন ছিল। দীর্ঘকাল পর পিতার সঙ্গে মাতার সঙ্গে ভগ্নীর সঙ্গে এবং এই আসামী রমেন্দ্রর সঙ্গে বিবাদ মিটিয়া মিলন হইয়াছে। কোন দুশ্চিন্তা ছিল না। সুন্দর স্বপ্ন দেখিবারই পরিবেশ। অসুস্থ

পিতা কিছু সুস্থ হইয়াছেন। নীচের ঘরে মা-বাপ। উপরে দুখানি পাপাপাশি ঘর। একখানি ঘরে এই সীমা একা অন্য ঘরে তাহার ভগ্নী ও ভগ্নীপতি এই আসামী রমেন্দ্র। আসামী পঁয়তাল্লিশ বৎসরের প্রৌঢ়। একখানি ক্ষুদ্র পল্লীর মধ্যে কূটবুদ্ধি এবং সম্পদের শক্তিতে অজগরের মত প্রকৃতি নিয়া রাজত্ব করিয়া আসিয়াছে। অতীতকালের সমাজ এবং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের কুৎসিৎতম জীব। এ কালেও এরা কূটবুদ্ধিতে নিজেদের বাইরের রঙ পরিবর্তন করিয়া অতীত প্রকৃতি লইয়া সুযোগ মত জঘন্যতম অপরাধ করিয়া যায়। আসামী সীমাকেই বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল, সীমা অসহায়ভাবে প্রথম সম্মতি দিয়াও বিবাহের দিন পলাইয়া গিয়া থানায় আশ্রয় লয়—পরে আশ্রয় পায় গার্লস স্কুলে। রমেন্দ্র মৃত অমর চক্রবর্তীর কনিষ্ঠা কন্যা ক্ষমাকে বিবাহ করে। উভয়েই বিচিত্র জীব। মৃত পিতা অমর চক্রবর্তী—একজন ভ্রষ্ট রাজনৈতিক কর্মী—একজন ভ্রষ্ট মানুষ। কিছু কিছু সদ্গুণের অধিকারী হইয়াও ভ্রষ্ট মানুষ। অভাবী—মদ্যপ। ক্ষমা অতি সাধারণ একটি মেয়ে। তাহার নিকট সত্যের অপেক্ষা স্বার্থ বড়। স্বামীর প্রতি তাহার আনুগত্য—অন্ধ, হয়তো জৈব। মিথ্যা বলিতে দ্বিধা নাই। পুণ্যের ধর্মের চেয়ে সম্পদ বড়। সে লোভী। এই রমেন্দ্রের সঙ্গে বিবাহে সে খুশী হইয়াছিল ; স্বামীর ব্যভিচার দোষ তাহাদের ঐ দূর পল্লীর অন্ধকারে অবাধে চলিত ব্রাত্য নারীদের সঙ্গে—তাহা জানিয়াও তাহার আনুগত্য ক্ষুণ্ণ হয় নাই। অসুখী হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। সম্ভবত তাহার পিতার দৃষ্টান্ত দেখিয়া সে এই দেখার অভ্যাসে ইহাতে দোষ দেখে নাই। ঘটনার দিন কিন্তু স্বামীর মন্দ অভিপ্রায় বুঝিতে না পারার জন্য দায়ী নয়। কারণ আসামী তাহাকে ঘুমন্ত অবস্থায় শিকল বদ্ধ করিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিল। আসামী রমেন্দ্রকে সে প্রথম রাত্রে অভ্যাসমত মদ্য পানের আয়োজন করিয়া দিয়াছিল। রমেন্দ্র আকস্মিকভাবে এই মন্দ প্রবৃত্তিতে উন্মত্ত হইয়া এই কাজ

করিতে উদ্যত হয় অথবা গোড়া হইতেই মতলব করিয়াছে—ইহা সঠিক করিয়া বলা যায় না। তবে একটি আক্রোশ বা প্রতিশোধস্পৃহা সহজেই আবিষ্কার করা যায়। যাহা হউক ঘটনা এই: মধ্যরাত্রে ঘুমন্ত সীমা অনুভব করে তাহার উপর যেন কেহ বা কিছু চাপিয়া বসিয়াছে এবং তাহাকে নগ্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে। সে চীৎকার করিয়া উঠিতেই মুখ চাপিয়া ধরিয়া আসামী বলে—চুপ! আমি। চীৎকার করিলে—যে কলঙ্ক তোমার হইবে তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না। আমি বলিব—তুমি আমাকে ডাকিয়াছ। তোমাকে অনেক টাকা দিব। চুপ।

সীমা অসাধারণ মেয়ে। সে আসামীকে মুখে কিল মারে। নিজেকে ছাড়াইয়া লইতে চেষ্টা করে—সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিতে থাকে। হঠাৎ তাহার হাতে ঠেকে মাথার বালিশের পাশে একটা পাথর—মশারি খাটাইবার পেরেক পুঁতিয়া ওটাকে শিয়রে রাখিয়াছিল ভুলবশত। সেই ভুলই তাহার পরম মঙ্গলজনক হইয়াছে। ওই পাথর দিয়া সজোরে সে অন্ধকারেই আসামীর মুখে মারে। সেটা লাগে আসামীর নাকে। প্রচুর রক্তপাত হয়। ইতিমধ্যে অসুস্থ হতভাগ্য অমর চক্রবর্তী জাগিয়া উঠিয়া উন্মত্তের মত ছুটিয়া উপরে আসে। তাহার পিছনে আসিয়াছিল তাহার স্ত্রী বা রক্ষিতা মনোরমা। তাহার হাতে আলো ছিল। হতভাগ্য অমর চক্রবর্তী নিজে পাষণ্ড—সে পাষণ্ড জামাতার চরিত্র জানিত। সুতরাং সীমার চীৎকারে ঘুম ভাঙিবামাত্র সে অনুমান করিতে পারিয়াছিল ঘটনাটা। নিহত অমর চক্রবর্তী অসুস্থ ছিল, উত্তেজনা তাহার সহজেই হইবার কথা; সেই ক্ষেত্রে এমনই এক বীভৎস নিষ্ঠুর অপমানজনক অপরাধ—তাহারই কন্যার উপর ঘটিতে দেখিয়া ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের মত ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিল ওই নরপশুর উপর। অমর আক্রমণ করিতেই নরপশু সীমাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হইয়াছিল। এবং অসুস্থ অমর চক্রবর্তীকে আক্রমণ করিয়া ঠেলিয়া সহজেই মাটিতে ফেলিয়া দিয়া লালসা অতৃপ্তির ক্ষোভে

তাহার বুকের উপর বসিয়া পাইয়াছিল সীমার পরিত্যক্ত পাথরটা। তাহা দিয়াই সে তাহাকে আঘাত করে। ইহার ঠিক আগে নেশায় রক্তের চাপে অমর চক্রবর্তীর মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইয়াছিল—ইহা আমরা ডাক্তারদের সাক্ষ্যে পাইয়াছি। সুতরাং এই পাথরের এক আঘাতেই তাহার মৃত্যু হইবার কথা। রমেন্দ্র তাহাকে কয়েকটি আঘাতই করিয়াছিল। ডাক্তারী রিপোর্টে—মাথায় তিনটি—মুখের উপর দুইটি পাথরের আঘাতের কথা পাইয়াছি। সব কয়টিই রমেন্দ্র করিয়াছে নিঃসন্দেহে। এবং তাহাতেই তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে।

সাক্ষীদের মধ্যে মনোরমা বিচিত্র মানুষ। সে প্রথম এজাহারে সীমাকে বাঁচাইয়া—রমেনকে বাঁচাইয়া দোষ নিজের ঘাড়ে লইতে চাহিয়াছে। বলিতে চাহিয়াছে—রমেনের সহিত এই কুৎসিত ঘটনা তাহার ঘটিয়াছিল এবং অমর জানিতে পারিয়া ছুটিয়া আসিলে রমেন ছুটিয়া পলায়—অমর তখন গলা চাপিয়া ধরে। মনোরমারই প্রাণের দায়ে পাথর লইয়া অমরকে আঘাত করে। তাহাতেই ব্যাপারটা ঘটিয়াছে। পরে সে জেরায় সব সত্য স্বীকার করিয়া বলিয়াছে—তাহার জীবনে কি প্রয়োজন; ক্ষমা তাহার অনুগত স্নেহের পাত্রী। রমেন বাঁচিলে ক্ষমার তবুও স্বামী থাকিবে—সে সধবা থাকিবে—এইজন্যই বলিয়াছে।

ক্ষমা শিকলবদ্ধ ছিল। তাহার সাক্ষ্যের কোন মূল্য নাই। তদুপরি স্বামীর মোহে যে কোন মিথ্যা বলিতে পারে এবং বলিয়াছে।

সীমা ছুটিয়া দুই মাইল দূরবর্তী চন্দনপুর আসিয়া নসুবালাকে সঙ্গে লইয়া থানায় আসে এজাহার দেয়। আমি তাহার সাক্ষ্যের প্রতিবর্ণ বিশ্বাস করিয়াছি। রমেন বলিয়াছে—সীমা তাহাকে ডাকিয়াছিল। দরজা খুলিয়া দিয়াছিল। রমেন্দ্রের পক্ষ হইতে এইটির উপর সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দিবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু পুলিশ সকল লোকের সমক্ষে একটি লোহার শিক—যাহা দিয়া বন্ধ দুয়ারের দরজা খুলিয়াছিল—তাহা পাইয়াছে।

সীমা সর্বত্র এক কথা বলিয়াছে। সুতরাং জুরীদের সহিত এক মত হইয়া আসামী রমেন্দ্রকে দোষী স্থির করিয়া—"

রায়ে যাবজ্জীবন কারাবাসের দণ্ড দিলেন জজ বিচারে ছমাস কেটে গেল। এ ছ মাস নিষ্ঠুর যন্ত্রণার মধ্যে কেটেছে সীমার। ইস্কুলে হোস্টেলে থাকা আর সম্ভবপর হয়নি। নিজেই থাকেনি সে। গ্রামে যাওয়াও অসম্ভব হয়েছিল। তাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন সেই হেড-মিস্ট্রেস। বলেছিলেন—কোন মেয়ের এমন বিপদে যদি মেয়েরা আশ্রয় না দেয়—পাশে না দাঁড়ায় তবে মেয়েদের মুক্তি কোথায় গতি কোথায়? এতে যদি ইস্কুলের কর্তৃপক্ষ আমাকে না রাখেন—রাখবেন না। আমাকে শ্যামাকিঙ্করবাবু বলে গেছেন তোমার জন্য খরচ তিনি দেবেন। তুমি যেন না বলো না। এ অনুরোধও করে গেছেন।

রায় হয়ে গেলে সংবাদটা তার কাছে এসে পৌঁছুল পরদিন। সে এতদিনে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেছিল। কেউ তার কাছ দিয়ে যায়নি। সান্ত্বনা দেয়নি। কি বলবে? মেয়েটির বর্তমান শূন্য হয়ে গেছে—নিজে হাতে শূন্য করে ও-ই মুছে দিয়েছে। কোথায় দাঁড়াবে? কি হবে?

হঠাৎ তার মাথায় কে হাত দিলে।

—সীমা!

চমকে উঠল সে। শ্যামাকিঙ্করবাবু।—ওঠ মা। কেঁদো না ওঠো!

আস্তে আস্তে উঠে বসল সীমা। শ্যামাকিঙ্করবাবু বললেন—এখানেই আমি শিবকিঙ্করকে বলেছি। তোমাকে একটা চাকরী দেবে। তুমি মাথা উঁচু করে চাকরী করবে। তুমি সত্যকে কোনদিন অসম্মান করনি—এতটুকু বিকৃত করনি। তুমি সৎ—তুমি সতী। গ্লানিহীন।

আশ্বস্ত হল সে।

দিন চারেক পর সে বসেছিল—শ্যামাকিঙ্করের ওখানে। কথা হচ্ছিল—এইসব কথাই। সে চলে যেতে চায় অন্য কোথাও। শ্যামা-কিঙ্করবাবু বললেন—না—না। এইখানেই তোমাকে থাকতে হবে। পড়াতে পড়াতে পড়। আই এ পাশ কর—বি এ পাশ কর। এখানকার লোক তোমাকে মানুক—। তবে—তবে এখান ছাড়বে।

—সামা রয়েছিস?

—কে?

—আমি নেলি।

—কি?

—শোন্ না।

শ্যামাকিঙ্করবাবু ডাকলেন—তুমি এস না নেলি! কি ভয়? এস।

নেলি এসে দাঁড়াল। শ্যামাকিঙ্কর বললেন—কি সংবাদ? গোপন?

সে হাসলে, উত্তর দিলে না। শ্যামাকিঙ্কর বললেন—তাহলে তুমিই উঠে যাও।

সীমা উঠল। চলে গেল ঘরের দিকে। নেলি সঙ্গে গেল।

কয়েক মুহূর্ত পরে তিনি শুনতে পেলেন—সীমার উত্তেজিত কণ্ঠ —না—না—না!

বেরিয়ে এল সে। শ্যামাকিঙ্করবাবুকে বললে—আপনি বাবার চেয়ে বয়সে বড়। মানে তো বটেই। হয়তো স্নেহেও বড়। আপনার কাছে আমি নালিশ করছি, শুভেন্দুকে আপনি বারণ করুন। বারণ করুন। বুঝিয়ে বলুন। আমি বিয়ে করব না। তাকে ধন্যবাদ। সে আমাকে ত্রাণ করতে এসেছে। এই এত কাণ্ডের পর—। কিন্তু না। না।

বলে দুই হাতে মুখ ঢাকল। নেলি নিঃশব্দে চলে গেল। শ্যামাকিঙ্কর দেখলেন ফটকের পাশ থেকে বেরিয়ে এল শুভেন্দু—

তারপর ভাই-বোনে দুজনে চলে গেল। নেলিকে বলতে হয়নি কিছু শুভেন্দু সবই শুনতে পেয়েছিল।

শ্যামাকিঙ্কর চুপ ক'রে বসে রইলেন—আকাশের দিকে তাকিয়ে।

কিছুক্ষণ পর সীমা উঠে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে—তারপর একটু হেসে বললে—কেন বোঝে না বলুন তো?

শ্যামাকিঙ্কর এরও উত্তর দিলেন না। সে উঠে চলে গেল। নতুন চন্দনপুর নতুন কাল—নতুন মানুষ। কোন লজ্জা কোন সঙ্কোচ তার নেই। পুরানো কালের বিশ্বাস সংস্কার বদলে গেছে পথঘাটের মত। তবে কেন—কেন থাকবে সেই পুরনো প্রেম—পুরনো বিয়ে।—কেন?—

॥ ২৪ ॥

পাঁচ বছর পর।

এই ক'বছরে অনেক জল সমুদ্র থেকে বাষ্প হয়ে উঠে গেছে এবং আবার মেঘ হয়ে পৃথিবীর বুকে জল ঢেলেছে। তার মধ্যেও পৃথিবীর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বিচিত্রভাবে পুরনো মানচিত্র পাল্টাচ্ছে। আজকের সঙ্গে কালকের রেখায় মিল থাকছে না। পৃথিবীর এলাকা বাড়ছে শূন্যলোকের মধ্য দিয়ে। স্পুটনিক লুনা-জেমিনী শূন্যলোক পরিভ্রমণ ক'রে ফিরে আসছে। চাঁদে গিয়ে নামছে পৃথিবীর পাঠানো যন্ত্রযান। সেখান থেকে বার্তা আসছে ছবি আসছে।

মানুষের দেশগুলোর পুরনো সবকিছু মুছে যাচ্ছে। যেন বন্যা এসে, ঝড় এসে একেবারে ভাসিয়ে উড়িয়ে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়ে যাচ্ছে। চিরন্তন বলে বুকে আঁকড়ে ধ'রে থাকতে চাচ্ছে মানুষ, কিন্তু পারছে না।

ছোট্ট চন্দনপুর স্ফীতকায় হচ্ছে এক দিকে। অন্যদিকে পুরনোকে আঁকড়ে ধরতে গিয়ে মানুষ মরছে। তবু ছাড়ছে না। এখনও কাল

দিয়ে জমি শেলাই করে এর জমি ওকে দেওয়া চলছে, বেনাম করা চলছে। এবারও বাউড়ীরা রথ টানেনি রথ বার হয়নি পথে।

পুজোর সংখ্যা বাড়ছে।

এখনও পুজো হচ্ছে। বাড়ীর পুজো নমো নমো করে হচ্ছে; বারোয়ারীতে ধুমধাম হচ্ছে। বাউড়ীরা মদ খাচ্ছো তা হোক, তবু পাণ্টাচ্ছে—অত্যন্ত দ্রুত পাণ্টাচ্ছে। মেয়েদের ত্রিশ বছর পর্যন্ত বিয়ে হচ্ছে না। তারা এখনও নিজেরা স্বাধীন মতে বিয়ে করবার সাহস বুকে পায়নি। চালের দাম, ধানের দাম, ডালের দাম, তেলের দাম, কাপড়ের দাম, জামার দাম বাড়ছে। তবু চলছে সব। সিনেমা এসে বসেছে। ভিড় হচ্ছে। আবার হাহাকার উঠছে। মিছিল হচ্ছে। ধান চাই চাল চাই। চাকরী চাই। জমি চাই। সব চাই।

ধ্বনি উঠছে—ইনকিলাব

—জিন্দাবাদ!

—ইনকিলাব

—জিন্দাবাদ!

—ইনকিলাব

—জিন্দাবাদ!

এরই মধ্যে একদিন চন্দনপুরে ফিরে এলেন শ্যামাকিঙ্করবাবু। সেদিন এসে চন্দনপুর পৌঁছুলেন বেলা একটায়। বিকেলবেলায় আস্তে আস্তে এসে বসলেন তাঁর সেই শখের বাঁধানো নিমতলায়। খবর পেয়ে অনেকে এসেছিল তাঁর খোঁজ নিতে।

এল গেল। গেল এল। ছেলে-মেয়ে। নবীন-প্রবীণ। এর মধ্যে বন্ধু সুরেশ্বর বসে রইল তাঁর পাশে।

শ্যামাকিঙ্কর কিছুদিন আগে কলকাতায় এসে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। কাগজে বেরিয়েছিল। চিকিৎসক তাঁকে বিশ্রাম নিতে বলেছে। তিনি এখানে এসেছেন। সঙ্গে স্ত্রী এসেছেন। এসেছেন ভোরে। জিনিসপত্র এখনও গোছানো হয় নি। গোছানো হচ্ছে।

আকাশ মেঘমেত্তুর। চুপ করে বসে আছেন। মধ্যে মধ্যে কথা বলছেন।

এরই মধ্যে একসময় গার্লস স্কুলের শিক্ষয়িত্রী ক'জন এল, সকলের সামনে কমলা। প্রণাম করে সে বললে—শরীর কি খুব খারাপ?

—হ্যাঁ।

ওদিকে অন্য সকলে টুকটাক্ প্রণাম করে চলেছে।

কমলা বললে—এখানেই থাকুন কিছুদিন।

—থাকব! হয়তো বরাবর থাকব।

—তাই থাকুন! তাই থাকুন।

শিক্ষয়িত্রীদের পেছনে পেছনে মেয়েরা এল দল বেধে। প্রণাম চলতে লাগল। তিনি প্রতি-প্রণাম জানিয়ে চললেন।

ডাকলেন—বড় বউ! এদের মিষ্টি দাও। যাও না, সব যাও।

সুরেশ্বর বললে—এই ভাবটা তুমি ছাড়।

—কোনটা?

—এই—আর যাব না আর যাব না।

হাসলেন তিনি। কথাটা ঘোরাবার জন্যেই বললেন কমলা, সীমার খবর কি? তার খবর অনেকদিন পাইনি।

হেসে কমলা বলল—আপনার চন্দনপুরের বিদ্রোহিনী ঠিক আছে সে বেশ আছে। ভাগ্যও ভাল। বি-এ পাশ করেই বি-টিতে এ্যাডমিশন পেয়ে গেল। তবে একটু গোলমাল শুনছি। আমার এক বন্ধু ওখানে পড়ান। তিনি লিখেছেন—রামকৃষ্ণ মিশনে বড় যাচ্ছে। নিবেদিতা স্কুলে চান্স পেলে সন্ন্যাসিনী হয়ে যাবে—ওখানে চাকরিও করবে। ওর মতিগতিও তো ওই রকম। আপনার নেলির খবর জানেন তো? সে আই-এস-সি পাশ করেছে ফার্স্ট ডিভিসনে। ওর দাদা ওকে মেডিকেলে ভর্তি করেছে।

—খুব ভাল।

একটু বসে থেকে কমলা উঠে গেল।

এক সারি তিনখানা জিপ চলে গেল রাস্তা দিয়ে।

সুরেশ্বর বলল—তুমি শোও গিয়ে। আমি যাই।

—বসো —বসো। থাকতে কেউ আসেনি। ওই শোন!

—কি?

—শব্দ শুনতে পাচ্ছ না? জিন্দাবাদ!

১৯৬২-এর ইলেক্‌শনের রব উঠেছে!

আকাশে সন্ধ্যা নামছে। কৃষ্ণপক্ষ পিতৃপক্ষ চলছে।

রাস্তায় আলো জ্বলল। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার কাটিয়ে চাঁদ উঠলেই রাস্তার আলো নিভবে। ট্রেন আসছে। কলকাতার ট্রেনের প্যাসেঞ্জার আসবে।

—দাদাবাবু!

—কে? নসুবালা?

—দাদাবাবু—তুমি কখন এয়েচো? নোকে বলে গেজেটে লিখেছে—তোমার খুব অসুখ। হেই মাগো! দেখ দিকি মিছে কথা!

—নারে, অসুখ হয়েছিল।

—এখন তো ভাল হয়েছ। আসতে পেরেছ। বাবাঃ!

হাসলেন শ্যামাকিঙ্করবাবু।

—এবার আমাকে একখানা খুব ভাল শাড়ী দিয়ো। পরে ভাদু শুনিয়ে যাব। চন্দনপুরের ভাদু। আমার বেয়াই যে মুখচোরা! সি-সি: এই ত্যাকো! —সে যে —সে যে! সে যে বেরুবে না ঘর থেকে। তাকে তুমি ডাক না.কেন? তাহলে শুকসারী কথা শুনিয়ে যাই।

—সেটা আবার কিরে?

—হ্যাঁ, সে বলবে—কি আইন হ'ল কি পথ হ'ল—কিরকম এইসব বদল হল। আর আমি শোনাব রঙের কথা।

হঠাৎ শ্যামাকিঙ্করবাবুর দৃষ্টি পড়ল ফটকের দিকে। একজন পরিচ্ছন্ন মার্জিত রুচির পোশাক পরা কেউ দাঁড়িয়ে আছে। পড়ছে

সদ্য লাগান মারবেল ট্যাবলেটটা। বিদেশী কেউ। আগন্তুক এখানে। ওটা তো এবার তাঁর জন্মদিনে লাগান হয়েছে। এখানকার লোকের কাছে তো পুরনো। তিনি ডাকলেন—কে? আসুন ভেতরে আসুন!

ধীর পদে সলজ্জ হেসে দাঁড়াল একজন সবল সুন্দর জোয়ান ছেলে। তিনি মুহূর্তে চিনলেন।

—আরে শুভেন্দু!

—হ্যাঁ?

—কখন এলে?

—এই ট্রেনে।

—বসো। কতদিন পরে?

—ছ-বছর।

—বাড়ী যাওনি?

—না।

—কেন?

—আছে। কারণ আছে। নেলী গেছে, ফিরে এলে যাব।

শ্যামাকিঙ্করবাবু চুপ করে রইলেন। শুভেন্দু বললে—কাগজে আপনার অসুখের খবর দেখেছিলাম। কলকাতায় তখন ভিড় করতে যাইনি। ভেবেছিলাম আপনি সুস্থ হলে খবর নিয়ে যাব। পরে যেতামও। তা এখানে আজ নেমেই শুনলাম আপনি এখানে এসেছেন। তাই এলাম। দরজায় ঢুকতে ট্যাবলেটটা দেখলাম। পড়ছিলাম। মাটি থেকে আকাশ ভাল?

হাসলেন শ্যামাকিঙ্কর।

—বলবেন না?

—বলবো না কেন? মৃত্যুর মত আকাশ ধ্রুব। সুতরাং মাটিকে জানার পর তাকে তো জানতেই হবে। হবে না?

—জানি না। বুঝি না।

—বয়স হলে বুঝতে অবশ্যই হবে। তাছাড়া স্পেস এক্সপ্লোরেশনের যুগে আকাশের দিকে তাকাব না বললে তো চলবে না।

শুভেন্দু হাসলে, বললে— দুটোকে এক করছেন যে?

শ্যামাকিঙ্কর বললেন—দুটো কি এক নয়?

—না। কিন্তু ও কথা থাক। বাইরে শুনছিলাম আপনি এখানে থাকবার জন্য এসেছেন? সত্যি? রিটায়ারমেণ্ট!

—হ্যাঁ।

—সে তো আরও কোন ভাল জায়গায় থাকলে পারতেন। এই পিছনে পড়ে থাকা গ্রামখানায় কেন?

তার মুখের দিকে সবিস্ময়ে তাকালেন শ্যামাকিঙ্কর— কি হ'ল গ্রামের উপর চটলে কেন?

শুভেন্দু যেন ক্ষেপেছে, সে বললে — এ গ্রামের উপর সদয় হবার কোন কারণ আছে? আকাশকে জানতেই যদি হয় তো কোন তীর্থে গেলেই পারতেন!

শ্যামাকিঙ্কর বললেন— আকাশকে জানতে হলে আমাদের শাস্ত্রবিজ্ঞান মতে স্থির হয়ে মাটিতে আসন পাততে হয়। এই চলমান ঘূর্ণ্যমান পৃথিবীতে সকলেরই একটি স্থির বিন্দু আছে শুভেন্দু। ছেলের যেমন মায়ের কোল। জীবন সেখানে দোলার মধ্যেই স্থির। তার মধ্যেই ধ্যান-ঘুম। মা চলছে—মা দোলাচ্ছে তাকে। তবু স্থির। সেই স্থির বিন্দু হল আমার চন্দনপুর। এখানে বসে আমি দেখতে পাই পৃথিবী ঘুরছে। চলছে।

শুভেন্দু বলল—একটু ডিস্টার্ব করব?

—কি—?

—আর একজন ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

—কে?

শুভেন্দু ডাকলে বাইরে যে দাঁড়িয়েছিল— এস। ভেতরে এস। বলতে বলতে একটু এগিয়ে গেল এবং সঙ্গে করে নিয়ে এল একটি

মেয়েকে, বললে — প্রণাম করো।

শ্যামাকিঙ্করবাবু প্রশ্ন করলেন —কে?

—আমার বউ।

—বউ? বিস্ময়ের সীমা রইল না শ্যামাকিঙ্করের।

—হ্যাঁ, বিয়ে করেছি আমি।

—বিয়ে করেছ? কবে?

—গত কাল বিয়ে হয়েছে—আজ এসেছি - । এই তো সন্ধ্যার ট্রেনে। এখনও বাড়ী যাইনি। রাস্তায় ঘুরছিলাম আপনার বাড়ীতে উঠলাম। নেলী বাড়ী গেছে। জানি না কি বলবেন বাবা।

নিরুত্তর হয়ে রইলেন শ্যামাকিঙ্করবাবু। শুভেন্দু বলে গেল—আমরা একসঙ্গে চাকরী করতাম ইস্কুলে। আমি এম-এ দিলাম প্রাইভেটে ও বি-এ দিয়েছিল - । একটু সাহায্য-টাহায্য করতাম।

হাসলে শুভেন্দু

শ্যামাকিঙ্কর হেসে বললেন গুড, ভেরী গুড।

বধূটি লজ্জায় মুখ ফেরায়নি! শ্যামাকিঙ্কর তার দিকে তাকিয়ে ভাল করে দেখলেন— বেশ মেয়ে। শ্যামলা দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে। এমন মেয়েদের কলকাতায় সকালে বেশ সপ্রতিভভাবে সহজ সজ্জায় সেজে আপিসে ইস্কুলে কলেজে যেতে দেখা যায়। বিচিত্র কথা মনে হল তাঁর—সেই মেয়ে বউ হয়ে এল চন্দনপুরে। হরিবিষ্ণুর পুত্রবধূ আছে এম-এ পাশ। কিন্তু সে সেই পুরনো কালের সেই চৌধুরীদের বাড়ীর তাদের ভাগ্নেদের বাড়ীর বউয়ের মতো। তার বেশী কিছু নয়। এক গা গয়না পরে আভরণের ঝঙ্কার তুলে, সেন্টের বাস ছড়িয়ে আলতা পায়ে জুতো পরে অন্য কালের বউদের সঙ্গে চলেছে।

শুভেন্দু বললে—এসে মনে হল ভুল করেছি।

শ্যামাকিঙ্কর বললেন—কেন?

—আমরা রেজেস্ট্রি করে বিয়ে করেছি। ও কায়স্থ!

—বসো, জল খাও। বসো, নতুন বউ বসো।

* * *

জল খেয়ে তারা উঠল। শুভেন্দু ফিরেই যাচ্ছে। নেলী বাড়ী গিয়ে কথা বলে ফিরেই এসেছে। ওর মা বলেছে ফিরে যেতে। খবরটা নিয়ে পাড়াগ্রামে গোল করতে বারণ করেছে। বলেছে—একেই তো মাথার গোলমাল সারেনি। এরপর শুনলে তো মাথা ঠুকে হয়তো অজ্ঞান হয়েই যাবে।

শুভেন্দুর ভাইও তাই বলেছে।

নিঃশব্দে চুপি চুপি চলে যেতে হবে তাদের।

হেসে শুভেন্দু বললে—এই ভাঙা ফটক দিয়ে আমরাই ঢুকব না জামাইবাবু।

শ্যামাকিঙ্কর হেসে বললেন—এস ভাই। কিন্তু একটা খবর জিজ্ঞাসা করতাম তোমাকে।

—কি খবর? একটু আগে কমলাদি তো বলছিল আপনাকে। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে শুনছিলাম। সীমার খবর সীমার কথা লতা জানে। বলতে বাধা নেই। কমলাদি মোটামুটি বলেছে সত্যি খবর, তবে গেরুয়া রঙটা অকারণ চড়িয়েছে। সন্ন্যাসিনী সে কোন দিন হবে না।

—তবে?

—বিয়ে না করে ছেলেরা যেমন থাকে এযুগে তেমনি ভাবে মেয়েরাও তো বিয়ে না করে থাকবার কথা ভাবতে পারে? না পারে না? অথবা চলতে চলতে যদি আই-এ-এস ফরেন সার্ভিসের স্বামী মেলে। মন্দ কি?

হাসলে শুভেন্দু। তারপর বললে—তাকে অনেক বলেছি—অন্ততঃ তিনবারের উপর একবার চারবার। কিন্তু সে আমাকে 'না' বলে দিয়েছে।

আরও দেড় বৎসর পর।

শ্যামাকিঙ্করবাবু সেই নিমগাছতলায় তাঁর স্থির বিন্দুটিতে বসে ছিলেন। শুভেন্দুদের বাড়ীতে শাঁখ বাজছে উলু পড়ছে।

শুভেন্দু ফিরে গিয়েছিল— সে আজ ফিরল; শুভেন্দুর বাপ শেষ শয্যা পেতেছে - আর খুব বেশীদিন নেই। মৃত্যুশয্যায় ছেলে বউ নাতিকে দেখতে চেয়েছে চৌধুরী।

বিচিত্রভাবে চৌধুরীর মাথা যেন পরিষ্কার হয়ে গেছে। ডাক্তারেরা বলেছে -- এমন হয়।

চৌধুরী আরও একটা বিস্ময়কর কাজ করেছে। সেই ফাট-ধরা পুরণো ফটকটা ভাঙিয়ে দিয়েছে।

বিস্ময়কর কিছু নয়। শ্যামাকিঙ্কর জানেন, বুঝতে পেরেছিলেন, চৌধুরীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, চৌধুরী স্বীকার করেছিল। চৌধুরী সকলকে বলেছিল —আমি স্বপ্ন পেয়েছি। ঠাকুর আমাকে বলেছেন, ফটক ভাঙিয়ে দে। নইলে সবনাশ হবে। ভাঙিয়ে দে।

এমন আবেগের সঙ্গে বলেছিল চৌধুরী যে কেউ কোন প্রশ্ন তোলেনি, সম্মতি দিয়েছিল। অন্যদিকে ফটকটা আপনা-আপনি যে কোন মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারত। শ্যামাকিঙ্কর একসময় একলা বিছানার পাশে বসে চৌধুরীকে প্রশ্ন করেছিলেন—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

—কি?

—স্বপ্ন তুমি সত্যিই দেখেছ—? না— ?

—না? স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল চৌধুরী বন্ধুর দিকে।

—না ভয় হচ্ছে—।

—হ্যাঁ, ভয়ও হচ্ছে। শুভেন্দু যেই ঢুকবে সেই সময়টিতেই যদি হুড়মুড় ক'রে—। বলো না কাউকে।

—না তা ভাল করেছ। বড্ড পুরনো হয়েছিল।

—ওঃ পুরানো বলে! ভাঙুক—। ভেঙে দিক।

শুভেন্দুর ভাই ঠিকেদারা করতে আরম্ভ করেছে, সেই ভাঙাল। অনেক কষ্টে অনেক কৌশলে। প্রকাণ্ড ফটকের খিলেনটা একটা বিপুল শব্দ তুলে গ্রাম কাঁপিয়ে মাটিতে পড়ল।

নস্তুবালা গান বেঁধেছে--

চন্দপুরের গুপ্ত ব্রজধাম
ভেঙে ভেঙে মিশল মাটিতে
হায়রে কপাল বাকী কেবল নাম
ও সব নিশানা হারিয়ে গেল—হায় রে আমার মন
কোথায় আমার তমাল কুঞ্জ কোথায় নিধুবন ?
হায় রে— !

বেঁধেছে ওই মাত্র, গেয়ে বেড়াতে পারে না। সেও শয্যা পেতেছে। সপ্তাহে সপ্তাহে কিছু কিছু সাহায্য পাঠান শ্যামাকিঙ্কর। নস্তু বলে পাঠায়— আর বেশী দিন বাকী নাই। দাদাবাবুকে বলো। কালের পালা শেষ। দাদাবাবুকে পালা নিকতে বলো। আর বলো ফটক ভাঙল, শুভেন্দুর অন্যজাতের বউ এলো ; বাউড়ীরা রথ টানতে পারে না ক্যানে ? বলো তাকে বলো।

শ্যামাকিঙ্কর ভাবছিলেন আর শুনছিলেন শাঁখের শব্দ, উলুর শব্দ।

সন্ধ্যাবেলা শুভেন্দু এলো।

সে খবর দিল—সীমা বিদেশে যাচ্ছে। হেসে শুভেন্দু বললে- বললাম, বিয়ে-টিয়ে করবে না ? সে বললে, ভেবে দেখিনি। চিনতেই পারবেন না তাকে দেখলে

শ্যামাকিঙ্করবাবু তাঁর সেই স্থির বিন্দুটিতে বসে দেখলেন সীমা এবং চন্দনপুর এক হয়ে গেছে সীমার সঙ্গেই চন্দনপুর চলছে — চলছে—। আরও চলবে। আরও পালটাবে।

— বাবু !

কে এসে দাঁড়াল ;

—কে ?

—আমি ফটিক দাস।

—ফটিক ? পুতুলওয়ালা ফটিক —নস্তুর বেয়াই।

ফটিক বললে—বেয়ান নন্দবালা মারা গেল

চমকে উঠলেন শ্যামাকিঙ্কর—মারা গেল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। পালা শেষ হল তার।

— শেষ —